ব্রহ্মজিজ্ঞাসা

BY THE SAME AUTHOR

1. THE PHILOSOPHY OF BRAHMAISM : Twelve lectures on Bràhma doctrine, *sàdhan* and social ideas. Rs 2-8.
2. THE VEDANTA AND ITS RELATION TO MODERN THOUGHT : Twelve lectures on all aspects of the Vedantic religion and philosophy. Rs 2-4.
3. উপনিষদঃ—ঈশা, কেন, কঠ, প্রশ্ন, মুণ্ডক, মাণ্ডুক্য, শ্বেতাশ্বতর, তৈত্তিরীয় ও ঐতরেয় উপনিষদ্, সরল টীকা ও অবিকল বঙ্গানুবাদ সহ। মূল্য ২৲।

To be had of the author at the Devalay, Residential Quarters, 210/3/2, Cornwalis Street, Calcutta.

☞ For a full list, please see the end.

ব্রহ্মজিজ্ঞাসা

অর্থাৎ

ব্রহ্মবাদের দার্শনিক প্রমাণ ও ব্যাখ্যা

শ্রীসীতানাথ তত্ত্বভূষণ

প্রণীত

দ্বিতীয় সংস্করণ—পরিবর্ত্তিত ও পরিবর্দ্ধিত

কলিকাতা

২১১, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, ব্রাহ্ম মিশন্ প্রেসে
শ্রীঅবিনাশচন্দ্র সরকার দ্বারা মুদ্রিত ও
প্রকাশিত।

১৯১১

দ্বিতীয় সংস্করণের বিজ্ঞাপন

দীর্ঘ কাল পরে 'ব্রহ্মজিজ্ঞাসা'র দ্বিতীয় সংস্করণ হইল। এই সময়ের মধ্যে লেখকের চিন্তা ও ভাবে অনেক পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে, সন্দেহ নাই; কিন্তু সুখের বিষয় এই যে এই দীর্ঘ সময়েও তাঁহার মূল দার্শনিক মত অপরিবর্ত্তিত রহিয়াছে। সেই মত ব্যাখ্যার প্রণালীও বিশেষরূপে পরিবর্ত্তিত হয় নাই। প্রণালীগত পরিবর্ত্তন যাহা কিছু ঘটিয়াছে তাহা প্রথম সংস্করণের পাঠক এই দ্বিতীয় সংস্করণে অনেক পরিমাণে দেখিতে পাইবেন। এই সংস্করণের প্রধান বিশেষত্ব এই যে ইহাতে দুটী নূতন পরিচ্ছেদ সন্নিবিষ্ট হইয়াছে; আশা করা যায় যে এই দুটী পরিচ্ছেদে ব্যাখ্যাত বিষয় পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক পরিমাণে সুবোধ্য হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত পুস্তকের সর্ব্বত্রই ভাষার অনেক পরিবর্ত্তন করা হইয়াছে এবং কোন কোন অধ্যায় পুনর্বিভক্ত করিয়া পরিচ্ছেদ-সংখ্যা বৃদ্ধি করা হইয়াছে।

এই সময়ের মধ্যে দেশে ধর্ম্মালোচনা সম্বন্ধে অনেক পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। এখন জ্ঞানপিপাসু ব্যক্তির সংখ্যা অনেক পরিমাণে বৃদ্ধি পাইয়াছে। যে সময়ে 'ব্রহ্মজিজ্ঞাসা' প্রথম প্রকাশিত হয় তাহা অপেক্ষা এই সময়ই এরূপ পুস্তক প্রচারের অধিকতর উপযোগী বলিয়া বোধ হয়। আশা করা যায় 'ব্রহ্মজিজ্ঞাসা'র এই সংস্করণ প্রথম সংস্করণ অপেক্ষা অধিকতর আদর লাভ করিবে। এই সময়ের মধ্যে লেখক ঈশ্বরকৃপায় ধর্ম্মবিষয়ে অনেকগুলি পুস্তক লিখিতে সমর্থ হইয়াছেন।

এই সকল পুস্তক লেখায় ব্যস্ত থাকাতেই এত দিন 'ব্রহ্মজিজ্ঞাসা'র প্রতি তাদৃশ মনোযোগ দেওয়া হয় নাই। অন্যান্য পুস্তকে ইহার অভাব অনেক পরিমাণে পূরণ হইয়াছে এই বোধে প্রথম সংস্করণ নিঃশেষিত হইলেও অনেক দিন ইহার পুনঃসংস্করণ করা হয় নাই। কিন্তু এখন বোঝা যাইতেছে যে ইংরেজি-অনভিজ্ঞ বাঙ্গালী পাঠকের জন্য এই পুস্তক বিশেষ ভাবে আবশ্যক। এই শ্রেণীর পাঠক এই লেখক-কৃত 'বেদান্ত ও আধুনিক চিন্তার সহিত উহার সম্বন্ধ' এবং 'ব্রাহ্মধর্ম্মের দর্শন' নামক ইংরেজি পুস্তকদ্বয়ের দার্শনিক ব্যাখ্যাভাগ এই পুস্তকে পাইবেন। অনেক কথা, যাহা উক্ত পুস্তকদ্বয়ে সংক্ষেপে বলা হইয়াছে, তাহা এই পুস্তকে বিস্তৃত ভাবে ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। সুতরাং ইংরেজি-অভিজ্ঞ বাঙ্গালী পাঠকের পক্ষেও এই পুস্তক বিশেষ কার্য্যকর হইবে এরূপ আশা করা যায়। এই কয়েক বৎসর হিন্দু শাস্ত্র আলোচনাদ্বারা লেখকের এই দৃঢ় ধারণা জন্মিয়াছে যে ব্রাহ্মধর্ম্মের দর্শন ও বেদান্তদর্শন মূলে এক। এই মূল দর্শনই এই পুস্তকে বিস্তৃত ভাবে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। সুতরাং ইহাতে বেদান্তমতের বিস্তৃত ব্যাখ্যা না থাকিলেও আশা করা যায় পাঠক ইহাতে বেদান্তের মূলতত্ত্ব বুঝিবার বিশেষ সাহায্য পাইবেন এবং এই পুস্তক পাঠে উপনিষদ্-অধ্যয়ন সহজ ও সুগম হইবে। প্রচলিত মায়াবাদী অদ্বৈতবাদ যে বেদান্তের প্রকৃত মত নহে, এবং এই মত যে ভ্রান্ত, তাহা লেখক উক্ত বেদান্ত সম্বন্ধীয় বক্তৃতাপুস্তকে এবং তাঁহার অন্যান্য পুস্তকে বিশেষ ভাবে দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছেন। এই পুস্তকে মায়াবাদের দার্শনিক ভ্রম পরিষ্কাররূপে দেখাইতে চেষ্টা করা

হইয়াছে। এই বিষয়ে প্রথম সংস্করণাপেক্ষা বর্ত্তমান সংস্করণে পাঠক বিস্তৃততর ও বিশদতর ব্যাখ্যা পাইবেন।

প্রথম সংস্করণের বিস্তৃত 'মুখবন্ধ' এই সংস্করণে পুনর্মুদ্রিত হইল না। উক্ত 'মুখবন্ধ' ঐ সময়েরই উপযোগী ছিল, বর্ত্তমান সময়ে উহার তেমন উপযোগিতা নাই, সুতরাং উহার পুনর্মুদ্রাঙ্কনের ও আবশ্যকতা নাই। কেবল উহার যে অংশে একটী দার্শনিক সম্প্রদায়ের নিকট লেখকের ঋণ প্রকাশ করা হইয়াছে, সেই অংশটুকু এবং আবশ্যক বোধে শেষাংশটুকুও এস্থলে উদ্ধৃত হইল :—

"এই পুস্তক অপর কোন পুস্তক বা পুস্তকাংশ অবলম্বনে লিখিত নহে এবং এই পুস্তক-লেখককে কোন বিশেষ দার্শনিকের শিষ্যও বলা যাইতে পারে না ; তবে বলা আবশ্যক যে বর্ত্তমান দার্শনিক সম্প্রদায়-সমূহের মধ্যে বৃটেনীয় গ্রীণ ও কেয়ার্ড-প্রমুখ নিও-ক্যাণ্টিয়ান বা ক্যাণ্টিও-হিগেলিয়ান সম্প্রদায়ের সহিত এই পুস্তক-লেখকের সর্ব্বাপেক্ষা অধিক সহানুভূতি, এবং তত্ত্ববিদ্যা শিক্ষার জন্য এই সম্প্রদায়ের নেতাদিগের নিকট এই পুস্তক-লেখক সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ঋণী। এই পুস্তক লিখিতে লিখিতে যে যে অংশের সহিত এই সম্প্রদায়ের লেখকদিগের ব্যাখ্যার অল্পাধিক সাদৃশ্য স্মরণ হইল, সেই সেই অংশের নিম্নে তাঁহাদের পুস্তকের নাম ও সদৃশ ব্যাখ্যা-সম্বলিত অধ্যায় পরিচ্ছেদাদি উল্লিখিত হইয়াছে। এই রূপে অন্যান্য কতিপয় গ্রন্থকারের পুস্তকও উল্লিখিত হইয়াছে। যে যে পাঠক এই পুস্তকে ব্যাখ্যাত সত্যসমূহ আরো গভীর-ভাবে আলোচনা করিতে চান, তাঁহারা ঐ সকল পুস্তক পাঠ করিলে বিশেষ সাহায্য প্রাপ্ত হইবেন।

"এই 'পুস্তকে 'ধর্ম্মসাধন বিষয়ে সাক্ষাৎ ভাবে প্রায় কিছুই বলা হয় নাই, কিন্তু ধর্ম্মসাধনের সহায়তা করা এই পুস্তকের একটী বিশেষ উদ্দেশ্য। এই পুস্তকে ব্যাখ্যাত সত্যসমূহ লেখকের ধর্ম্ম-জীবনের বিশেষ সহায়তা করিয়াছে। এই সকল সত্য তাঁহার সমক্ষে একটী নূতন সাধনের রাজ্য খুলিয়া দিয়াছে এবং তাঁহার প্রাণে অনেক আশা ও বলের সঞ্চার করিয়াছে। যে যে স্থলে এই সকল সত্য ব্যাখ্যা করিবার কিছু বিশেষ সুযোগ প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে, সেই সেই স্থলে অন্য কাহারো কাহারো জীবনেও অনেক পরিমাণে অনুরূপ উপকার দর্শিতে দেখা গিয়াছে। ঈশ্বর-কৃপায় এই পুস্তক পাঠে যদি একটী আত্মারও বিশ্বাস দৃঢ়ীভূত হয়, ঈশ্বরকে নিকটতর বলিয়া বোধ হয়, তবে আপনাকে কৃতার্থ বোধ করিব।"

লেখক।

২১০।৩।২, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
২৫এ পৌষ, ১৮৩২ শকাব্দা।

উৎসর্গ

কল্যাণীয়া জ্যেষ্ঠা কন্যা শ্রীমতী লীলাময়ী রায়

ও মধ্যমা কন্যা কুমারী জ্যোতির্ম্ময়ী দত্ত, বি, এ,-

করকমলেষু।

লীলা, জ্যোতি,

আমার মানসকন্যা 'ব্রহ্মজিজ্ঞাসা'কে নূতন সাজে সাজাইয়া তোমাদের হাতে দিলাম। শান্তি, সুধা প্রভৃতি ভগ্নীর ন্যায় ইহার উপর স্নেহদৃষ্টি রাখিবে। ইহার তৃতীয় সংস্করণের সময় আমি যে ইহলোকে থাকিব, তার আশা নাই, সুতরাং তোমাদের উপর ইহার সকল ভার দিলাম। এই সঙ্গে আমার লিখিত অন্যান্য পুস্তকের ভারও তোমাদের উপর দিলাম।

তোমরা জান যে গত কয়েক বৎসর ধরিয়া ব্রাহ্মসমাজে ও ব্রাহ্ম-সমাজের সহিত অল্লাধিক সম্বন্ধ সাধকগণের মধ্যে ধীর গতিতে একটী বিপ্লব ঘটিতেছে। এই বিপ্লবে রক্তপাত নাই, গৃহবিচ্ছেদ নাই, বন্ধুবিচ্ছেদ নাই, অথচ ইহা মূলে অতি গভীর। তোমরা ইহাও জান যে এই পুস্তক সেই বিপ্লবের একটী ক্ষুদ্র পতাকা। আমার ইচ্ছা যে তোমরা সেই পতাকা ভাবে এই পুস্তক খানা গ্রহণ কর। কিন্তু সে ভাবে ইহাকে তোমাদের হাতে দেওয়া আমার কাজ নয়, ঈশ্বরের কাজ। তোমরা প্রার্থনাপূর্ব্বক বুঝিতে চেষ্টা করিবে ঈশ্বর তোমাদের হাতে এই পতাকা দিতেছেন কি না। তোমরা সর্ব্বদাই গান কর—"তোমার পতাকা যারে দাও, তারে বহিবারে দাও শকতি।" এস্থলেও তাহাই ঠিক।

এই পুস্তকের সহিত তোমাদের স্বর্গীয়া জননীর পবিত্র স্মৃতি জড়িত আছে, ইহা তোমাদিগকে স্মরণ করাইয়া দেওয়া আবশ্যক বোধ করিতেছি। তিনি তোমাদের মত উচ্চ শিক্ষা পান নাই; কিন্তু তাঁহার ধর্ম্ম ও জ্ঞানানুরাগ এত প্রবল ছিল, যে তিনি পরিশ্রমপূর্ব্বক এই পুস্তক এবং ব্রহ্মবিদ্যা সম্বন্ধীয় অন্যান্য কঠিন পুস্তক, যথা শ্রদ্ধাস্পদ রাজনারায়ণবাবুর 'ধর্ম্মতত্ত্বদীপিকা' ও শ্রদ্ধাস্পদ নগেন্দ্রবাবুর 'ধর্ম্মজিজ্ঞাসা,' অধ্যয়ন করিয়া ব্রহ্মবিদ্যালয়ের উচ্চ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন। এই পুস্তকে ইঙ্গিতীকৃত সাধনপ্রণালীও তিনি আগ্রহের সহিত অবলম্বন করিয়াছিলেন। এই পারিবারিক স্মৃতি চিরদিন তোমাদের ধর্ম্মসাধন ও জ্ঞানালোচনায় সহায় হউক্।

বাবা।

সূচীপত্র

ব্রহ্মজিজ্ঞাসা

প্রথম অধ্যায়—আত্মানাত্ম-বিবেক

প্রথম পরিচ্ছেদ—আত্মজ্ঞান ও বিষয়জ্ঞান

আলোচনার প্রারম্ভেই পাঠকের সঙ্গে নিভৃতস্থানে যাইয়া আত্মধ্যানে নিযুক্ত হইতে চাই। পাঠক যত দূর পারেন, মনকে বাহ্যবিষয় হইতে আকর্ষণ করিয়া অন্তরে লইয়া যান্; যত দূর পারেন, ইন্দ্রিয়ক্রিয়া বন্ধ করিয়া দিন্; দর্শন, শ্রবণ, স্পর্শন হইতে বিরত হউন্। বাহ্যবিষয়ের সমুদয় চিন্তাও দূর হউক্; মন স্থির গম্ভীর হউক্। অন্য সমুদয় বিষয় মন হইতে দূর হইলেও বোধ হয় একটি দূর হইবে না, সেটী অন্ধকার। যাহা হউক্, তাহাতে বিশেষ ক্ষতি নাই। এখন এই নির্জ্জন, নীরব, অন্ধকারপূর্ণ স্থানে, এই স্থির গম্ভীর অবস্থায়, আত্মাকে উপলব্ধি করিতে চেষ্টা করুন্। বাহ্য বিষয়ে মগ্ন হইয়া যাহাকে প্রায় ভুলিয়া যান, তাহাকে এখন

বিশেষ ভাবে দর্শন করুন্। অন্তর্দৃষ্টি দ্বারা দেখুন্, বাহিরের সমুদয় জ্যোতিঃ নির্ব্বাপিত হইয়াছে বটে, কিন্তু আত্মজ্যোতিঃ নির্ব্বাপিত হয় নাই। আত্মা আপনার আলোকে আপনি প্রকাশিত রহিয়াছে, আর অন্ধকারকেও প্রকাশ করিতেছে। আত্মা আপনাকে জ্ঞাতা বা বিষয়ীরূপে জানিতেছে, আর অন্ধকারকে বিষয়রূপে জানিতেছে; আত্মা জ্ঞানরূপে প্রকাশ পাইতেছে। আত্মার এই যে জ্ঞানরূপ লক্ষণ, এই লক্ষণের উপর বিশেষ ভাবে মনোনিবেশ করুন্। আত্মার আরও লক্ষণ আছে, কিন্তু অন্যান্য লক্ষণ এই জ্ঞানকে আশ্রয় করিয়া কার্য্য করে, এই জ্ঞানের আলোকেই প্রকাশিত হয়। জ্ঞানই আত্মার প্রাণ, আত্মা জ্ঞানরূপী, আত্মা জ্ঞানবস্তু। অতঃপর আমরা অনেক স্থলেই 'জ্ঞান' বা 'জ্ঞানবস্তু' এই নামে আত্মার উল্লেখ করিব। এখন পাঠক দেখুন্ যে, এই যে আত্মার মূল লক্ষণ জ্ঞান, ইহার ভিতরে আবার একটু মূল ও শাখার প্রভেদ আছে, একটু আশ্রয় আশ্রিতের প্রভেদ আছে। ইহার যে আত্মজ্ঞান, ইহাই মূল জ্ঞান, অন্ধকার-জ্ঞান ইহার আশ্রিত। আপনাকে না জানিয়া আত্মা অন্ধকারকে জানিতে পারে না। এরূপ বলিতেছি না যে আত্মা অগ্রে আপনাকে জানে, আর তার পরবর্ত্তী মুহূর্ত্তে অন্ধকারকে জানে। আত্মা আপনাকে আর অন্ধকারকে একই কালে, একই অখণ্ড জ্ঞান-দৃষ্টিতে, জানে বটে, কিন্তু বস্তুতঃ আত্মজ্ঞান অন্ধকার জ্ঞানের অপরিহার্য্য আশ্রয়,

অপরিহার্য্য ভিত্তি। অন্ধকার-জ্ঞানের মূলে আত্মজ্ঞান আশ্রয় ও অবলম্বনরূপে বর্ত্তমান রহিয়াছে। অন্ধকারকে জানিতে গিয়া অপরিহার্য্যরূপে আত্মাকে জানিতে হয়, আত্মাকে না জানিলে অন্ধকারকে জানা হয় না। কেবল অন্ধকারের জ্ঞান সম্ভব নহে, অন্ধকারকে জানিতে গেলেই সমগ্র জানের বিষয়টী এই দাঁড়ায়—"আমি অন্ধকারকে জানিতেছি"; "আমি"র জ্ঞানকে ছাড়িয়া দিয়া অন্ধকারের জ্ঞান সম্ভব হয় না। এই কথায় যদি পাঠকের সন্দেহ হয়, তিনি ভাবিয়া দেখিতে পারেন আপনার জ্ঞানকে ছাড়িয়া দিয়া অন্ধকারকে ভাবিতে পারেন কি না। যদি বলেন, "হাঁ, আমি আপনাকে না জানিয়াও অন্ধকারকে জানিয়াছি, যখন অন্ধকারকে জানিতেছিলাম তখন আপনাকে জানিতেছিলাম না", তবে তাঁহাকে দুই একটী প্রশ্ন করিব। আপনি বলিতেছেন আপনি যখন অন্ধকারকে জানিতেছিলেন তখন নিজ আত্মাকে জানিতেছিলেন না, জ্ঞাতাকে জানিতেছিলেন না, "আমি জানিতেছি" এই তত্ত্বটী তখন আপনার জ্ঞানের বিষয় ছিল না। আচ্ছা, আপনার কথাই যেন মানিলাম; এখন জিজ্ঞাসা করি আপনি যে তখন অন্ধকারকে জানিতেছিলেন, তাহার প্রমাণ কি? আপনি অবশ্য স্মৃতির প্রমাণ দিবেন, অবশ্যই বলিবেন যে আপনি তখন অন্ধকারকে জানিতেছিলেন ইহা যে আপনার স্মরণ হইতেছে, ইহাই আপনার অন্ধকার-দর্শনের প্রমাণ। আচ্ছা, তবে আপনার স্মৃতির বিষয়টী হইল এই

—"আমি তখন অন্ধকারকে জানিতেছিলাম", অর্থাৎ "আমি জানিতেছিলাম + অন্ধকার" এই দুই অবিভাজ্য তত্ত্ব আপনার স্মৃতির বিষয়। আপনি অবশ্য স্বীকার করিবেন যে যাহা কোনও কালে জানা যায় না তাহা স্মরণও করা যায় না, কেবল জানা বিষয়ই স্মৃতির বিষয় হইতে পারে; যাহা স্মরণ হইতেছে তাহা অবশ্য এক কালে জানা হইয়া থাকিবে। সুতরাং "আমি জানিতেছিলাম" ইহা যখন আপনার স্মরণ হইতেছে তখন ইহা আপনি জানিয়াও থাকিবেন; অর্থাৎ অন্ধকারকে জানিবার সময় "আমি জানিতেছি" এই তত্ত্ব আপনার জ্ঞানের বিষয়ীভূত হইয়া থাকিবে। কিন্তু আপনি পূর্ব্ব মুহূর্ত্তেই বলিয়াছেন যে আপনি কেবল অন্ধকারকেই জানিতেছিলেন, অন্ধকারকে জানিবার সময়ে আপনার আত্মজ্ঞান ছিল না—"আমি জানি-তেছি" ইহা আপনার জ্ঞানের বিষয় ছিল না। সুতরাং পাঠক দেখিতেছেন যে আত্মাকে না জানিয়াও অন্ধকারকে জানা যায় এরূপ মনে করা কেবল অনবধানতার ফল। অন্ধকারকে জানিতে গেলেই অপরিহার্য্যরূপে আত্মাকে জানা চাই; আত্ম-জ্ঞান অন্ধকার-জ্ঞানের আশ্রয় ও অবলম্বন, অন্ধকার-জ্ঞান আত্মজ্ঞানকে ছাড়িয়া কোনও প্রকারেই থাকিতে পারে না।

এখন আর একটু অগ্রসর হওয়া যাক্। পাঠক চক্ষু মেলিয়া কোনও বস্তুর দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করুন; মনে করুন্ যেন সম্মুখে এক খানা শাদা কাগজ দেখিতেছেন; কাগজের

শাদা রং অন্ধকারের স্থান অধিকার করিয়াছে। আপাততঃ বোধ হইতে পারে যে চক্ষু মেলিবামাত্রই, কাগজ খানা দেখিবামাত্রই, একবারে বাহ্যজগতে উপস্থিত হইলাম, অন্তর রাজ্য, আত্ম-রাজ্য, সম্পূর্ণরূপে ছাড়িয়া আসিলাম। কিন্তু বাস্তবিক কথা তাহা নহে; আত্মজ্ঞানের অনতিক্রমণীয় অধিকার এক তিলও ছাড়াইতে পারেন নাই। অন্ধকার-জ্ঞান সম্বন্ধে আমরা যাহা যাহা বলিয়াছি, এই বর্ণজ্ঞান সম্বন্ধে সেই সমস্ত কথাই খাটে। ভাবিয়া দেখুন, এই বর্ণকে জানিতে গিয়াও ইহার জ্ঞাতা যে আত্মা তাহাকে অপরিহার্য্যরূপে জানিতে হইতেছে। আত্মজ্ঞান যেমন অন্ধকার-জ্ঞানের অপরিহার্য্য আশ্রয়, ইহা বর্ণজ্ঞানেরও তেমনি অপরিহার্য্য আশ্রয়; বর্ণজ্ঞান অন্ধকার-জ্ঞানাপেক্ষা এক তিলও স্বাধীন, নিরবলম্ব নহে। "আমি জানিতেছি" এই তত্ত্বটীকে অবলম্বন না করিয়া বর্ণজ্ঞান সম্ভব নহে। বর্ণকে জানিতে গেলেই সমগ্র জ্ঞানের বিষয়টী এই দাঁড়ায়—"আমি বর্ণকে জানিতেছি"। এই বিষয়ে যদি পাঠকের সন্দেহ হয়, তবে পূর্ব্বোক্ত পরীক্ষা প্রয়োগ করিলেই বুঝিতে পারিবেন যে 'আত্মজ্ঞানকে আশ্রয় না করিয়াও বর্ণজ্ঞান হইতে পারে' এরূপ বলা কেবলই অনবধানতার ফল।

এই বর্ণজ্ঞান সরাইয়া পাঠক ইহার স্থলে অন্য কোন বিষয়ের জ্ঞানকে বসাইতে পারেন; দেখিবেন বিষয় যাহাই হউক্ না কেন, আত্মজ্ঞান সমুদায় বিষয়-জ্ঞানকেই সমানভাবে

অধিকার করে; ইহা প্রত্যেক বিষয়-জ্ঞানের আশ্রয় হইয়া উহার অস্তিত্বকে সম্ভব করে। ভিন্ন ভিন্ন পরিবর্ত্তনশীল বিষয়-জ্ঞানের মধ্যে আত্মজ্ঞান সাধারণ তত্ত্ব, ইহাকে অবলম্বন না করিয়া অন্য কোনও তত্ত্বই জ্ঞানের বিষযীভূত হইতে পারে না। "আমি জানিতেছি" ইহা না জানিয়া অন্য কোনও বিষয়ই জানিতে পারি না, "আমি জানিয়াছিলাম" ইহা স্মরণ না করিয়া অন্য কোনও বিষয়ই স্মরণ করিতে পারি না, "আমি জানিব" ইহা না ভাবিয়া কোনও ভবিষ্যৎ জ্ঞানলাভের আশা করিতে পারি না। সমুদায় জ্ঞান আত্মজ্ঞানরূপ সূত্রে জড়িত, জ্ঞানের সমগ্র অট্টালিকা আত্মজ্ঞানরূপ ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। আমরা এই তত্ত্বের যে সকল বিশেষ বিশেষ উদাহরণ দিলাম, কেবল সেই সকল বিশেষ বিশেষ উদাহরণেই এই সত্য আবদ্ধ নহে। এই সত্য বিশেষ বিশেষ স্থলে আবদ্ধ একটী বিশেষ সত্য নহে, ইহা একটী বিশ্বজনীন অলঙ্ঘনীয় সত্য। বিশেষ বিশেষ বৃত্তে যেমন সমুদায় বৃত্তের সাধারণ গুণ প্রকাশিত, বিশেষ বিশেষ ত্রিভুজে যেমন ত্রিভুজ-মাত্রেরই সাধারণ গুণ প্রকাশিত, বিশেষ বিশেষ জ্ঞানমাত্রেই তেমনি জ্ঞানের সাধারণ লক্ষণ প্রকাশিত। বৃত্ত মাত্রই যেমন কেন্দ্রাপেক্ষী, যেমন কেন্দ্র না থাকিলে, বৃত্ত সম্ভব হয় না, তেমনি আত্মজ্ঞানকে অবলম্বন না করিয়া কোনও জ্ঞানই সম্ভব হয় না।

পাঠক এখন সমুদায় ইন্দ্রিয়দ্বার উদ্ঘাটন করিতে পারেন,

জগতের নানা বস্তুর প্রতি জ্ঞানদৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে পারেন। চাহিয়া দেখুন, জ্ঞানের সমুদায় বিষয় আত্মজ্যোতিতে পরিপূর্ণ। সমুদায় জ্ঞানের উপরে আত্মজ্ঞানের আলোক পড়িয়াছে, সমুদায় বস্তু আত্মজ্ঞানের আলোকেই প্রকাশিত হইতেছে। যাহা কিছু দেখিতেছেন, সমুদায়ের সঙ্গে আমি দেখিতেছি, যাহা কিছু শুনিতেছেন সমুদায়ের সঙ্গে "আমি শুনিতেছি," যাহা কিছু স্পর্শ করিতেছেন, সমুদায়ের সঙ্গে "আমি স্পর্শ করিতেছি," এক কথায়—যাহা কিছু জানিতেছেন, সমুদায়ের সঙ্গে "আমি জানিতেছি" এই মূলতত্ত্ব জড়িত রহিয়াছে। এই সত্যটী পাঠক বিশেষরূপে উপলব্ধি করিতে চেষ্টা করুন্। সত্যটীকে সম্প্রতি সামান্য বলিয়া বোধ হইতে পারে, কিন্তু ক্রমে দেখিবেন, এই সত্যই ব্রহ্মজ্ঞানের ভিত্তিমূল।

এই সত্য স্বতঃসিদ্ধ, সুতরাং আমরা ইহার ব্যাখ্যামাত্র করিলাম, ইহাকে সপ্রমাণ করিবার কোন প্রয়াসই পাইলাম না। যে সত্য সমুদায় সত্যের মূল, সমুদায় সত্যের প্রমাণস্থল, তাহাকে আবার কোন মূলের উপর, কোন প্রমাণের উপর, দাঁড় করান যাইবে? এই স্বতঃসিদ্ধ সত্য অস্বীকার করিতে গেলে কিরূপ অসঙ্গতিতে পড়িতে হয়, কিরূপ স্ববিরোধিতা দোষে দোষী হইতে হয়, একটা কথা অস্বীকার করিয়া কিরূপে আবার পরক্ষণেই তাহা প্রকারান্তরে স্বীকার করিতে হয়, তাহা আমরা দেখাইয়াছি। এই বিষয়ে আর অধিক বলা বোধ হয়

নিষ্প্রয়োজন। কোন একটা বিষয় জানি, অথচ তার সঙ্গে আপনাকে জ্ঞাতারূপে জানি না, ইহা বলিলে এই কথাই বলা হয় যে একটা জ্ঞানলাভ করি, অথচ সে জ্ঞানটাকে আপনার জ্ঞান বলিয়া জানি না। যিনি এই কথা বলেন তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করি যদি জ্ঞান লাভের সময় জ্ঞানটাকে আপনার জ্ঞান বলিয়া না জানেন, তবে পরক্ষণেই উহাকে আপনার জ্ঞান বলিয়া বিশ্বাস করেন কেন? আর উহাকে আপনার জ্ঞান বলিয়া প্রতিপন্ন করিতেই বা চেষ্টা করেন কেন? যাহা আপনি জানেন নাই, যাহার পরোক্ষ জ্ঞানও পান নাই এবং পাওয়াও সম্ভব নহে, সে বিষয় সম্বন্ধে এত অটল বিশ্বাস কিরূপে জন্মিল? আপত্তি-কারীকে যদি আমরা বলি যে আপনি আত্মজ্ঞান-বিচ্যুত হইয়া যাহা কিছু জ্ঞান লাভ করিয়াছেন বলিয়া বলিতেছেন তাহা আপনার জ্ঞান নহে, তবে আপত্তিকারী কি উত্তর দিতে পারেন? এই কথা বলিলে আমাদের কোন অপরাধ হয় না, কেন না আপত্তিকারী নিজেই বলিতেছেন যে জ্ঞানলাভের সময়ে এই সকল জ্ঞানকে তাঁহার আপনার জ্ঞান বলিয়া বোধ ছিল না, এখন যে আপনার জ্ঞান বলিয়া স্মরণ হইতেছে ইহাও বলিতে পারেন না, কেননা যাহা আদৌ জানাই হয় নাই তাহার স্মরণও সম্ভব নহে, যাহা খাওয়া হয় নাই তাহার রোমন্থনও সম্ভব নহে। আমরা যে আমাদের জ্ঞানকে আপনার জ্ঞান বলিয়া বিশ্বাস ও প্রতিপন্ন করিতেছি, তাহার অকাট্য প্রমাণ

এই যে প্রত্যেক জ্ঞানলাভের সঙ্গে সঙ্গে আমরা ইহাকে আপনার জ্ঞান বলিয়া জানিয়াছি ; আত্মজ্ঞান-বিচ্যুত হইয়া আমরা এক কণা জ্ঞানও লাভ করি নাই, লাভ করা সম্ভবও মনে করি না। *

পাঠক জিজ্ঞাসা করিতে পারেন, সমুদায় জ্ঞানের সঙ্গেই আত্মজ্ঞান থাকে, আমরা সজ্ঞানাবস্থায় কখনও আত্মজ্ঞান-বিহীন হই না, ইহাই যদি সত্য হয়, তবে ইহার বিপরীত কথা সত্য বলিয়া বোধ হয় কেন ? কেন এরূপ মনে হয় যে আমরা সময়ে সময়ে কোন বিশেষ বিষয়জ্ঞানে মগ্ন হইয়া আত্মাকে একবারে ভুলিয়া যাই ? এই ভ্রমের কারণ এই। কোন বিষয় জানা, আর জানি বলিয়া ভাবা, জানি বলিয়া বুঝা,—এই দুটী স্বতন্ত্র ব্যাপার। জানাটা অনেকস্থলেই সাক্ষাৎ দৃষ্টি-ঘটিত, সাক্ষাৎ অনুভব বা আত্মজ্ঞানের ফল ; বুঝাটা সকল সময়েই ভাবনা-ঘটিত, পরীক্ষা-ঘটীত। আমরা দেখাইয়াছি যে আপনাকে জ্ঞাতা বলিয়া না জানিলে, প্রত্যেক জ্ঞানকে "আমার জ্ঞান" বলিয়া না জানিলে, কোন জ্ঞানই সিদ্ধ হয় না। এই যে আত্মজ্ঞান, যাহা প্রত্যেক বিষয়জ্ঞানের আশ্রয়রূপে বর্ত্তমান থাকে, ইহা প্রত্যক্ষ সাক্ষাৎ জ্ঞান। কিন্তু এই তত্ত্বটী যে পরিষ্কার রূপে ভাবা, বুঝা, ইহা প্রত্যক্ষজ্ঞানের ফল নহে, ইহা ভাবনার ফল, আত্ম-পরীক্ষার ফল, চিন্তার ফল। এই

---

* Ferrier's *Institutes of Metaphysic*, Proposition I ও শাঙ্কর ব্রহ্মসূত্র-ভাষ্য, ২।৩।৭ দেখুন।

আত্মপরীক্ষা অতি কঠিন ব্যাপার; অনেকে ইহা আদৌ করিতে পারে না। মনটাকে স্থির গম্ভীর করিয়া জ্ঞানের উপকরণগুলির দিকে সমস্ত মনোযোগটা দেওয়া, এই সমুদায়কে তন্ন তন্ন করিয়া দেখিয়া বর্ণনা করা, এই কার্য্য অনেকের পক্ষে একবারেই অসম্ভব। আর যাঁহারা এই কার্য্য করিতে পারেন, তাঁহারাও কিছু সকল সময়ে ইহা করেন না; গম্ভীর চিন্তাশীল দার্শনিকও কিছু সকল সময়ে আত্ম-পরীক্ষারূপ অণুবীক্ষণ হাতে করিয়া বসিয়া থাকেন না; কাজে কাজেই আত্মজ্ঞানরূপ প্রত্যক্ষ জ্ঞান সমুদায় জ্ঞানের সঙ্গে জড়াইয়া থাকিলেও আত্মপরীক্ষার ফল যে আত্মোপলব্ধি, তাহা সকল সময়ে ঘটে না। পাঠক আত্মজ্ঞান ও আত্মোপলব্ধির এই প্রভেদ বুঝিলেই ইহাও বুঝিতে পারিবেন কেন আমাদের আলোচিত সত্যটী সকল সময়ে সত্য বলিয়া বোধ হয় না। আত্মজ্ঞান মৌলিক, সহজ, সুলভ, সাধারণ; ইহা চিন্তাশীল ও চিন্তাহীন সকলেরই হস্তগত; ভাবনাযুক্ত ও ভাবনাশূন্য সকল সময়েই ইহা প্রকাশিত। কিন্তু আত্মোপলব্ধি ভাবনার ফল, আত্মপরীক্ষার ফল; ইহা কেবল চিন্তাশীল ব্যক্তিরই প্রাপ্য; ইহা কেবল ভাবনাযুক্ত সময়েই আয়ত্ত হয়। আমরা অধিকাংশ সময়েই ভাবনাশূন্য থাকি, অধিকাংশ সময়েই আত্মপরীক্ষা হইতে বিরত থাকি, তাহাতেই বোধ হয় যেন অধিকাংশ সময়েই আত্মজ্ঞান-বিরহিত হইয়া থাকি, যেন অধিকাংশ সময়ে কেবল বিষয়জ্ঞানেই মগ্ন

থাকি। কিন্তু বাস্তবিক কথা এই যে সেই সেই সময়ে আমাদের আত্মোপলব্ধিই হয় না, আত্মজ্ঞান অবশ্যই থাকে। "আমি জানিতেছি," "জ্ঞানটা আমার" এই তত্ত্ব মূলে না থাকিলে কোন তত্ত্বই জানিতে পারিতাম না।

এখন আমরা আর একটি স্বতঃসিদ্ধ মৌলিক তত্ত্বের ব্যাখ্যায় প্রবৃত্ত হইতেছি; পাঠক বিশেষরূপে মনোনিবেশ করুন্। পাঠক যখন বিষয়জ্ঞান ও বিষয়চিন্তা হইতে বিমুক্ত হইয়া আত্মাকে উপলব্ধি করিতে চেষ্টা করিতেছিলেন, তখন দেখিয়া থাকিবেন যে আত্মাকে সম্পূর্ণরূপে বিষয়চিন্তা হইতে মুক্ত করিতে পারেন নাই। ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে যে সকল বাহ্যবস্তু জ্ঞানগোচর হয়, সে সমস্তই জ্ঞানরাজ্য হইতে তিরোহিত হইয়া থাকিবে, সমুদায় ইন্দ্রিয়ক্রিয়া বন্ধ হইয়া থাকিবে, সমুদায় বাহ্যবস্তুর চিন্তা তিরোহিত হইয়া থাকিবে; মন নানা ভাবে আন্দোলিত না হইয়া স্থির গম্ভীর হইয়া থাকিবে। কিন্তু তথাপি আত্মাকে সম্পূর্ণরূপে বিষয়চিন্তা হইতে মুক্ত করিতে পারেন নাই। সমুদায় বিষয়চিন্তা চলিয়া গেলেও অন্ধকার আত্মার সাথী হইয়া রহিল। এই অন্ধকারকে জড়বস্তু না বলিতে পারেন, কিন্তু জড় না হইলেও ইহা একটি বিষয়। ইহা বাহ্যবিষয় কি অন্তর্বিষয়, জড়ীয় গুণ কি মানসিক গুণ, সে বিষয় আমরা এখন কিছুই বলিতেছি না। হয়ত পরে দেখা যাইবে যে ইহা আত্মা হইতে স্বতন্ত্র স্বাধীন কোন বস্তু নহে, ইহা আত্মাকে ছাড়িয়া থাকিতে পারে না; আমরা

এখন কেবল এই মাত্র বলিতেছি যে ইহা একটা বিষয়, ইহা বিষয়ী নহে, আত্মা নহে; আত্মার সঙ্গে ইহার প্রভেদ আছে, একটু দ্বৈতভাব আছে, আত্মজ্ঞান আর অন্ধকার-জ্ঞান এক বস্তু নহে; আত্মা অন্ধকারকে, জানিতে গিয়া আপনা হইতে প্রভেদ করা যায় এমন একটি বস্তুকে জানিতেছে, তাই আত্মা বলিতেছে যে সে আপনাকে জানিতেছে আর অন্ধকারকে জানিতেছে। আত্ম-জ্ঞানে আর অন্ধকার-জ্ঞানে যদি কোন প্রভেদ না থাকিত, তবে অন্ধকার-জ্ঞান তিরোহিত হইবার সঙ্গে সঙ্গে আত্মজ্ঞানও তিরোহিত হইত, তাহা হইলে আত্মা অন্ধকারকে ছাড়িয়া আমা-দের পূর্ব্ব দৃষ্টান্ত-স্থানীয় শাদা রং বা অন্য কোন বিষয়কে জানিতে পারিত না। ইহাতেই বুঝা যাইতেছে যে অন্ধকার-জ্ঞান প্রকাশিত হইবার সময়ে এই জ্ঞান আত্মজ্ঞানের সহিত সংযুক্ত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছিল বটে, কিন্তু ইহা আত্মজ্ঞানের সহিত অভিন্ন নহে; এই দুই জ্ঞানের মধ্যে বেশ একটু প্রভেদ আছে। তাই বলিতেছিলাম যে অন্ধকার-জ্ঞান কোন জড়বস্তু না হইলেও ইহা বিষয়, ইহাকে বিষয়ী হইতে প্রভেদ করা যায়। এখন আমাদের বক্তব্য এই যে আত্মা যতই বিষয়জ্ঞান-বিরহিত হইতে চেষ্টা করুক না কেন, যতই একাকী হইতে চেষ্টা করুক না কেন, ইহা কোন ক্রমেই সম্পূর্ণরূপে বিষয়-জ্ঞান-মুক্ত হইতে পারে না, কোন-না-কোন বিষয়জ্ঞান বা বিষয়-চিন্তা নিত্যই ইহার আত্মজ্ঞানের সাথী হইয়া থাকে।

কেবল থাকে বলিলে সব বলা হইল না,—থাকিবেই থাকিবে, থাকা অপরিহার্য্য। যেমন দেখা গিয়াছে যে আত্মজ্ঞান বিষয়-জ্ঞানের অপরিহার্য্য আশ্রয়, আত্মজ্ঞান আশ্রয়রূপে না থাকিলে কোন বিষয়জ্ঞানই সম্ভব হয় না, তেমনি ইহাও সত্য যে কোন-না-কোন বিষয়জ্ঞানকে অবলম্বন না করিয়া আত্মজ্ঞান প্রকাশিত হইতে পারে না, কোন-না-কোন বিষয়জ্ঞান না থাকিলে আত্মজ্ঞান সম্ভব হয় না। কোন-না-কোন বিষয়ের সহিত আপনার প্রভেদ না জানিলে আত্মা আপনাকেও জানিতে পারে না। দুটি সত্যে বিশেষ প্রভেদ এই যে আত্মজ্ঞান প্রত্যেক বিষয়-জ্ঞানের নিত্য আশ্রয়, নিত্য সঙ্গী, আত্মা প্রত্যেক বিষয়ের সহিত নিত্য জ্ঞেয়; কিন্তু কোন বিশেষ বিষয় আত্মজ্ঞানের নিত্য সঙ্গী নহে। একটা কিম্বা কতকগুলি নির্দ্দিষ্ট বিষয়কে যে আত্মার সঙ্গে সঙ্গে নিত্যই জানিতে হইবে তাহা নহে। কথাটা এই যে বিষয়টা যাহাই হউক্ না কেন, কোন-না-কোন একটা বিষয়কে সঙ্গে সঙ্গে না জানিলে আত্মাকে জানা যায় না। কেহ বলিতে পারেন যে তিনি উল্লিখিত আত্মোপলব্ধির সময়ে অন্ধকার-জ্ঞানকেও অতিক্রম করিতে পারেন, তখন অন্ধকারও তাঁহার জ্ঞানের বিষয়ীভূত থাকে না। ইহা কিছুই আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। যে জন্মান্ধ তাহার হয়ত অন্ধকার-বোধও নাই। কিন্তু সে হয়ত অন্ধকারের স্থলে কোন স্পর্শবোধ অনুভব করে, হয়ত যে আসনে সে উপবিষ্ট সেই আসনের স্পর্শ বোধ করে,

অথবা কোন স্পৃষ্ট বা শ্রুত বিষয়ের অস্ফুট স্মৃতি তাহার মনকে আশ্রয় করিয়া থাকে। যেমন চক্ষুশালী ব্যক্তির পক্ষে আলোকের অভাব অন্ধকার একটা অনুভবরূপে জ্ঞানের বিষয়ীভূত হয়, তেমনি হয়ত চক্ষুর্বিহীনের পক্ষে শব্দের অভাব স্তব্ধতা বা স্পর্শের অভাবরূপী কোন অবস্থা একটা অনুভবরূপে তাহার নির্জ্জন চিন্তার সঙ্গী হয়। মূল কথাটা এই যে কোন ভাবাত্মক বিষয়ই হউক আর আভাবাত্মক বিষয়ই হউক, কোন বাহ্যবিষয়ই হউক আর কোন মানসিক ভাব বা অবস্থাই হউক, কোন কার্য্যের চিন্তাই হউক আর অকার্য্যের চিন্তাই হউক,—যাহা কিছুর সঙ্গে আত্মার একটু প্রভেদ আছে, একটু দ্বৈতভাব আছে,—এরূপ কোন বিষয় আত্মজ্ঞানের নিত্য সঙ্গীরূপে থাকা চাই। আত্মা যে আপনাকে একাকী জানিতে পারে না, ইহার কারণ পাঠক কিঞ্চিৎ চিন্তা করিলেই বুঝিতে পারিবেন। আত্মা যে আপনাকে জানে, সে কিরূপে জানে?—জ্ঞাতারূপে। আত্মা যে-কোন বিষয়ই জানুক্, প্রত্যেক বিষয়ের সঙ্গে আপনাকে সেই বিষয়ের জ্ঞাতারূপে জানে। ইহার আত্মজ্ঞান যে-কোন বিষয়জ্ঞানের সঙ্গে প্রকাশিত হউক্, এই আত্মজ্ঞানের আকার এই—আমি জ্ঞাতা। আত্মা আপনাকে জ্ঞাতারূপেই জ্ঞাত হয়। কিন্তু 'জ্ঞাতা' কথাটা সম্বন্ধবাচক; জ্ঞাতা হইতে গেলেই জানা বিষয় চাই, কোন বিষয় জানিতেছে না এমন জ্ঞাতার কোন অর্থই নাই। কোন পাঠক বলিতে পারেন আত্মা কি আপনাকে আপনার জ্ঞাতারূপে জানিতে

পারে না ? হ্যাঁ, তা পারে, কিন্তু আত্মা আপনাকে জানিতে গেলেই কোন বিশেষ লক্ষণাক্রান্ত বলিয়া জানে ; আত্মা আপনাকে জানিতেছে, অথচ কোন লক্ষণাক্রান্ত বলিয়া জানিতেছে না, ইহা অসম্ভব। কিন্তু আত্মা আপনাকে যে-কোন লক্ষণাক্রান্ত বলিয়াই জানক্ না কেন, দেখা যাইবে সেই লক্ষণের সহিত বিষয়ের সম্বন্ধ আছে, কোন-না-কোন বিষয়কে না জানিলে সেই লক্ষণ জানা যায় না, কোন-না-কোন বিষয়কে না ভাবিলে সেই লক্ষণ ভাবা যায় না। আত্মা যদি আপনাকে অব্যাপ্ত, দেশাতীত বলিয়া ভাবে, সে ভাবনা কেবল ব্যাপ্ত বা দেশস্থিত বিষয়-ভাবনার সঙ্গেই সম্ভব হয়। আত্মা যদি আপনাকে স্থায়ী, অপরিবর্ত্তনীয় বলিয়া ভাবে, সে ভাবনা কেবল অস্থায়ী ও পরিবর্ত্তনশীল বিষয়-ভাবনার সঙ্গেই সম্ভব হয়। আত্মা যদি আপনাকে এক বলিয়া ভাবে, সে ভাবনা কেবল বহু বিষয়ের ভাবনার সঙ্গেই সম্ভব হয়। সুতরাং পাঠক দেখিবেন "বিষয়-জ্ঞান ছাড়া আত্মজ্ঞান থাকিতে পারে না" ইহাও একটী মূলতত্ত্ব। প্রথম মূলতত্ত্বটী অস্বীকার করিতে গেলে যেমন স্ববিরোধিতা দোষে দোষী হইতে হয়, এই তত্ত্বটী সম্বন্ধেও তাহা সত্য। যদি কোন পাঠক বলেন, "আমি কোন বিশেষ সময়ে কেবল আপনাকে জানিয়াছি, অন্য কোন বিষয়কে তখন জানি নাই, তবে আমরা পূর্ব্ববৎ বলি এই কথার প্রমাণ কি ? ইহার প্রমাণ অবশ্য স্মৃতি। পাঠকের স্মরণ হইতেছে যে সেই সময়ে

তিনি কেবল আপনাকেই জানিতেছিলেন, আর কোন বিষয়কে জানেন নাই ; তবেই হইল যে তাঁহার তখনকার সমস্ত জ্ঞানটুকু এই ছিল—"আমি কেবল আপনাকে জানিতেছি + আর কিছু জানিতেছি না"। পাঠক দেখিতেছেন যে এই জ্ঞানের প্রথমাংশের 'কেবল' কথাটীর মধ্যেই দ্বিতীয়াংশ টুকু নিহিত রহিয়াছে, আমরা কেবল স্পষ্টতার জন্য ইহাকে স্বতন্ত্রভাবে লিখিলাম। এই জ্ঞান যে নিরবচ্ছিন্ন আত্মজ্ঞান নহে, ইহার মধ্যে যে একটী স্পষ্ট বিষয়জ্ঞান রহিয়াছে, তাহাও সহজেই দেখা যাইতেছে ; সে বিষয়টি = আত্মার অতিরিক্ত অন্য বস্তুর অভাববোধ। এই অভাববোধ বিষয়জ্ঞান বা বিষয়-ভাবনার প্রকারান্তর মাত্র, সুতরাং আত্মজ্ঞানের সহিত ইহার কিছু প্রভেদ আছে, কিছু দ্বৈতভাব আছে। অতএব পাঠক দেখিতেছেন যে তিনি যে পূর্ব্ব মুহূর্ত্তে বলিতেছিলেন যে তিনি কেবল আপনাকে জানিতেছিলেন, ইহা নিতান্তই অসঙ্গত কথা। 'আত্মার অতিরিক্ত কোন বস্তুর অভাব বোধ', ইহার মধ্যে অন্ততঃ কোন একটা বিশেষ বিষয়ের ভাবনা থাকা চাই। "আমি কোন বিষয়কে জানিতেছি না" এই ভাবনা করিতে গিয়া আত্মা অপরিহার্য্য-রূপে বিষয়-জগতের প্রতিনিধিরূপে কোন একটা বিষয়কে চিন্তা করে। আকাশ, ভূমি, বৃক্ষ, কাগজ, কলম, সুখ, দুঃখ, এরূপ কোন একটা বস্তুর চিন্তাকে অবলম্বন না করিয়া "আমি কোন বিষয় জানিতেছি না," এই চিন্তা আসিতে পারে না।

সুতরাং দেখা যাইতেছে যে কোন-না-কোন বিষয়-ভাবনা আত্ম-জ্ঞানের নিত্য অপরিহার্য্য সঙ্গী। কোন একটা বিষয় হইতে আপনাকে প্রভেদ না করিয়া আত্মা আপনাকে উপলব্ধি করিতে পারে না।

আমরা জ্ঞানের দুটী মূল নিয়ম ব্যাখ্যা করিলাম। আমাদের বর্ত্তমান উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য যতটুকু জ্ঞানতত্ত্বের আলোচনা করা আবশ্যক, ততটুকু করিলাম। এখন অস্তিত্ব-তত্ত্ব আলোচনা করিব। এই অস্তিত্ব-তত্ত্ব আলোচনা করিবার পূর্ব্বে জ্ঞান ও বিশ্বাসের সম্বন্ধ বিষয়ে দুই একটী কথা বলা আবশ্যক। বিশ্বাস দুই প্রকার,—জ্ঞানগত বিশ্বাস ও অন্ধ বিশ্বাস। যে-কোন উপায়েই হউক, কোন বিষয়কে জানিয়া তাহাতে যে বিশ্বাস জন্মে, তাহাই জ্ঞানগত বিশ্বাস। এই বিশ্বাসই প্রকৃত বিশ্বাস। এই বিশ্বাস জ্ঞানের অপরিহার্য্য ফল; জ্ঞান লব্ধ হইলে এই বিশ্বাস আপনা হইতেই আসে, ইহার জন্য তপস্যা করিতে হয় না, অন্য কোন সাধন অবলম্বন করিতে হয় না; ইহার একমাত্র সাধন জ্ঞান। আর এক প্রকার বিশ্বাস নামক বস্তু আছে যাহা বাস্তবিক বিশ্বাস নহে, বিশ্বাসের ছায়া মাত্র। এই বিশ্বাস জানার অপেক্ষা রাখে না, বুঝার অপেক্ষা রাখে না, কেবল জনশ্রুতি বা হৃদয়ের কোন ভাবকে আশ্রয় করিয়া মনে উদিত হয়। জানা বুঝার অপেক্ষা রাখা দূরে থাক্, যাহা কোন প্রকারেই জানা যায় না, কোন প্রকারেই

ভাবা যায় না, যাহা ভাবিতে গেলে কেবলই অসঙ্গতিতে, কেবলই স্ববিরোধিতাতে, জড়িত হইতে হয়, এই অন্ধ বিশ্বাস এরূপ মিথ্যা বিষয়কে ও আশ্রয় করে। যাহা জানা যায় না, ভাবা যায় না, তাহাতে অবশ্য প্রকৃত বিশ্বাসও জন্মিতে পারে ন ; তাই বলিতেছিলাম যে উল্লিখিত অন্ধ বিশ্বাস বাস্তবিক বিশ্বাস নহে, বিশ্বাসের ছায়া মাত্র,—'বিশ্বাস করি' এই কল্পনা মাত্র। এরূপ বিশ্বাস অল্পাধিক পরিমাণে হয়ত আমাদের সকলের মধ্যেই আছে, কিন্তু জ্ঞানপিপাসু ব্যক্তি এরূপ বিশ্বাস লইয়া তৃপ্ত থাকিতে পারেন না। এই পুস্তকের পাঠকদিগের মধ্যে যদি এমন কেহ থাকেন যিনি এই অন্ধবিশ্বাসে পরিতৃপ্ত, তিনি এই মুহূর্ত্তেই পুস্তকখানা রাখিয়া দিতে পারেন, তাঁহার জন্য এই পুস্তক নহে। বিশুদ্ধ জ্ঞানলাভ তাঁহার পক্ষে অসম্ভব। জ্ঞানলাভে প্রবৃত্ত হইলেও অন্ধ বিশ্বাস তাঁহাকে পদে পদে প্রতারণা করিবে। পাতালনিবাসী মহীরাবণ পিতা দশরথের বেশ ধরিয়াই আসুক, আর মিত্র বিভীষণের বেশ ধরিয়াই আসুক, সে রাম-লক্ষ্মণের মহাশত্রু। অন্ধ বিশ্বাস সহজ জ্ঞানের বেশ ধরিয়াই আসুক, আর আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতার নাম করিয়াই আসুক, ইহা সমুদয় বিশুদ্ধ জ্ঞানের—সুতরাং বিশুদ্ধ ব্রহ্মজ্ঞানেরও—বিষম শত্রু। যে পাঠক বিশ্বাস সম্বন্ধে জ্ঞানের সাক্ষ্য মান্য করিতে প্রস্তুত, এবং কেবল জ্ঞানের কথাতেই পরিতৃপ্ত, তিনি আমাদের সঙ্গে চলুন, দেখি আত্মজ্ঞান ও বিষয়জ্ঞানের মধ্যে ব্রহ্মজ্ঞানকে খুঁজিয়া পাই কি না।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ—জড় ও আত্মা

পূর্ব্ব-ব্যাখ্যাত সত্যের আলোকে এখন জড়জগৎ ও আত্মার সহিত জড়জগতের সম্বন্ধের বিষয় আলোচনা করা যাক্। পাঠক ইতিপূর্ব্বেই দেখিয়াছেন প্রত্যেক জ্ঞানের বিষয় আত্ম-জ্যোতিতে পরিপূর্ণ, আত্মজ্যোতিতে প্রকাশিত। পাঠক এই সত্য এখন বিশেষরূপে উপলব্ধি করিতে চেষ্টা করুন। এই যে কাগজ, কালি, দোয়াত, কলম, টেব্‌ল্ প্রভৃতি দেখিতেছি, এই সমস্ত বস্তুর দর্শন আমার দর্শন, দৃষ্ট রূপগুলি আমার দৃষ্টি-রূপ জ্ঞানের সহিত সংবদ্ধ রহিয়াছে, যাহা দেখিতেছি তাহা আমারই দৃষ্টির বিষয়রূপে বর্ত্তমান রহিয়াছে। এই যে কলম, কাগজ, টেব্‌ল্ স্পর্শ করিতেছি, এই স্পর্শ আমারই স্পর্শ, স্পৃষ্ট বস্তুগুলি আমার স্পর্শজ্ঞানের সহিত সংবদ্ধ রহিয়াছে, আমার স্পর্শজ্ঞানের বিষয়রূপে বর্ত্তমান রহিয়াছে। এই রূপে যাহাই প্রত্যক্ষ করিতেছি সমুদয়কেই জ্ঞানের সহিত, জ্ঞানরূপী আত্মার সহিত, ঘনিষ্টভাবে সংযুক্ত সংবদ্ধ বলিয়া জানিতেছি। এই সমুদায়কে যখন প্রত্যক্ষ করি না, তখনও ইহাদের বিষয় ভাবিতে গেলে, ইহাদের অস্তিত্ব কল্পনা করিতে গেলে, ইহা-দিগকে কেবল জ্ঞানের সহিত সংবদ্ধ বলিয়াই ভাবিতে পারি। ভাবনা জ্ঞানের উপকরণ লইয়াই কার্য্য করে। ভাবনা জ্ঞানের উপকরণগুলিকে নানা প্রকারে নাড়াচাড়া করিতে পারে,

নানা প্রকারে ভাঙ্গাচুরি করিতে পারে, নানা প্রকারে সংযুক্ত বিযুক্ত করিতে পারে, কিন্তু নূতন উপকরণ গড়িতে পারে না। জড়বস্তুর বিষয় যাহা-কিছু আমরা জানি, ইহাদের যে-কোন রূপ, যে-কোন গুণ, যে-কোন অবস্থা, আমরা জানি, সমুদয়েরই সাধারণ লক্ষণ এই যে এই সকল রূপ গুণ বা অবস্থা জ্ঞানা বিষয়,—জ্ঞানরূপী আত্মার বিষয়াভূত বস্তু। সুতরাং ভাবনাও ইহাদিগকে কেবল জানা বস্তু, কেবল জ্ঞানরূপী আত্মার বিষয়ী-ভূত বস্তু, বলিয়াই কল্পনা করিতে পারে। যদি ভাবনার নূতন উপকরণ গড়িবার শক্তি থাকিত, তাহা হইলেও তাহা ভাবনার বিষয়ীভূত বস্তুই হইত, ভাবনাকারী আত্মার বিষয়ীভূত বস্তুই হইত ; জ্ঞানের সহিত অসংযুক্ত—জ্ঞান হইতে স্বতন্ত্র স্বাধীন—বস্তু হইত না। সুতরাং পাঠক দেখিতেছেন যে যাহাদিগকে আমরা জড়বস্তু বলি, তাহা জ্ঞানরূপী আত্মা হইতে বিযুক্ত, অসংযুক্ত, স্বতন্ত্র বলিয়া আমরা জানিও না, ভাবিতেও পারি না। জ্ঞাতা হইতে জানা বিষয়কে প্রভেদ করিতে পারি বটে, কিন্তু পৃথক্ করিতে পারি না। প্রভেদটা জ্ঞানের ভিতর, জ্ঞানের বাহিরে নহে। জড়ের জ্ঞান একটা সম্বন্ধ ; এই সম্বন্ধের এক দিক্ জ্ঞাতারূপী আত্মা, আর এক দিক্ বিষয়রূপী জড়। আত্মা বিষয়ী, জড় বিষয়। কিন্তু এই প্রভেদ জ্ঞানের ভিতরকার প্রভেদ, এই প্রভেদ জ্ঞানের বাহিরে খাটে না ; জ্ঞান-রূপ সম্বন্ধ বিচ্যুত হইলে,—জ্ঞাতার জানা বিষয়রূপে প্রতিভাত না

হইলে—জড়কে জানাও যায় না, ভাবাও যায় না। এখন কথা এই যে যাহা আমরা জানি না, এবং যাহা ভাবিতেও পারি না, যাহা ভাবা অসম্ভব, তাহা বিশ্বাসযোগ্যও নহে, এবং প্রকৃত পক্ষে তাহা বিশ্বাস করাও অসম্ভব; অথচ লোকে মনে করে যে তাহা বিশ্বাস করা যায় এবং বিশ্বাস করিতেছে। বাস্তবিক কথা এই যে লোকে তাহা বিশ্বাস করে না, কেবল মনে করে যে বিশ্বাস করে। জড়-বস্তুকে জ্ঞান-বিচ্যুত বলিয়া জানিও না, ভাবিতেও পারি না; জ্ঞানে ও ভাবনায় জড় আত্মার সহিত অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধে আবদ্ধ, অথচ লোকে মনে করে যে অস্তিত্ব বিষয়ে ইহা জ্ঞান হইতে স্বাধীন, স্বতন্ত্র,—কোন জ্ঞানের বিষয়ীভূত হউক্ আর নাই হউক্, জড় একাকী থাকিতে পারে। ইহা কেবল একটা মনে করা মাত্র, ঠিক মনে করাও নয়, একটা কথার কথা মাত্র। এই কথার কথাটা কেমন করিয়া আসিল তাহা আমরা পরে বুঝাইব। এখন পাঠক বিশেষ করিয়া বুঝুন্ যে ইহা একটা অসার কথার কথা মাত্র, একটা ভ্রান্ত অমূলক সংস্কার মাত্র। এই সংস্কারটা পোষণ করিতে গেলেই যে নিতান্ত অসঙ্গতিতে জড়িত হইতে হয়, স্ববিরোধিতা দোষে দোষী হইতে হয়, তাহা আমরা দেখাইতেছি। জড়বস্তু যতই ভিন্ন প্রকৃতি-বিশিষ্ট হউক্ না কেন, ইহাদের সাধারণ লক্ষণ এই যে ইহারা জ্ঞানা বস্তু। আমার হাতের কলমটার বিষয় কি

জানি? কি ভাবিতে পারি? এই জানি যে ইহা একটী বর্ণ, বিস্তৃতি, কঠিনতা, মসৃণতা প্রভৃতি লক্ষণযুক্ত বস্তু। কিন্তু এই সমস্ত লক্ষণই জ্ঞান-সাপেক্ষ, জ্ঞানের আশ্রিত। "বর্ণ" অর্থ যাহা দেখা যায়,—একটী দৃষ্ট বিষয়; ইহাকে ভাবিতে গেলেও একটী দৃষ্ট বিষয় বলিয়াই ভাবিতে হইবে। কঠিনতা, মসৃণতা ও তেমনি জানা বিষয়—স্পৃষ্ট বিষয়; ইহাদিগকে ভাবিতে গেলেও স্পৃষ্ট বিষয় বলিয়াই ভাবিতে হইবে। তেমনি বিস্তৃতিও দর্শন ও স্পর্শের সহিত জানা একটী বিষয়; ইহাকেও কেবল জানা বলিয়াই ভাবা যায়। সুতরাং যদি বিশ্বাস করিতে হয় যে এই সকল লক্ষণযুক্ত বস্তু জ্ঞান-বিচ্যুত হইয়া আছে, ইহা আমার বা অন্য কোন জ্ঞানের বিষয়ীভূত নয়, অথচ আছে, তবে এই অসঙ্গত অর্থহীন কথা বিশ্বাস করিতে হয় যে দৃষ্ট বা দর্শনগোচর বস্তু অদৃষ্ট হইয়া আছে, স্পৃষ্ট বা স্পর্শগোচর বস্তু অস্পৃষ্ট হইয়া আছে। লৌকিক চিন্তা এমনই ভ্রান্তি-জালে জড়িত, যে ইহা এই সকল অসঙ্গত স্ববিরোধী বাক্যকেও বিশ্বাসযোগ্য মনে করে। বাস্তবিক কথাটা এই যে কলমটা যখন ইন্দ্রিয়ের পরোক্ষে থাকে, তখনও লোকে ইহাকে দৃষ্ট ও স্পৃষ্ট বলিয়াই ভাবে, এরূপ না ভাবিলে ভাবনাই হইতে পারে না; কিন্তু ইন্দ্রিয়-ঘটিত ক্ষণিক জ্ঞান ছাড়া কোন নিত্য জ্ঞানের স্পষ্ট ধারণা নাকি তাহাদের নাই, তাই বাধ্য হইয়াই মনে করে যে কলমটা আছে, অথচ ইহা কোন জ্ঞানের বিষয়ীভূত নহে,—কোন জ্ঞানরূপী

আত্মার আশ্রিত নহে। পাঠক এই দৃষ্টান্তের অনুরূপ কতিপয় দৃষ্টান্ত লইয়া কিঞ্চিৎ ভাবিলেই বুঝিতে পারিবেন যে 'কোন জড়বস্তু আছে, অথচ ইহা কোন জ্ঞানের বিষয়ীভূত নহে, ইহা জ্ঞানরূপী আত্মা হইতে স্বাধীন স্বতন্ত্র ভাবে আছে', ইহা নিতান্তই অসঙ্গত অর্থহীন কথা। জড়বস্তুর পক্ষে থাকা আর জানা হওয়া একই কথা,—জানা হওয়াতেই ইহার অস্তিত্ব, জানা না হইয়া অন্য প্রকারে থাকা,—জ্ঞানরূপী আত্মা হইতে স্বাধীন স্বতন্ত্রভাবে থাকা—ইহার পক্ষে অসম্ভব।

আমরা ক্রমে জড়ের প্রত্যেক গুণ, এবং কোন কোন দার্শনিক জড়ীয় আধার নামক যে বস্তু কল্পনা করেন, তদ্বিষয়ে বিশেষ আলোচনা করিয়া দেখাইব যে জড় জ্ঞান হইতে স্বতন্ত্র স্বাধীন বস্তু নহে,—জ্ঞান জড়ের নিত্য অপরিহার্য্য আশ্রয়। কিন্তু তৎপূর্ব্বে জড় সম্বন্ধে যে লৌকিক ভ্রম দেখিতে পাওয়া যায়, সেই ভ্রমের কারণ প্রদর্শন করিব। এই ভ্রমের মূল কারণ আত্মার প্রকৃতি সম্বন্ধে ভ্রান্ত সংস্কার। অশিক্ষিত চিন্তাহীন লোক শরীরকেই আত্মা বলিয়া মনে করে; 'আমি' বলিতে শরীরকেই ভাবে। যাঁহারা বুঝিয়াছেন আত্মা নিরাকার, অভৌতিক, তাঁহাদের অনেকে কিয়ৎপরিমাণে ভ্রমমুক্ত হইয়াছেন বটে, কিন্তু অনেকেই মূল ভ্রম হইতে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত হইতে পারেন নাই। এই শ্রেণীর লোকদের নিরাকারত্ব ও অভৌতিকত্ব সম্বন্ধে পরিষ্কার ধারণা নাই; ইঁহারা আত্মাকে

নিরাকার ও অভৌতিক বলিয়াও ইহাতে প্রকারান্তরে সাকারত্ব ও ভৌতিকত্ব আরোপ করেন। ইঁহারা মনে করেন আত্মা একটা বিশেষ দেশখণ্ডে আবদ্ধ একটা সূক্ষ্ম বস্তুবিশেষ। আত্মা যখন ক্ষুদ্র দেশখণ্ডে আবদ্ধ একটা ক্ষুদ্র বস্তু, তখন কাজেই সেই দেশখণ্ডের পক্ষে যাহা বাহির, যাহা-কিছু সেই দেশখণ্ডের বাহিরে আছে, সে সমস্তই আত্মার বাহিরে। সে সমস্তকে আত্মার সহিত অচ্ছেদ্যভাবে সংযুক্ত বস্তু বলা, আত্মার আশ্রিত বস্তু বলা, কেবল দার্শনিক প্রলাপ মাত্র। এই রূপে জড়ে আত্মবোধ করিয়া; আত্মাতে জড়ীয় গুণ বিস্তৃতি ও আয়তন আরোপ করিতে গিয়া, লোক অধ্যাত্মজগতের গভীর সত্যের সম্বন্ধে অন্ধ হয়, আপন অজ্ঞানতা ও চিন্তাহীনতা-প্রসূত সংস্কারকে "সহজ জ্ঞান" বলিয়া বিশ্বাস করে এবং জ্ঞানী-দিগের সূক্ষ্ম জ্ঞান-দৃষ্টি-ঘটিত সত্যকে বুঝিতে না পারিয়া ইহাকে অবোধ্য প্রলাপবাক্য বলিয়া মনে করে। এই শ্রেণীর লোকেরা দেখেন না যে আত্মাকে কোন দেশখণ্ডে আবদ্ধ বস্তু মনে করিলেই ইহাও মনে করিতে হয় যে ইহার কিছু আয়তন আছে; আর ইহার আয়তন আছে বলিলেই ইহার নিরাকারত্ব ও অভৌতিকত্ব আর রহিল না, ইহা সাকার ও ভৌতিক হইয়া গেল। বাস্তবিক কথা এই, আত্মা জ্ঞানরূপী, আত্মা জ্ঞানবস্তু, ইহা আপন জ্ঞানজ্যোতিতে আপনি প্রকাশিত, এবং ইহার জ্ঞানে বিষয়ও প্রকাশিত, ইহার জ্ঞানে আশ্রয় লাভ

করিয়াই বিষয় অস্তিত্ববান্ হয়। এই জ্ঞানই আত্মার মূল-স্বরূপ। এই জ্ঞানে দৈর্ঘ্য, প্রস্থ, আয়তনের ভাব কিছুই নাই। জ্ঞান দীর্ঘও নহে, হ্রস্বও নহে; প্রশস্তও নহে, অপ্রশস্তও নহে; গভীরও নহে, অগভীরও নহে; এরূপ কোন গুণযুক্তই নহে। সুতরাং জ্ঞানরূপী আত্মাকে আয়তনশালী বস্তু মনে করা, অথবা একটি আয়তনশালী বস্তুতে আবদ্ধ মনে করা, নিতান্তই ভ্রম। জড়ের সঙ্গে আত্মার দেশগত সম্বন্ধ নাই, জড়ের সঙ্গে আত্মার কেবল জ্ঞানগত সম্বন্ধ; আত্মা জ্ঞাতা, বিষয়ী; জড় জানা বিষয়। সুতরাং আত্মা কোন নির্দ্দিষ্ট দেশখণ্ডে আছে, এই কথা কেবল এই অর্থেই সত্য হইতে পারে যে আত্মা সেই দেশখণ্ডকে জানিতেছে। এই অর্থে বলা যায় যে আত্মা যাহা-কিছু জানিতেছে তাহাতেই আছে। আত্মা যে-সমস্ত বস্তু জানে তার কোন বিশেষ একটাতে সে আবদ্ধ থাকিতে পারে না। কোন বিশেষ একটাতে আবদ্ধ থাকিলে সে অন্যগুলিকে জানিতে পারিত না। আমি আমার হাত, কলম ও কাগজ এই তিনটী বস্তু দেখিতেছি। এই তিনটী বস্তু পরস্পরের বাহিরে। লোকে ভাবে যে এই তিনটী বস্তু যেমন পরস্পরের বাহিরে এবং পরস্পর হইতে স্বতন্ত্র, আত্মা তেমনি একটা চতুর্থ বস্তু, ইহাও এই তিনটা বস্তুর ন্যায় একটী স্বতন্ত্র দেশখণ্ড অধিকার করিয়া আছে, আর সেখান হইতে এই বস্তুত্রয়কে দেখিতেছে। এই ভ্রম থাকাতেই লোকে জড়কে জ্ঞান-নিরপেক্ষ

মনে করে। বাস্তবিক কথা এই যে জ্ঞানরূপী আত্মা এই তিন বস্তুকেই সমানভাবে অধিকার করিয়া আছে; আত্মা ইহাদের কোন একটাতে আবদ্ধ নহে, আর ইহাদের অতীত কোন দেশখণ্ডেও অবস্থিত নহে। আত্মা জ্ঞানবস্তু, যাহা-কিছু জ্ঞানের বিষয়ীভূত তাহাই আত্মার ভিতর, আত্মা সমুদায় জ্ঞানা বস্তুর আশ্রয় ও অবলম্বন। যাহা হউক, জ্ঞানের সহিত দেশের সম্বন্ধ আমরা পরে আরো বিস্তৃতভাবে আলোচনা করিব।

জড়বস্তুকে জ্ঞান-নিরপেক্ষ বস্তু বলিয়া মনে করিবার আর একটা কারণ এই যে জ্ঞান বলিলে সাধারণতঃ লোকে আপন আপন ব্যক্তিগত জ্ঞানকে বুঝে, জীবের সীমাবদ্ধ জ্ঞানকে বুঝে। আমরা জানি যে আমাদের জ্ঞান অতি ক্ষুদ্র সীমায় আবদ্ধ। আমরা এক কালে, এক দৃষ্টিতে বা একবারের স্পর্শবোধ দ্বারা, জড়জগতের অতি অল্পই জানিতে পারি, কত অল্প যে জানি তাহা আমরা পরে বিশেষরূপে দেখাইব। আর, যে টুকু জানি সে টুকুও সকল সময়ে আমাদের জ্ঞানে থাকে না। অথচ আমাদের বিশ্বাস এই,—আর এই বিশ্বাস কিছু অমূলক নহে,—যে জড়জগৎ আমাদের ব্যক্তিগত জ্ঞানের ভূমি পরিত্যাগ করিলেও বর্ত্তমান থাকে। জ্ঞান বলিতে যখন লোকে ব্যক্তিগত জীবগত জ্ঞানই বুঝে, তখন এরূপ ভাবা কিছুই বিচিত্র নহে যে জগৎ যখন আমাদের ব্যক্তিগত জ্ঞানকে ছাড়িয়া থাকে, তখন জ্ঞান-নিরপেক্ষ হইয়াই থাকে, তখন ইহা কোন জ্ঞানের আশ্রয়ে

থাকে না। কিন্তু আমরা যে বলিয়াছি যে জড়জগৎ জ্ঞান-নিরপেক্ষ হইয়া থাকিতে পারে না, ইহার অর্থ কিছু এই নয় যে ইহা ব্যক্তিগত জ্ঞান-নিরপেক্ষ হইয়া থাকিতে পারে না। আমরা কিছু এই কথা বলি না যে আমরা যখন জগৎকে না জানি তখন ইহা বিলুপ্ত হয়; আমরা কেবল এই কথাই বলি যে যখন আমরা ইহাকে না জানি, তখনও ইহা জ্ঞানকে অবলম্বন করিয়া থাকে। যে জ্ঞানকে অবলম্বন করিয়া থাকে, সেই জ্ঞানের সহিত ব্যক্তিগত জ্ঞানের কি সম্বন্ধ তাহা পাঠক ক্রমশঃ বুঝিতে পারিবেন। পাঠক অবশ্য স্বীকার করিবেন যে আমরা ব্যক্তিগত জ্ঞানদ্বারা জড়ের যে তত্ত্ব জানি তাহা সত্য তত্ত্ব; ফলতঃ ব্যক্তিগত জ্ঞান ব্যতীত জগৎ সম্বন্ধে প্রকৃত তত্ত্ব জানিবার আর উপায়ই বা কোথায়? কিন্তু ব্যক্তিগত জ্ঞান-দ্বারা আমরা জড়ের প্রকৃতি সম্বন্ধে কি জ্ঞান লাভ করি? এই জ্ঞানই কি লাভ করি না যে ইহা জ্ঞানাশ্রিত বস্তু? ফলতঃ ইহা ব্যতীত অন্য কোন জ্ঞান সম্ভবই নহে; জ্ঞানগোচর বস্তু কেবল জ্ঞানাধীন বলিয়াই জানা হইতে পারে। আমরা জ্ঞান-দ্বারা যখন জগতের এই প্রকৃতিই জানিলাম যে ইহা জ্ঞানাধীন বস্তু, তখন কাজেই বিশ্বাস করিতে হইবে যে যখন আমরা জগৎকে না জানি, তখনও ইহা কোন জ্ঞানকে আশ্রয় করিয়াই বর্ত্তমান থাকে, তাহা না হইলে ইহার থাকাই ঘটে না। আমরা সহজ চলিত ভাষায় কথাটা বলিলাম। ইহাতে আপাততঃ মনে

হইতে পরে যে আমরা যখন জগৎকে জানি না তখন যেন ইহা আমাদের জ্ঞান হইতে সম্পূর্ণরূপে ভিন্ন অন্য কোন জ্ঞানকে আশ্রয় করে; কিন্তু বস্তুতঃ তাহা নহে। আমরা ক্রমে দেখাইব—এখন বলিলে পাঠক সে কথা হয়ত ভাল বুঝিতে পারিবেন না—যে ভিন্ন ভিন্ন আত্মা যে জগৎটাকে লইয়া লুফালুফি করিতেছে তাহা নহে; যাহাকে আমরা ব্যক্তিগত জ্ঞান বলি তাহা কেবল ব্যক্তিগত নহে, ব্যক্তিগত জীবনে তাহার প্রকাশ সীমাবদ্ধ হইলেও মূলে তাহা সীমাবদ্ধ নহে। যে জ্ঞান আমাদের ব্যক্তিগত জীবনে প্রকাশিত হয়, যাহা আমাদের জানা সমুদায় বস্তুর আলোক ও আধাররূপে প্রকাশিত হয়, তাহা আমাদের ব্যক্তিগত অজ্ঞানতা, বিস্মৃতি ও নিদ্রার সময়েও চিরজাগ্রৎ থাকিয়া, আপনার নিকট আপনি প্রকাশিত থাকিয়া, জগৎকে ধারণ করিয়া থাকে। যাহা হউক, এই সকল কথা যথা স্থানে বিস্তৃতভাবে বলা যাইবে।

আমরা এখন জড়ের প্রত্যেক গুণের বিষয় আলোচনা করিয়া দেখাইব যে এই সকল গুণ জ্ঞান-নিরপেক্ষ স্বতন্ত্র বস্তু নহে, এই সকল গুণ জ্ঞানরূপী আত্মাকে অবলম্বন না করিয়া থাকিতে পারে না। জড় সম্বন্ধে লৌকিক ভ্রান্ত সংস্কার দূরীকরণের পক্ষে আমাদের এই পরিচ্ছেদটী সর্ব্বাপেক্ষা অধিক প্রয়োজনীয়; সুতরাং ইহাতে পাঠকের বিশেষ মনোযোগ দেওয়া আবশ্যক।

বিস্তৃতি বা দেশ-ব্যাপ্তি জড়ের সাধারণ গুণ; জড়বস্তু মাত্রই বিস্তৃত বা দেশে ব্যাপ্ত। বর্ণ, ঘ্রাণ, উষ্ণতা, শীতলতা প্রভৃতি বিশেষ বিশেষ গুণ বিশেষ বিশেষ বস্তুর থাক্ আর নাই থাক্, বিস্তৃতি জড়বস্তু মাত্রেরই আছে। এই বিস্তৃতি বা দেশ যে জ্ঞানরূপী আত্মার আশ্রিত বস্তু, ইহা যে জ্ঞান-নিরপেক্ষ স্বাধীন স্বতন্ত্র বস্তু নহে, এই তত্ত্বের সাধারণ ব্যাখ্যা ইতিপূর্ব্বে দেওয়া হইয়াছে, এখন আমরা ইহা কিছু বিশেষ ভাবে ব্যাখ্যা করিব। সম্মুখস্থ কাগজ-খণ্ডকে দৃষ্টান্ত-স্থানীয় করা যাক্। এই কাগজ-খণ্ডকে যতক্ষণ কেবল দেখিতেছি, স্পর্শ করিতেছি না, ততক্ষণ ইহার কেবল দুটী গুণ আমাদের সমক্ষে প্রকাশিত—ইহার বিস্তৃতি ও ইহার শাদা রং। এই শাদা রঙের পরিবর্ত্তে ইহাতে সহজেই নীল, হরিদ্রা, সবুজ বা অন্য কোন রং দেওয়া যায়। এই রূপে ইহাকে যে-কোন বর্ণে রঞ্জিত করা যায়, এবং যে-কোন বর্ণে রঞ্জিত বলিয়া কল্পনা করা যায়। এমন কোন বর্ণ নাই যাহা ইহার না থাকিলেই নয়, যাহা ইহার পক্ষে অপরিহার্য্য। কিন্তু পাঠক দেখিবেন যে ইহাতে যে-কোন বর্ণ দেওয়া যাক্ না কেন, ইহাকে যে-কোন রংযুক্ত বলিয়া কল্পনা করা যাক্ না কেন, প্রত্যেক বর্ণের সঙ্গে বিস্তৃতি বা দেশ থাকা একান্ত আবশ্যক। দেশের সহযোগেই বর্ণ আবির্ভূত হয়, এবং দেশের সহযোগ ভিন্ন বর্ণ কল্পিত হইতে পারে না; দেশ বর্ণের পক্ষে অপরিহার্য্য।

কিন্তু অপর দিকে বর্ণ দেশের পক্ষে অপরিহার্য্য নহে। আমরা দেখিয়াছি যে শাদা চলিয়া গেলে দেশ নীলের সঙ্গে থাকিতে পারে, নীল চলিয়া গেলে সবুজের সঙ্গে থাকিতে পারে; কোন বিশেষ বর্ণই দেশের পক্ষে অপরিহার্য্য নহে। কেবল তাহাই নহে; আদৌ কোন বর্ণ না থাকিলেও দেশ থাকিতে পারে। অন্ধের বর্ণজ্ঞান নাই, অথচ দেশজ্ঞান আছে; স্পর্শবোধের সঙ্গে তাহার সমক্ষে দেশ প্রকাশিত হয়। কেবল অন্ধেরই বা কেন, যাহাদের চক্ষু আছে তাহাদেরও কেবল স্পর্শবোধের সঙ্গে দেশের জ্ঞান হইতে পারে ও হইয়া থাকে। এই স্পর্শ-বোধের বেলায়ও দেখিতে পাওয়া যায় যে উষ্ণতা, শীতলতা, মসৃণতা, কর্কশতা, কঠিনতা, এই সমুদায় বোধের সঙ্গে দেশজ্ঞান অপরিহার্য্য, দেশের সহযোগ ভিন্ন এই সমুদায় বোধ আবির্ভূত হইতে পারে না, কল্পিতও হইতে পারে না; কিন্তু দেশ এই সমুদায়ের কোনটারই অপেক্ষা রাখে না। উষ্ণতা না থাকিলে শীতলতার সঙ্গে দেশজ্ঞান হইতে পারে, শীতলতা না থাকিলে মসৃণতা বা কর্কশতার সঙ্গে দেশজ্ঞান হইতে পারে, ইত্যাদি; এই সমুদায় অনুভবের মধ্যে কোনটাই দেশজ্ঞানের পক্ষে অপরিহার্য্য নহে। কেবল তাহাই নহে; যেখানে কোনও স্পর্শবোধই নাই, সেখানেও কেবল কোন বর্ণের সহযোগে দেশ প্রকাশিত হইতে পারে। সুতরাং আমরা পূর্ব্বে যেমন দেখিয়াছিলাম যে দেশ বর্ণ-নিরপেক্ষ-

পেক্ষ, বর্ণ-সাপেক্ষ নহে, তেমনি এখন দেখিতেছি যে দেশ স্পর্শ-নিরপেক্ষ, ইহা স্পর্শের অধীন নহে, স্পর্শ-সাপেক্ষ নহে।

সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, যে-সমস্ত গুণের সঙ্গে দেশ প্রকাশিত হয় ইহা সে-সমস্ত গুণের কোনটারই অধীন নহে, ইহার পক্ষে কোনটাই অপরিহার্য্য নহে, কিন্তু ইহা এই সকল গুণের প্রকাশের পক্ষে অপরিহার্য্য। কেবল তাহাই নহে; একে একে এই সকল গুণের বিলয় ভাবিতে পারি, কিন্তু দেশের বিলয় ভাবিতে পারি না। শাদা, নীল প্রভৃতি বর্ণের বিলয় ভাবিতে পারি, উষ্ণতা, শীতলতা প্রভৃতি স্পর্শ-বোধের বিলয় ভাবিতে পারি, কিন্তু দেশের বিলয় ভাবিতে পারি না। এই কাগজ-খণ্ডের বর্ণ, মসৃণতা, কঠিনতা প্রভৃতি সমস্ত গুণ বিলুপ্ত, ধ্বংস-প্রাপ্ত হইয়াছে ভাবিতে পারি, কিন্তু ইহা যে দেশখণ্ড অধিকার করিয়া আছে তাহা বিলুপ্ত হইয়াছে ইহা কদাচ ভাবিতে পারি না। পূর্ব্বোক্ত গুণসমূহের অস্তিত্ব চিন্তার পক্ষে অপরিহার্য্য নহে, ইহার অস্তিত্ব চিন্তার পক্ষেও অপরিহার্য্য। কিন্তু ইহা দেখা আবশ্যক যে ইহার পক্ষে বর্ণাদি কোন বিশেষ গুণ অপরিহার্য্য না হইলেও ইহাকে জানিতে হইলে বা কল্পনা করিতে গেলে কেবল বর্ণাদি গুণের আধাররূপেই জানা যায়, ভাবা যায়। অন্যরূপে,—একটী স্বতন্ত্র বস্তুরূপে—ইহা জানা হইতে পারে না, কল্পিতও

হইতে পারে না। ইহা যে অপরিহার্য্য, সে কেবল বর্ণাদি গুণের আধাররূপেই অপরিহার্য্য। এই আলোচনা-দ্বারা এই দুটী সত্য প্রতীত হইতেছে:— (১) দেশ কোন জ্ঞান-নিরপেক্ষ স্বাধীন বস্তু নহে। জ্ঞান-নিরপেক্ষ বস্তু যাহা, জ্ঞানের পক্ষে যাহা পর, তাহার সঙ্গে জ্ঞানের এমন কিছু অচ্ছেদ্য সম্বন্ধ থাকিতে পারে না যে তাহাকে না জানিয়া অপর কতকগুলি বস্তুকে জানা যায় না, এবং তাহার অনস্তিত্ব চিন্তাই করা যায় না। জ্ঞান-নিরপেক্ষ বস্তু জ্ঞানের পক্ষে অপরিহার্য্য হইতে পারে না; তাহার প্রকৃতি এমন হওয়াই আবশ্যক যে তাহাকে জ্ঞান জানিতে পারে, না জানিতেও পারে। কিন্তু দেশ জ্ঞানের পক্ষে অপরিহার্য্য; বর্ণস্পর্শাদি অনুভবের সঙ্গে দেশের জ্ঞান অপরিহায্য; দেশের সহিত জ্ঞানের সম্বন্ধ অচ্ছেদ্য। যাহার সঙ্গে জ্ঞানের এরূপ ঘনিষ্ঠ অচ্ছেদ্য সম্বন্ধ তাহা নিশ্চয়ই জ্ঞান-সাপেক্ষ। আরো, যাহা জ্ঞান-নিরপেক্ষ, জ্ঞানের সম্বন্ধে পর, তাহাকে যদি জানাও যায়, তথাপি তাহার সম্বন্ধে কোন একান্ত-নিশ্চিত অকাট্য কথা বলা যায় না; তাহা আজ যেমন আছে, কাল তেমন না থাকিতে পারে, এই মুহূর্ত্তে যেরূপ আছে, পর মুহূর্ত্তে সেরূপ না থাকিতে পারে। আর, তাহাকে না জানিয়া যে তাহার সম্বন্ধে ভবিষ্যৎবাণী, তাহা একবারেই অসম্ভব। কিন্তু দেশের সম্বন্ধে জ্ঞান অকাট্য কথা বলে, ভবিষ্যৎবাণীও বলে। প্রথমতঃ, ইহা

নিশ্চিত কথা যে জড়বস্তু অন্যান্য গুণ সম্বন্ধে যতই পরিবর্ত্তিত হউক না কেন, ইহার বিস্তৃতি থাকিবেই থাকিবে; জড়ের পক্ষে দেশ অপরিহার্য্য। অন্যান্য গুণ আসিতে পারে যাইতে পারে, দেশ অটলভাবে বর্ত্তমান থাকিবে। যে বস্তু আমাদের ব্যক্তিগত জ্ঞানে প্রতিভাত হয় নাই, তাহার সম্বন্ধেও এই কথা একান্ত সত্য। ভবিষ্যতে যে সকল বর্ণ স্পর্শাদি অনুভব করিব তৎসম্বন্ধেও ইহা নিশ্চয় যে ঐ সকল বিজ্ঞান দেশে প্রতিভাত হইবে। দ্বিতীয়তঃ, আমাদের জ্ঞানা দেশের যে দৈর্ঘ্য, প্রস্থ ও বেধ এই তিনটী গুণ আছে, আমরা জানি আমাদের ব্যক্তিগত জ্ঞানের বাহিরে যে দেশ আছে তাহারও এই তিনটী গুণই আছে। আমরা সেই দেশকে প্রত্যক্ষ না করিয়াও এই কথা নিশ্চিতরূপে বলিতে পারি। এখন কথা এই যে দেশ জ্ঞান-সাপেক্ষ জ্ঞানের নিজস্ব বস্তু বলিয়াই জ্ঞান দেশের প্রকৃতি সম্বন্ধে এই সকল নিশ্চিত অকাট্য কথা, এই সকল অখণ্ডনীয় ভবিষ্যৎবাণী, বলিতে পারিতেছে; দেশ জ্ঞান-নিরপেক্ষ স্বতন্ত্র বস্তু হইলে এই সকল কদাচ সম্ভব হইত না।* (২) দেশ জ্ঞান-সাপেক্ষ জ্ঞানের নিজস্ব বস্তু বটে, কিন্তু যখন ইহা কেবল

* গণিত-শাস্ত্রের অকাট্য অনতিক্রমণীয় সত্যসমূহ দেশের জ্ঞান-সাপেক্ষতার উপর নির্ভর করে। দেশ জ্ঞান-নিরপেক্ষ হইলে এই সকল সত্য অকাট্য অনতিক্রমণীয় হইত না। বিষয়টী সাধারণ পাঠকের বোধগম্য হইবে না বলিয়া ইহা বিস্তৃতরূপে বলা হইল না।

বর্ণ স্পর্শাদি বিজ্ঞানের নিত্য অবলম্বনরূপেই জ্ঞেয়,—বর্ণ স্পর্শাদির নিত্য অবলম্বন ব্যতীত যখন অন্য কোন রূপে ইহাকে জানাও যায় না, ভাবাও যায় না, তখন বুঝা যাইতেছে যে ইহা স্বয়ং একটী বিষয় নহে, ইহা বর্ণাদি গুণ অনুভব করিবার পক্ষে জ্ঞানের অপরিহার্য্য প্রকরণ মাত্র। বর্ণাদি গুণ জ্ঞানের উপকরণ, কিন্তু দেশকে ছাড়িয়া বর্ণাদি গুণ জ্ঞানের বিষয়ীভূত হইতে পারে না, দেশকে ছাড়িয়া আত্মা বর্ণাদি গুণ জানিতে পারে না; কেবল দেশরূপ প্রণালী বা প্রকরণ অবলম্বন করিয়াই আত্মা বর্ণাদি গুণ জানিতে পারে, এই জন্যই দেশকে জড় সম্বন্ধীয় জ্ঞানের অপরিহার্য্য প্রকরণ বলা হইল। *

দর্শনশাস্ত্রে অনভিজ্ঞ পাঠকের পক্ষে এই ব্যাখ্যা কত দূর তৃপ্তিকর হইল জানি না। প্রথম পাঠে যে সকল কথা জটিল ও অতৃপ্তিকর বোধ হইয়াছে, আশা করি সচিন্ত মনে কয়েকবার পাঠ করিলে সেই সকল কথাই অধিকতর বোধগম্য ও তৃপ্তিকর বোধ হইবে। যাহা হউক, আমরা আর এক প্রণালীতে দেশের জ্ঞানাধীনতা ব্যাখ্যা করিতেছি। আশা করি এই ব্যাখ্যা কোন

---

* See Kant's *Critique of Pure Reason*: Transcendental Æsthetic; and Prof. E. Caird's Critical *Philosophy of Kant*, Book I., Chapter II. See also the relative sections of Prof T. H. Green's *Introduction to Hume's Works* and pp. 228-251 of the second volume of Green's Works.

কোন পাঠকের পক্ষে উপরিস্থ ব্যাখ্যা অপেক্ষা অধিকতর সুবোধ্য ও তৃপ্তিকর হইবে।

আমাদের দৃষ্টান্ত-স্থানীয় কাগজখণ্ডকে প্রকৃত বা কাল্পনিক রেখাদ্বারা কয়েকটী অংশে বিভক্ত করুন্। এরূপ অসংখ্য অংশে এই দেশখণ্ড বিভক্ত হইতে পারে। এরূপ অসংখ্য অংশেই এই দেশখণ্ড গঠিত। দেশের প্রকৃতিই এই যে ইহা অসংখ্য অংশে বিভাজ্য; ইহা অসংখ্য অংশের সমষ্টি। দেশ যতই ক্ষুদ্র হউক না কেন, ইহার অংশ থাকিবেই থাকিবে। এমন ক্ষুদ্র দেশ থাকিতে পারে না যাহা বিভাজ্য নহে, যাহার অংশ নাই। এমন ক্ষুদ্র দেশ অবশ্য থাকিতে পারে যাহাকে বিভাগ করা মানুষ বা কোন জীবের সাধ্যায়ত্ত নহে; কিন্তু এস্থলে জীবের সাধ্য অসাধ্যের কথা হইতেছে না; জীব যাহা ভাগ করিতে পারে না, প্রকৃতপক্ষে তাহারও অংশ আছে। দেশের প্রকৃতিই এমন, যে তাহা যতই ক্ষুদ্র হউক না কেন, তাহার অংশ থাকিবেই থাকিবে; অথবা, অন্য কথায়, তাহা বিভাজ্য হইবেই হইবে; দেশ অংশবিহীন অখণ্ড হইতে পারে না। যদি কোন পাঠক বলেন যে এমন তো হইতে পারে যে কোন দেশখণ্ডকে বিভাগ করিতে করিতে এমন ক্ষুদ্র অংশে পঁহুছান গেল যাঁহাদের আর অংশ হয় না, যাহারা কেবল বিন্দুমাত্র, যাহাদের কোন আয়তন নাই, —তাহার উত্তর এই যে এই সমুদায় কল্পিত বিন্দু বস্তুতঃ দেশের অংশ নহে; দেশের অংশ যাহা, যাহাদের সমষ্টিতে দেশের

উৎপত্তি, তাহাদের আয়তন থাকা আবশ্যক; অংশবিহীন আয়তন-শূন্য কোটী কোটী বিন্দুর সমষ্টিতেও আয়তনযুক্ত দেশের উৎপত্তি হইতে পারে না। দেশ যতই ক্ষুদ্র হউক না কেন, ইহার আয়তন থাকিবেই থাকিবে; সুতরাং ইহা অসংখ্য অংশযুক্ত, ইহা অসীমরূপে বিভাজ্য হইবে। এখন আমাদের দৃষ্টান্ত-স্থানীয় দেশখণ্ড এবং ইহার ভিন্ন ভিন্ন অংশ, যাহারা পরস্পরের বাহির অথচ পরস্পরের সহিত সংযুক্ত, ইহাদের সহিত জ্ঞানের সম্বন্ধ চিন্তা করুন্। পাঠক সাধারণভাবে বুঝিয়াছেন যে, যাহা কিছু জ্ঞানে প্রকাশিত তাহাই জ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত, জ্ঞানে ধৃত ও অবস্থিত, জ্ঞান তাহার অপরিহার্য্য আশ্রয়। ইহাও সাধারণ ভাবে দেখিয়াছেন যে বিস্তৃতিশালী বস্তুসমূহ পরস্পরের বাহির হইলেও সমুদায়ই নির্ব্বিশেষরূপে জ্ঞানের ভিতর, জ্ঞানের আশ্রিত। এখন আমরা বিশেষভাবে এই দেখাইতে চাই যে এই দেশখণ্ডের ভিন্ন ভিন্ন অংশগুলির মধ্যে যে সংযোগ রহিয়াছে, যে সংযোগের উপর দেশখণ্ডের অস্তিত্ব নির্ভর করে, সেই সংযোগের অপরিহার্য্য কারণ জ্ঞান; জ্ঞানেরই সংযোগকারী শক্তিতে ইহারা সংযুক্ত রহিয়াছে। ভিন্ন ভিন্ন বস্তুর সংযোগ বলিলেই এমন কিছু বুঝায় যাহা স্বয়ং এক অখণ্ড হইয়াও সাধারণভাবে সমস্ত বস্তু-গুলিকে অধিকার করিয়া সমুদায়কে সংযুক্ত করিতেছে,—তাহাদের পৃথকত্ব দূর করিতেছে। বন্ধনসূত্র ভিন্ন বন্ধন হইতে পারে না। এস্থলে সেই সাধারণ বস্তু কি? সেই বন্ধন-সূত্র

কি? এস্থলে এবং এরূপ সমুদায় স্থলেই সেই সাধারণ বস্তু—সেই বন্ধনসূত্র—জ্ঞান,—জ্ঞানরূপী আত্মা। জ্ঞান যদি এই সকল ভিন্ন ভিন্ন অংশের কোন বিশেষ অংশে আবদ্ধ থাকিত, তবে এই সমুদায় অংশ পরস্পর সংযুক্ত হইতে পারিত না, এবং এই সংযোগের অভাবে দেশখণ্ডও গঠিত হইতে পারিত না। জ্ঞান স্বয়ং এক অখণ্ড হইয়াও ইহাদের প্রত্যেকের মধ্যে বর্ত্তমান, ইহা প্রত্যেককে অধিকার করিয়া আছে, প্রত্যেকের আশ্রয় হইয়া রহিয়াছে, তাহাতেই সকলে সংযুক্ত হইতে পারিয়াছে। জ্ঞান ইহাদের সাধারণ আধার, এবং জ্ঞানই ইহাদের সংযোগকারী। আমরা কিছু এমন বলিতেছি না যে এই সকল সংযুক্ত অংশ পূর্ব্বে বিযুক্ত ছিল, পরে জ্ঞান ইহাদিগকে টানিয়া সংযুক্ত করিয়াছে। ইহা বলা আমাদের অভিপ্রায় নহে। পরস্পর স্বাধীন ভাবে অবস্থিত ভিন্ন ভিন্ন অংশকে টানিয়া আনিয়া যে সংযোগ করা হয়, আমরা সে কৃত্রিম সংযোগের কথা বলিতেছি না। যে সংযোগ দেশের প্রকৃতিগত ধর্ম্ম, যে সংযোগ ব্যতীত দেশের অস্তিত্ব সম্ভব নহে, সেই সংযোগের কথাই বলিতেছি। এই কাগজ খানাকে টুকরা টুকরা করিয়া ইহাকে পরস্পর বিযুক্ত সহস্র অংশে বিভাগ করা যায়, কিন্তু ইহা যে দেশখণ্ড অধিকার করিয়া আছে, সেই দেশখণ্ডকে পরস্পর-বিযুক্ত অংশে বিভাগ করা যায় না। ভিন্ন ভিন্ন অংশের সংযোগেই ইহার অস্তিত্ব। এই সকল ভিন্ন ভিন্ন অংশ আবার ভিন্ন ভিন্ন ক্ষুদ্রতর অংশের

সংযোগে গঠিত। এইরূপে অসীম অংশের সংযোগেই দেশের অস্তিত্ব। আমরা এই সংযোগের কথাই বলিতেছি। এই সংযোগ একটী কালাধীন ক্রিয়া নহে; ইহা এক কালে ছিল না, কোন বিশেষকালে ঘটিয়াছে, এরূপ ক্রিয়া নহে; ইহা একটী কালাতীত ক্রিয়া,* অথবা ইহাকে যদি ক্রিয়া বলিতে আপত্তি হয়, ইহাকে একটী অবস্থা বলা যাইতে পারে। ইহাকে যাহাই বলা হউক, ইহা জ্ঞান-সাপেক্ষ, জ্ঞানাধীন। ইহাকে যদি ক্রিয়া বলা যায়, তবে বলিতে হইবে যে জ্ঞান ইহার অপরিহার্য্য কারণ। ইহাকে যদি অবস্থা বলা যায়, তবে বলিতে হইবে যে জ্ঞান ইহার অপরিহার্য্য আশ্রয়। কোন কোন পাঠক বলিতে পারেন ভিন্ন ভিন্ন উপকরণের সংযোগ বলিলেই তো এই বুঝায় যে সংযুক্ত উপকরণগুলি স্বয়ং স্বতন্ত্র, স্বয়ং তাহারা সংযোগের অপেক্ষা না রাখিয়া, সুতরাং সংযোগকারীর অপেক্ষা না রাখিয়া, থাকিতে পারে; কেবল সংযোগে উৎপন্ন যে বস্তু তাহারই অস্তিত্ব সংযোগের উপর নির্ভর করে; কেবল তাহাই সংযোগ-সাপেক্ষ। দেশ জ্ঞানদ্বারা সংযুক্ত ভিন্ন ভিন্ন অংশের সমষ্টি, ইহা বলিলে ইহাই কি স্বীকার করা হইল না যে সমষ্টির উপকরণগুলি স্বয়ং জ্ঞাননিরপেক্ষ, কেবল সমষ্টিটাই জ্ঞান-সাপেক্ষ? এই কথার উত্তর প্রকারান্তরে পূর্ব্বেই দেওয়া হইয়াছে। কৃত্রিম সংযোগের স্থলে এই কথা খাটে, সন্দেহ নাই; কৃত্রিম সংযোগ-

* A timeless act."—T. H. Green.

কারীর সহিত সংযুক্ত উপকরণগুলির কোন অপরিহার্য্য সম্বন্ধ নাই, তাহা ঠিক। সেরূপ স্থলে সংযুক্ত উপকরণগুলি বিযুক্ত অবস্থায়ও থাকিতে পারে, সুতরাং সংযোগকারীকে ছাড়িয়াও থাকিতে পারে। কিন্তু দেশের স্থলে এই কথা খাটে না। দেশ ব্যাপারটাই এরূপ যে সংযোগের উপরই ইহার অস্তিত্ব নির্ভর করে। ইহা কেবল একটী অনন্ত সংযোগেরই ব্যাপার। কোন একটী বিশেষ দেশখণ্ডের অংশগুলির যোগ যেমন জ্ঞানের উপর নির্ভর করে, প্রত্যেক অংশ আবার তেমনি ইহার অভ্যন্তরস্থ অংশগুলির সংযোগের উপর নির্ভর করে; এইরূপে অসীম অংশের সংযোগেই দেশের অস্তিত্ব। এস্থলে অগ্রে উপকরণ পরে সংযোগ, এরূপ রীতি নহে; এস্থলে সংযোগের উপরই উপকরণের অস্তিত্ব নির্ভর করে; সংযোগ ব্যতীত উপকরণ অভাবনীয়, অর্থহীন।*

জড় জ্ঞানের প্রকরণ যাহা, তাহা যে জ্ঞানাধীন, জ্ঞানাশ্রিত, তাহা দেখান হইল; এখন জড়-জ্ঞানের উপকরণ যে বর্ণ কঠিনতা প্রভৃতি গুণ, ইহারাও যে জ্ঞানাশ্রিত, ইহারাও যে কোন জ্ঞান-নিরপেক্ষ বস্তু বা বস্তুর গুণ নহে, আমরা তাহাই দেখাইব। আমরা দেখাইব যে ইহারা মনোবিকার, ইন্দ্রিয়বোধ বা বিজ্ঞান-মাত্র। ইংরেজ মনোবিজ্ঞানবিদেরা যাহাকে 'feeling' বা 'sensation' বলেন, বৌদ্ধ দার্শনিকেরা যাহাকে 'বিজ্ঞান'

---

* See Green's *Prolegomena to Ethics*, Book I, Chap I, Secs. 28, 29.

বলেন, আমরা দেখাইব যে ইহারা তাহাই। আমরা বৌদ্ধ দার্শনিকদের ভাষায় ইহাদিগকে "বিজ্ঞান'ই বলিব। বিজ্ঞান জ্ঞানরূপী আত্মার আশ্রিত বিষয়; জ্ঞানরূপী আত্মাকে ছাড়িয়া ইহার কোন অস্তিত্বই সম্ভব নহে। মূল আলোচনায় প্রবৃত্ত হইবার পূর্ব্বে বিজ্ঞানের সহিত জ্ঞানরূপী আত্মার সম্বন্ধের বিষয় কিঞ্চিৎ আলোচনা করা যাক্। পাঠক মনে করুন্ যেন একটা ব্যথা অনুভব করিতেছেন। ব্যথাটা একটা বিজ্ঞান। বিজ্ঞানটা কেমন করিয়া হইল, কি কারণে কিসের দ্বারা উৎপন্ন হইল, এই সকল বিষয় রাখিয়া দিয়া কেবল বিজ্ঞানটা এবং ইহার আশ্রয়রূপী আত্মার সঙ্গে ইহার যে সম্বন্ধ, তাহাই চিন্তা করুন্। এক দিকে দেখুন্ যে ব্যথাটার সঙ্গে আত্মার কিছু প্রভেদ আছে, কিছু দ্বৈতভাব আছে। ব্যথাটা কিছু আত্মা নয়, আত্মাও কিছু ব্যথা নয়। কিন্তু অপর দিকে ব্যথাটা আত্মারই একটা বিজ্ঞান, আত্মার সহিত সম্বন্ধ ছাড়িয়া দিলে ইহা কিছুই নয়; আত্মার সহিত সম্বন্ধচ্যুত হইলেই ইহার বিলয়, ইহার ধ্বংস। কোন আত্মা অনুভব করিতেছে না, অথচ একটা ব্যথা আছে, একটা বিজ্ঞান আছে, এই কথা অর্থহীন অসম্ভব কথা। ফলতঃ 'বিজ্ঞান' বা 'feeling' কথাটা কোন স্বাধীন স্বতন্ত্র বস্তুর পরিচায়ক নহে। সুবিধার জন্য আমাদিগকে 'বিজ্ঞান' বা 'feeling' কথাটা ব্যবহার করিতে হয় বটে, কিন্তু 'কেবল বিজ্ঞান' বা 'mere feeling' বলিয়া কোন

বস্তু নাই, খাঁটি বস্তুটা হচ্ছে "আমি বোধ করি" বা "I feel।" "একটা বিজ্ঞান"="আমি একবার বোধ করি"; "দুটা বিজ্ঞান"="আমি দুবার বোধ করি;" "একটা বিজ্ঞান-শৃঙ্খল"="আমি ক্রমাগত বোধ করি;" সুতরাং বিজ্ঞান বা বিজ্ঞান-শৃঙ্খল বলিয়া কোন বস্তু নাই; জ্ঞানী আত্মাকে ছাড়িয়া বিজ্ঞান বা বিজ্ঞান-শৃঙ্খল কিছুই নহে।

আমরা এখন দেখাইব যে ব্যথা যেমন একটা বিজ্ঞান, ব্যথা যেমন আত্মাকে ছাড়িয়া থাকিতে পারে না, তেমনি বর্ণ, স্পর্শাদি, যাহাদিগকে আমরা জড়ীয় গুণ বলি, ইহারাও বিজ্ঞান-মাত্র, জ্ঞানরূপী আত্মাকে ছাড়িয়া ইহাদের অস্তিত্ব সম্ভব নহে। প্রথমতঃ বর্ণের বিষয় আলোচনা করা যাক্। বর্ণ একটী দৃষ্ট বা দৃষ্টিগোচর বিষয়; ইহা দৃষ্টরূপেই জ্ঞানের সমক্ষে প্রকাশিত হয়, এবং আমরা যখন ইহাকে না দেখি তখনও কেবল কোন-না-কোন আত্মার দৃষ্ট বিষয়রূপেই ইহাকে ভাবিতে পারি। যাহাকে কেবল দৃষ্ট বিষয়রূপেই জানি, এবং দৃস্ট বিষয়রূপেই ভাবিতে পারি, তাহা অদৃষ্ট হইয়া আছে, ইহা বিশ্বাস করিতে গেলে কিরূপ অসঙ্গত স্ববিরোধী কথায় বিশ্বাস করিতে হয় তাহা পাঠক ইতিমধ্যেই দেখিয়াছেন। যাহা হউক, বর্ণ যে জ্ঞান-নিরপেক্ষ স্বতন্ত্র বস্তু নহে, ইহা যে একটী বিজ্ঞানমাত্র, তাহা আমরা এস্থলে একটু বিশেষ ভাবে বুঝাইতেছি। বর্ণ বিজ্ঞানমাত্র নহে,—ইহা একটী জ্ঞান-নিরপেক্ষ বস্তু, এই ভ্রম

হইবার একটী কারণ এই যে বর্ণ দেশের সংযোগে প্রকাশিত হয় ; বর্ণকে দেশের সঙ্গে একীভূত বলিয়া বোধ হয়, বর্ণকে একটা বিস্তৃত বস্তু বলিয়া বোধ হয়। একটা বিস্তৃত, দেশে ব্যাপ্ত বস্তু যে একটা বিজ্ঞানমাত্র, তাহা অসঙ্গত বলিয়া বোধ হয়। কিন্তু আমরা দেখাইয়াছি যে দেশ বর্ণের সঙ্গে এক নহে, দেশ বর্ণ-সাপেক্ষ নহে, দেশ বর্ণ-নিরপেক্ষ। ইহাও দেখান হইয়াছে যে দেশ যদিও একটা বিজ্ঞান নহে, কিন্তু ইহা জ্ঞান-নিরপেক্ষ স্বতন্ত্র বস্তু নহে, ইহা জ্ঞানেরই প্রকরণ ; ইহা বর্ণ ও স্পর্শজ্ঞানের অপরিহার্য্য প্রকরণ। সুতরাং বর্ণ দেশ-সংযোগে জানা হয় বলিয়া ইহার জ্ঞান-সাপেক্ষতা সম্বন্ধে যে সন্দেহ হয়, সে সন্দেহ অমূলক। যাহা দেখি, দর্শনেন্দ্রিয়ের সাহায্যে যাহা বোধ করি, তাহাই বর্ণ, তাহা ছাড়া বর্ণ আর কিছুই নহে। কিন্তু যাহা দর্শন করি তাহা দর্শন-ক্রিয়া হইতে স্বাধীন ভাবে আছে, ইহা অসঙ্গত কথা। অন্ধের পক্ষে বর্ণ কিছুই নহে। দর্শক ও দর্শন-শক্তি না থাকিলে বর্ণ বলিয়া কোন বিষয়ই থাকিত না।

বর্ণ যে একটী বিজ্ঞানমাত্র, তাহা না বুঝিবার আর একটি কারণ এই :—দার্শনিক চিন্তাবিহীন লোকের নিকট বোধ হয় যেন একই দৃষ্ট রূপ ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তির দৃষ্টির বিষয় হইতে পারে এবং হইয়া থাকে, যেন একই রূপকে ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তি দেখিতে পারে এবং দেখিয়া থাকে। বিজ্ঞান ব্যাপারটা একান্তই ব্যক্তিগত,

প্রত্যেক ব্যক্তি কেবল নিজের বিজ্ঞানকেই সাক্ষাৎ ভাবে জানিতে পারে, একটা বিজ্ঞান একাধিক জ্ঞানের বিষয়ীভূত হইতে পারে না। তোমার ব্যাথা কেবল তুমিই বোধ করিতে পার, আমি কেবল পরোক্ষভাবে তাহার খবর জানিতে পারি মাত্র, তাহা বোধ করা আমার পক্ষে অসম্ভব। আমি যাহা বোধ করি তাহা কেবল আমারই মনের ব্যথা। দৃষ্ট বর্ণ যখন এক কালে অনেক জ্ঞানের বিষয়ীভূত হইতে পারে, তখন ইহাকে আর বিজ্ঞান বলা যায় কিরূপে, মানসিক অবস্থা বলা যায় কি রূপে? লোকের মনে মনে এই যুক্তিটা কার্য্য করে। এখন, বাস্তবিক কথা এই যে এক রূপই যে ভিন্ন ভিন্ন জ্ঞানের বিষয়ীভূত হয়, এ কথাটা নিতান্তই ভুল। বাস্তবিক কথা এই যে প্রত্যেক দ্রষ্টা নিজ নিজ জ্ঞানের সমক্ষে প্রকাশিত ভিন্ন ভিন্ন রূপ দেখে; যতগুলি দ্রষ্টা ততগুলি রূপ। রূপগুলি পরস্পর সদৃশ বটে, কিন্তু ইহারা সংখ্যায় এক নহে। এমন কি, আমরা প্রত্যেকে আমাদের দুই চক্ষুতে দুটী স্বতন্ত্র কিন্তু সদৃশ রূপ দেখি; নানা কারণে দর্শন কালে এই দুটী রূপ মিলিত হইয়া যায়। আমরা ২।১টী দৃষ্টান্তদ্বারা এই কথার সত্যতা বুঝাইতেছি। পাঠক একজন বন্ধুর সঙ্গে বসিয়া কোন বস্তুর দিকে, যথা, সম্মুখস্থ পুস্তকের প্রতি, দৃষ্টিপাত করুন্। আপনাদের বোধ হইতেছে যেন দুজনেই একটী রূপ দেখিতেছেন; এই ভ্রম শীঘ্রই দূর হইবে। এক জন তাঁহার এক

চক্ষু বুজাইয়া কেবল অপর চক্ষুদ্বারা বস্তুটীকে দেখুন্; তার পর এই চক্ষুটীর নীচের পাতায় একটী অঙ্গুলি দিয়া চক্ষুটীকে নাড়ুন্, দেখিবেন যে ব্যক্তি এরূপ করিতেছেন তাঁহার দৃষ্ট রূপটি নাড়িতেছে, চক্ষুটীর সঙ্গে সঙ্গে নৃত্য করিতেছে; অথচ অপর ব্যক্তির দৃষ্ট রূপ স্থির রহিয়াছে। এখন পাঠক ভাবুন্ এই দুই ব্যক্তির দৃষ্ট রূপ একই কি না? পাঠক আরো দেখিবেন যে চক্ষু স্থির থাকিলে দৃষ্ট রূপগুলিও স্থির থাকে, চক্ষু নাচিলে তাহারাও নাচে, ইহাদ্বারাই বুঝিতে পারিবেন দৃষ্ট রূপগুলি দৃষ্টি-নিরপেক্ষ স্বাধীন স্বতন্ত্র বস্তু, অথবা দৃষ্টি-সাপেক্ষ জ্ঞানাশ্রিত চিত্র মাত্র। দুই চক্ষুদ্বারা যে আমরা দুটী চিত্র দেখি তাহারও প্রমাণ পাঠক হাতে হাতেই পাইতে পারেন। স্বাভাবিক অবস্থায় চক্ষুদ্বয় পরস্পরের সম-সরল রেখায় থাকে। পাঠক পূর্ব্ববৎ একটী অঙ্গুলিদ্বারা এই স্বাভাবিক অবস্থার কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তন করুন্। একটী চক্ষুর গোলককে কিঞ্চিৎ নামাইয়া বা উঠাইয়া দিন্; দেখিবেন দুই চক্ষুতে দুটী রূপ দেখিতেছেন। যে পাঠক মনে করেন যে আমাদের দৃষ্ট রূপগুলি জ্ঞান-নিরপেক্ষ স্বতন্ত্র বস্তু, তাহাকে জিজ্ঞাসা করি এই দুটী রূপের মধ্যে কোন্‌টী খাঁটি বস্তু, আর কোন্‌টী ছায়া, আর ছায়াটাই বা কোথা হইতে আসিল? স্থির চক্ষুতে যেটী দেখিতেছেন সেটীকেই যদি খাঁটি বস্তু বলিয়া সাব্যস্থ করেন, তবে সেই চক্ষুটীকেও নাচাইলে দেখিবেন, যে রূপটী স্থির ছিল

তাহাও নাচিতে আরম্ভ করিয়াছে। দুটী চক্ষু এক সঙ্গে নাচাইলে দেখিবেন দুটী চিত্রই নাচিতেছে। ফলতঃ এখানে কোন্‌টা খাঁটি, কোন্‌টা অখাঁটি, তাহার কথাই আসিতে পারে না। যাহা দেখি, দৃষ্টির পক্ষে তাহাই খাঁটি। যাহা দেখা যায়, তাহাকে বস্তুই বল আর রূপই বল, প্রতিরূপই বল আর প্রতিবিম্বই বল, সে সমুদায়ই এক জাতীয় বস্তু। যাহা দেখি তাহা দৃষ্টি-সাপেক্ষ চিত্র মাত্র; সুতরাং দৃষ্টি-প্রণালীর পরিবর্ত্তনানুসারে তাহা পরিবর্ত্তনশীল। যাহা দেখি তাহা দৃষ্টির পক্ষে খাঁটি, চক্ষুর পক্ষে খাঁটি, কিন্তু অন্যান্য ইন্দ্রিয়ের পক্ষে খাঁটি নহে। যাহা দেখা যায়, তাহা কেবল দেখাই যায়, তাহা স্পর্শ করা যায় না, আস্বাদন করা যায় না, অন্য কোন প্রকারেই অনুভব করা যায় না।

দৃষ্ট বিষয়ের প্রকৃতি সম্বন্ধে ভ্রম হইবার আর একটী কারণ এই যে লোকে মনে করে যে, যাহা স্পর্শের বিষয় তাহাই দর্শনেরও বিষয়, যাহা স্পর্শ করা যায় তাহাই দেখা যায়। একটী বিষয়কেই ভিন্ন ভিন্ন লোকের স্পর্শের বিষয় মনে করে, সুতরাং সেই স্পৃষ্ট বিষয়ের একটী রূপই ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তির দৃষ্টির বিষয় বলিয়া মনে করে। একটী বিষয় ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তির স্পর্শের বিষয় হইতে পারে কি না, পরে বিবেচ্য; কিন্তু ইহা নিশ্চয়ই যে যাহা স্পর্শ করা যায় তাহা কেবল স্পর্শই করা যায়, তাহা দর্শন করা যায় না। স্পর্শের বিষয়—উষ্ণতা, শীতলতা, মসৃণতা, কর্কশতা, কোমলতা, কঠিনতা, এই সমস্ত। দর্শনের

বিষয়—শ্বেত, পীত, নীল, লোহিত প্রভৃতি বর্ণ। উষ্ণতা কঠিনতা প্রভৃতি দর্শনের বিষয় হইতে পারে না; শ্বেত পীতাদিও কিছু স্পর্শের বিষয় হইতে পারে না। দৃষ্ট বিষয় স্পৃষ্ট বিষয়ের সঙ্গে কার্য্য-কারণ সূত্রে গ্রথিত, সন্দেহ নাই; কিন্তু এই দুই প্রকার বিষয় প্রকৃতিতে সম্পূর্ণ ভিন্ন ভিন্ন।

দৃষ্টির বিষয় সম্বন্ধে অনেক লৌকিক ভ্রম আছে, এই সকল ভ্রমবশতঃ লোকে দৃষ্ট বিষয়ের প্রকৃত স্বরূপ বুঝিতে পারে না। যাহা হউক, এই সমুদায় ভ্রম বিস্তৃতরূপে প্রদর্শন করিবার উপযুক্ত স্থান আমাদের নাই; এস্থলে কেবল আর দুটী ভ্রম সঙ্ক্ষেপে প্রদর্শন করিব। এই সকল বিষয়ে যাঁহাদের বিশেষ আলোচনা করিবার ইচ্ছা, তাঁহারা মনোবিজ্ঞান-সম্বন্ধীয় কোন বৃহৎ গ্রন্থ পাঠ করিবেন। এস্থলে আলোচ্য প্রথম ভ্রম এই যে লোকে মনে করে দৃষ্ট রূপগুলি চক্ষু হইতে দূরে থাকিতে পারে এবং থাকে,—দূরত্ব একটা দৃষ্ট বিষয়। কিন্তু বস্তুতঃ তাহা নহে। আমরা প্রত্যেকে যাহা দেখি তাহা আমাদের আপন আপন চক্ষু-সংলগ্ন চিত্র মাত্র। দৃষ্ট বস্তু যে দূরস্থ বলিয়া বোধ হয় তাহা অভিজ্ঞতা ও ভাবযোগের ফল। দৃষ্টি-সম্বন্ধীয় অভিজ্ঞতাশূন্য ব্যক্তির নিকট সমুদায় দৃষ্ট বস্তুই চক্ষু-সংলগ্ন বলিয়া বোধ হয়। জন্মান্ধ ব্যক্তি অস্ত্র-চিকিৎসায় দৃষ্টি-শক্তি লাভ করিলে সমুদায় বস্তুই প্রথমতঃ চক্ষু-সংলগ্ন দেখিতে পায়, ইহা বৈজ্ঞানিক পরীক্ষায় সপ্রমাণ হইয়াছে। শিশুদিগের

প্রাথমিক অভিজ্ঞতাও বোধ হয় তদনুরূপ, এই জন্যই বোধ হয় শিশুরা হাত বাড়াইয়া চাঁদ ধরিতে চায়। দূরত্ব দর্শন করা আমাদের পক্ষে অসম্ভব কেন তাহা সহজেই বুঝা যায়। চক্ষুর সম্মুখস্থ দূরত্ব এমন একটী সরল রেখা যাহা চক্ষুর সঙ্গে সম-সরল রেখায় প্রসারিত। এরূপ সরল রেখায় বিস্তৃতি দর্শন যে আমাদের পক্ষে অসম্ভব তাহা পাঠক চক্ষুর সম্মুখে সেই ভাবের একটী যষ্টি ধরিলেই বুঝিতে পারিবেন। এরূপ রেখার দুই প্রান্তের মধ্যে কেবল এক প্রান্ত—অর্থাৎ যে প্রান্ত চক্ষুসংলগ্ন কেবল সেই প্রান্তই—আমরা দেখিতে পারি। সুতরাং চক্ষুর সম্মুখস্থ দূরত্ব দর্শন করা,—দূরস্থ রূপ দর্শন করা—আমাদের পক্ষে অসম্ভব। আমরা অনেক স্থলেই দেখি যে আমাদের দৃষ্ট চিত্রের সহিত কার্য্যকারণ সূত্রে গ্রথিত যে স্পৃশ্য বস্তু, তাহাকে স্পর্শ করিতে হইলে অল্পাধিক দূরে যাইতে হয়। এই দূরত্বের পরিমাণ অনুসারে দৃষ্ট চিত্রের বর্ণ ও আয়তনের তারতম্য হয়। এই বর্ণ ও আয়তনের তারতম্য দেখিয়া এবং অন্যান্য উপায়ে আমরা আমাদের দৃষ্ট চিত্র হইতেই স্পৃশ্য বস্তুর দূরত্বের জ্ঞান লাভ করি। অভ্যাস-বশতঃ এই অভিজ্ঞতা-লব্ধ পরোক্ষ জ্ঞান প্রত্যক্ষ সহজ জ্ঞানরূপে প্রতিভাত হয়। যাহা হউক, যাহাকে দূর বলিয়া জানি তাহা দৃশ্য নহে, তাহা স্পৃশ্য। যাহা দেখি তাহা দূরে নহে; তাহা চক্ষু-সংলগ্ন।

দৃষ্টিসম্বন্ধে আর একটী লৌকিক ভ্রম এই যে আমরা এক কালে, এক দৃষ্টিতেই, খুব বৃহৎ বস্তু দেখিতে পারি। বাস্তবিক কথা এই যে আমরা এক কালে, এক দৃষ্টিতে, যাহা দেখি তাহা অতি ক্ষুদ্র, তাহা চক্ষু হইতে বৃহত্তর নহে। উপরে যাহা বলা হইল তদ্দারাই এই কথা অনেকাংশে পরিষ্কার হইবে। আমরা যাহা দেখি তাহা যখন আমাদের চক্ষু-সংলগ্ন চিত্র ব্যতীত আর কিছুই নহে, তখন তাহা চক্ষু হইতে বৃহত্তর হইবে কি রূপে? যতটুকু চক্ষুর সমান ততটুকু দেখাই সম্ভব। যাহা হউক, পাঠক আর এক উপায়ে এই তত্ত্বের প্রমাণ পাইতে পারেন। পাঠক হাতের অঙ্গুলি গুটাইয়া একটী সরু চোঙ্গার মতন করুন্, আর তার ভিতর দিয়া কোন বস্তুর দিকে দৃষ্টিপাত করুন্। চোঙ্গার বেড়ের দিকে মনোযোগ না করিয়া কেবল দৃষ্ট চিত্রের দিকে তাকাইলে বোধ হইবে চিত্রটী চোঙ্গার বেড় অপেক্ষা অনেক বড়; কিন্তু চোঙ্গার বেড় এবং চিত্র উভয়ের দিকে মনোযোগ করিলে দেখিতে পাইবেন সমগ্র চিত্রটী চোঙ্গার বেড়ের ভিতরে আবদ্ধ, সুতরাং চিত্রটী চোঙ্গার বেড় অপেক্ষা বৃহত্তর নহে। এতদ্দারাই বুঝিতে পারা যায় যে যাহা আমরা এক দৃষ্টিতে দেখি তাহা নিতান্ত ক্ষুদ্র বস্তু। তাহা যে বৃহৎ বলিয়া বোধ হয় ইহা অভিজ্ঞতার ফল। অভ্যাসবশতঃ অভিজ্ঞতা-লব্ধ জ্ঞান সহজ জ্ঞান বলিয়া বোধ হয়। আমরা দীর্ঘকাল-ব্যাপী অভিজ্ঞতা দ্বারা জানিয়াছি যে আমরা যে দৃশ্য দেখিতেছি তাহার সহিত

কার্য্য-কারণ সূত্রে সম্বন্ধ বস্তু অতি প্রকাণ্ড, তাই এই ক্ষুদ্র দৃশ্য দেখিয়া ভাবযোগে সেই প্রকাণ্ড বস্তুর কথা মনে পড়ে, আর এই মনে পড়াটাকে আমরা সহজ জ্ঞান-সিদ্ধ প্রত্যক্ষ জ্ঞান বলিয়া ভ্রম করি। আশা করি এই সমুদায় তত্ত্ব জানার পর পাঠক আর "সহজ জ্ঞান" কথাটা লইয়া বাড়াবাড়ি করিবেন না। "সহজ জ্ঞান" অনেক স্থলেই অজ্ঞানতার নামান্তর-মাত্র।

উপরিস্থ বর্ণ-বিষয়ক আলোচনাতে আমরা কেবল বর্ণের আলোচনায় আবদ্ধ থাকি নাই, বর্ণের আধাররূপে যে দেশ প্রকাশিত হয়, তৎসম্বন্ধীয় আলোচনাও বর্ণ সম্বন্ধীয় আলোচনার সঙ্গে অনিবার্য্যরূপে মিশিয়া গিয়াছে। যাহা হউক, তাহাতে কিছু ক্ষতি হয় নাই। আমরা এখন কেবল বর্ণ সম্বন্ধে কয়েকটি কথা বলিব। বর্ণ যদি জ্ঞান-নিরপেক্ষ স্বতন্ত্র বস্তু হইত, তবে ইহা নিশ্চিত যে দ্রষ্টা বা দৃষ্ট-প্রণালীর পরিবর্ত্তনানুসারে ইহা পরিবর্ত্তিত হইত না। যাহা জ্ঞান-নিরপেক্ষ, জ্ঞাতা হইতে স্বতন্ত্র পদার্থ, তাহা জ্ঞাতার বা জ্ঞান-প্রণালীর পরিবর্ত্তনানুসারে পরিবর্ত্তিত হইবে কেন? জ্ঞাতা বা জ্ঞানী-প্রণালীর পরিবর্ত্তনে পরিবর্ত্তিত হইলেই বুঝা গেল জানা বিষয়টা জ্ঞানের উপরেই নির্ভর করিতেছে, বিষয়টা জ্ঞাতার বিজ্ঞান ব্যতীত আর কিছুই নহে। আমরা দেখাইতেছি যে বর্ণ, ঘ্রাণ, আস্বাদ, শব্দ, স্পর্শ এই সমস্ত বিষয়ই জ্ঞাতা এবং জ্ঞান-প্রণালীর পরিবর্ত্তনা-

নুসারে পরিবর্ত্তনশীল। কোন বস্তুকে শুধু চক্ষুতে যে বর্ণবিশিষ্ট বলিয়া বোধ হয়, অনুবীক্ষণে দেখিলে সে বর্ণ পরিবর্ত্তিত হইয়া হইয়া যায়। দূর হইতে দেখিলে এক বর্ণের বোধ হয়, নিকটে গিয়া দেখিলে আর এক বর্ণের বলিয়া বোধ হয়। অধিক আলোকে দেখিলে এক বর্ণের দেখায়, অল্প আলোকে দেখিলে অন্য বর্ণের দেখায়। তীক্ষ্ণ দৃষ্টির কাছে এক বর্ণের, ক্ষীণ দৃষ্টির কাছে আর এক বর্ণের বোধ হয়। সুস্থ চক্ষুর কাছে যাহা শাদা, পাণ্ডু-পীড়িত চক্ষুর কাছে তাহাই হরিদ্রা। ভিন্ন ভিন্ন দর্শন-প্রণালীতে এই যে দুই ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীর বর্ণ দেখিতে পাওয়া যায়, এই দুই শ্রেণীর বর্ণের মধ্যে কোন শ্রেণীর বর্ণ বস্তুর প্রকৃত বর্ণ? কোন্‌টা দৃষ্টি-নিরপেক্ষ স্বতন্ত্র বস্তু, আর কোন্‌টাই বা অপ্রকৃত বর্ণ—দৃষ্টি-সাপেক্ষ জ্ঞানাশ্রিত বস্তু? আর অপ্রকৃত বর্ণটাই বা কি প্রকার বস্তু? সেটা কোথা হইতে আসে? পাঠক দেখিবেন এই দুই শ্রেণীর বর্ণেরই মূল প্রকৃতি এক—জানা হওয়া। উভয়ই জ্ঞানের বিষয়, সুতরাং এক শ্রেণীর বর্ণকে জ্ঞানাশ্রিত বস্তু বলিলে অপর শ্রেণীর বর্ণকে জ্ঞান হইতে স্বতন্ত্র বলিবার কোন যুক্তিযুক্ত কারণ নাই। প্রভেদ কেবল দৃষ্টি-প্রণালীতে; কিন্তু দৃষ্টি-প্রণালীর প্রভেদে কিছু একটা দৃষ্টির অধীন এবং আর একটা দৃষ্টি-নিরপেক্ষ হইয়া যাইতে পারে না। দৃষ্টি-প্রণালীর প্রভেদে দৃষ্ট বিষয় পরিবর্ত্তিত হওয়াতে কেবল ইহাই সপ্রমাণ হইতেছে যে বিষয়টা দৃষ্টি-

নিরপেক্ষ নহে, জ্ঞান নিরপেক্ষ নহে, ইহা জ্ঞাতারই বিজ্ঞান-মাত্র। *

আমরা বর্ণের আলোচনায় অনেক স্থান দিলাম, ইহার কারণ এই যে বর্ণ যে একটা বিজ্ঞানমাত্র, ইহা যে জ্ঞান হইতে স্বতন্ত্র বস্তু নহে, ইহা বুঝাই দর্শনানভিজ্ঞ পাঠকের পক্ষে সমধিক কঠিন বলিয়া বোধ হয়। অন্যান্য জড়ীয় গুণ—ঘ্রাণ, আস্বাদ, শব্দ, স্পর্শ, ইহারা যে বিজ্ঞানমাত্র, তাহা বুঝা তাদৃশ কঠিন নহে। ইহাদের মধ্যে স্পর্শের জ্ঞান-সাপেক্ষতা বুঝা অপেক্ষাকৃত কিছু কঠিন। আমরা ঘ্রাণ, আস্বাদ ও শব্দ সম্বন্ধে সংক্ষেপে আলোচনা করিয়া সর্ব্বশেষে স্পর্শ সম্বন্ধে কিছু বিস্তৃত আলোচনা করিব।

ঘ্রাণ।—ঘ্রাণোৎপাদক বস্তুর পরমাণুসমূহ আমাদের নিজ নিজ নাসারন্ধ্রে প্রবেশ করিয়া স্নায়ুবিশেষে কম্পন উপস্থিত না করিলে এবং সেই কম্পন মস্তিষ্কে চালিত না হইলে আমরা ঘ্রাণ বোধ করি না; ইহাতেই পাঠক বুঝিতে পারিবেন যে আমাদের প্রত্যেকের আঘ্রাণের বিষয় সদৃশ হইলেও তাহা সংখ্যায় পৃথক্ পৃথক্; আমরা প্রত্যেকে সদৃশ অথচ স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র ঘ্রাণ আঘ্রাণ করি। আরও দেখিবেন যে যাহা আঘ্রাণ

---

* See Locke's *Essay on the Human Understanding*, Book II, Chaps. IV-VIII, and Berkeley's *Dialogues between Hylas and Philonus*.

করি তাহা অনাঘ্রাত অবস্থায় বর্ত্তমান ছিল অথবা অনাঘ্রাত অবস্থায় থাকিতে পারে, ইহাও নিতান্ত অসঙ্গত কথা। আঘ্রাণকারী এবং আঘ্রাণশক্তির অভাবে ঘ্রাণ কিছুই নহে। অনাঘ্রাত অবস্থায় ঘ্রাণ থাকিতে পারে, ইহা একটা অর্থহীন কথা। কেবল এই পর্য্যন্ত বলিতে পারেন যে যখন ঘ্রাণবোধ হয় না তখনও ঘ্রাণের কারণ বর্ত্তমান থাকে, যেমন ব্যথা বোধ অনুভূত না হইলেও ব্যথার কারণ বর্ত্তমান থাকিতে পারে। ক্রমে দেখিবেন যে, যাহাকে ঘ্রাণের কারণ বলিতেছেন তাহাও জ্ঞানাশ্রিত বস্তু। তার পর, জ্ঞাতা ও জ্ঞান-প্রণালীর পরিবর্ত্তনানুসারে যেমন বর্ণ পরিবর্ত্তিত হয়, তেমনি ঘ্রাণও পরিবর্ত্তিত হয়। ইহা সকলেই জানেন যে কোন কোন পদার্থ যাহা আমাদের নিকট দুর্গন্ধ অপ্রীতিকর বলিয়া বোধ হয়, কোন কোন জন্তু তাহাই আগ্রহের সহিত আহার করে। কেবল নিকৃষ্ট জন্তু কেন, মানুষের মধ্যেও এই বিষয়ে পার্থক্য দেখিতে পাওয়া যায়। যাহা ভদ্র লোকেরা ঘৃণনীয় দুর্গন্ধ বলিয়া পরিত্যাগ করেন, কোন কোন নিম্ন শ্রেণীর লোকের নিকট তাহাই অতি আদরণীয়। সেই মাছুনীর গল্প বোধ হয় অনেকেই জানেন যে এক রাত্রি কোন ফুলমালিনীর ঘরে আতিথ্য গ্রহণ করিয়া ফুলের গন্ধে ঘুমাইতে পারে নাই, এবং অবশেষে যাহাকে শুষ্ক মাছের ঝাঁকা জলে ভিজাইয়া উহার 'সুগন্ধ' আঘ্রাণপূর্ব্বক নিদ্রাকর্ষণের চেষ্টা করিতে হইয়াছিল। ঘ্রাণ যদি কোন জ্ঞান-নিরপেক্ষ স্বতন্ত্র

পদার্থ হইত, তাহা হইলে একটি বস্তুই ভিন্ন ভিন্ন প্রাণীর নিকট ভিন্ন ভিন্ন গন্ধযুক্ত বলিয়া বোধ হইত না। এরূপ হওয়াতে ইহাই প্রতিপন্ন হইতেছে যে ঘ্রাণ ভিন্ন ভিন্ন অবস্থানুসারে পরিবর্তনশীল বিজ্ঞানমাত্র।

স্বাদ।—ঘ্রাণের সম্বন্ধে যাহা বলা হইল, স্বাদের সম্বন্ধে তাহার প্রত্যেক কথা খাটে। এক জনের আস্বাদিত স্বাদ অন্যের আস্বাদের বিষয় হইতে পারে না। অনেকের আস্বাদনের বিষয় সদৃশ হইতে পারে, এক হইতে পারে না। সাদৃশ্যও সকল স্থলে থাকে না। যাহা আমার নিকট প্রীতিকর সুখাদ্য, তাহাই অন্যের নিকট ঘৃণিত অখাদ্য। সুস্থাবস্থায় যাহা মিষ্ট, অসুস্থাবস্থায় তাহাই তিক্ত। রুচির ভিন্নতা অনুসারে, অবস্থার ভিন্নতা অনুসারে, স্বাদেরও ভিন্নতা হয়; কে বলিবে স্বাদ অনুভব-নিরপেক্ষ স্বতন্ত্র বস্তু?

শব্দ।—প্রত্যেক শ্রোতার শ্রুত শব্দ সদৃশ হইতে পারে, সংখ্যায় এক হইতে পারে না। বায়ুর আন্দোলন আমাদের নিজ নিজ কর্ণপটহে আহত না হইলে এবং এই আঘাতোৎপন্ন স্নায়বিক কম্পন মস্তিষ্কে চালিত না হইলে আমরা শব্দ শ্রবণ করি না। বায়ুর আন্দোলন ও স্নায়বিক কম্পন শ্রবণীয় বিষয় নহে, সুতরাং ইহারা শব্দ নহে, ইহাদের সংযোগে যে ইন্দ্রিয়বোধ উৎপন্ন হয় তাহাই শব্দ। এই ইন্দ্রিয়বোধ প্রত্যেক শ্রোতার পক্ষে সদৃশ হইতে পারে, কিন্তু এক হইতে পারে না, এবং ঘ্রাণ

ও আস্বাদের ন্যায় ইহাও অবস্থাভেদে পরিবর্ত্তনশীল। যাহা আমার নিকট উচ্চ শব্দ, তাহাই অর্দ্ধ-বধির ব্যক্তির নিকট মৃদু শব্দ। একজন কামানের নিকটে থাকাতে যে শব্দ শুনিল, সে মনে করিতেছে আমি দূরে থাকিয়া যে মৃদু শব্দ শুনিয়াছি তাহা উহারই ক্ষুদ্র আকার, উভয়ের শ্রুত শব্দ একই। তাই কি? সে যাহা শুনিয়াছে তাহা একটি উচ্চ শব্দ, আমি যাহা শুনিয়াছি তাহা একটি মৃদু শব্দ; উচ্চ আর মৃদু এক হইল কিরূপে? ছোট আমগাছ আর বড় আমগাছ কি একই বস্তু? বাস্তবিক কথা এই, সে যাহা শুনিয়াছে আমি তাহা শুনি নাই; দুজনে ভিন্ন ভিন্ন অথচ কিয়ৎ পরিমাণে সদৃশ দুটি বিষয়, দুটি ইন্দ্রিয়-বোধ, অনুভব করিয়াছি।

স্পর্শ।—স্পর্শের বিষয় দ্বিবিধ; (১) কেবল স্পর্শদ্বারা যাহা জানা যায়, (২) স্পর্শের সঙ্গে বলপ্রয়োগ করিয়া যাহা জানা যায়। উষ্ণতা, শীতলত্ব এবং ইহাদের মধ্যাবস্থা প্রথম শ্রেণীর অন্তর্গত, আর কর্কশতা, মসৃণতা, কঠিনতা, কোমলতা, অর্থাৎ অল্প বা অধিক প্রতিরোধের ভাব দ্বিতীয় শ্রেণীর অন্তর্গত। প্রথম শ্রেণীর গুণগুলি যে বিজ্ঞানমাত্র, এবং প্রত্যেকের পক্ষে ভিন্ন ভিন্ন, তাহা পাঠক অনায়াসেই বুঝিতে পারিবেন। সম্মুখস্থ টেব্‌লে হাত দিয়া আমি যে শীতলতা বোধ করিতেছি তাহা আমার ইন্দ্রিয়বোধ; পাঠক উক্ত প্রকারে যাহা অনুভব করিতেছেন তাহা আপনার ইন্দ্রিয়বোধ। উভয়ের ইন্দ্রিয়-

বোধ সদৃশ হইতে পারে, কিন্তু সংখ্যায় এক হইতে পারে না। শীতলতা সম্বন্ধে যাহা বলা হইল, উষ্ণতা সম্বন্ধেও তাহাই খাটে। অগ্নির নৈকট্য বশতঃ আমি যে উষ্ণতা অনুভব করি, তাহা আমাতে না আমার বাহিরে? পাঠক বলিবেন উত্তাপ ত ইথারের অতি-ত্বরিত আন্দোলন, ইহা আমাতে হইবে কি রূপে? কিন্তু জিজ্ঞাসা করি ইথারের অতি-ত্বরিত আন্দোলন পদার্থটা কি সাক্ষাৎ জ্ঞানের বিষয়? বাস্তবিক কথা এই, ইথারের যে ত্বরিত-আন্দোলনকে বৈজ্ঞানিকেরা উত্তাপ বলেন, সে আন্দোলন আমাদের অনুভূত উষ্ণতা বা উত্তাপের কারণমাত্র, সেই বৈজ্ঞানিক অনুমানের বিষয়টি আমাদের বর্ত্তমান আলোচনার বিষয় নহে। উহার সম্বন্ধে এই বলিলেই এখন যথেষ্ট হইবে যে উক্ত আন্দোলন দৃশ্য বা স্পৃশ্য বস্তুর অনুকরণেই কল্পিত। আমরা যদি দেখাইতে পারি যে আমরা যাহা কিছু দেখি ও স্পর্শ করি, সে সমস্তই জ্ঞানাশ্রিত বস্তু, তাহা হইলে ইহাও স্বীকার করিতে হইবে যে অনুমানের বিষয়ীভূত সেই আন্দোলনও জ্ঞানাশ্রিত বস্তু। জীবের অনুভব-শক্তির ক্ষীণতা বশতঃ জীব তাহা অনুভব না করিতে পারে, কিন্তু তাহা অবশ্যই কোন উচ্চতর জ্ঞানের বিষয়ীভূত, সন্দেহ নাই। যদি তাহা না হয়, তবে তাহা নিতান্ত কাল্পনিক বিষয়মাত্র, প্রকৃত পক্ষে কিছুই নহে। আমাদের বর্ত্তমান আলোচ্য বিষয় আমাদের অনুভূত উষ্ণতা। উক্ত ইথারের আন্দোলন

আমাদের নিজ নিজ স্নায়ুযন্ত্রে পরিচালিত না হইলে আমরা উষ্ণতা বোধ করি না। * এই রূপে উৎপন্ন যে উষ্ণতা, তাহা স্পষ্টতঃই একটি বিজ্ঞানমাত্র, এবং ইহা ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তির পক্ষে ভিন্ন ভিন্ন। দুই বা ততোঽধিক ব্যক্তির অনুভূত উষ্ণতার মধ্যে সাদৃশ্য থাকিতে পারে, কিন্তু তাহা কখনও এক হইতে পারে না; আর সাদৃশ্যও সকল স্থলে থাকে না। যাহা এক জনের কাছে শীতল, অবস্থাভেদে তাহাই আর এক জনের কাছে উষ্ণ বলিয়া বোধ হয়। এমন কি, একই ব্যক্তির যদি এক হাত গরম আর অন্য হাত ঠাণ্ডা থাকে, তবে একই বস্তুকে গরম হাতে স্পর্শ করিলে ঠাণ্ডা, আর ঠাণ্ডা হাতে স্পর্শ করিলে গরম বলিয়া বোধ হইবে। জ্ঞানের বিষয় প্রকৃত পক্ষে এক ও জ্ঞান-নিরপেক্ষ হইলে এরূপ হইত না। বাস্তবিক কথা এই যে, অবস্থাভেদে আত্মা ভিন্ন ভিন্ন মনোবিকার অনুভব করে; যাহা অনুভব করা যায় তাহা জ্ঞানাশ্রিত বিষয়, জ্ঞান-নিরপেক্ষ বস্তু নহে।

পাঠক দেখিবেন যে দৃষ্টির স্থলে যেমন আমরা চক্ষু-সংলগ্ন বস্তু মাত্র দেখিতে পাই, এবং যাহা দেখি তাহা নিতান্ত ক্ষুদ্র, তেমনি স্পর্শের স্থলেও যাহা শরীরের সঙ্গে সংলগ্ন, কেবল

* বর্ণের কারণরূপে বৈজ্ঞানিকেরা যে ঐথারিক আন্দোলন অনুমান করেন তাহার সম্বন্ধেও এই কথাগুলি সম্পূর্ণরূপে খাটে। উহা হয় কোন জ্ঞানাশ্রিত বস্তু, তাহা না হইলে কিছুই নহে।

তাহাই আমরা স্পর্শ করিতে পারি, আর যাহা স্পর্শ করি, অর্থাৎ স্পর্শবোধের সঙ্গে যে দেশাংশকে জানি, তাহা স্পর্শের অবলম্বনরূপী শরীরাংশের অপেক্ষা বৃহত্তর নহে; অর্থাৎ যাহা হস্তদ্বারা স্পর্শ করি, তাহা হস্ত হইতে বৃহত্তর নহে, যাহা পায়ের দ্বারা স্পর্শ করি, তাহা পা অপেক্ষা বৃহত্তর নহে। কিন্তু স্পর্শকারী অঙ্গকে পরিচালিত করিলেও যদি স্পর্শজ্ঞান হইতে থাকে, তবেই আমরা বুঝিতে পারি যে, স্পৃষ্ট বস্তু স্পর্শকারী অঙ্গাপেক্ষা বৃহত্তর, অর্থাৎ যে দেশখণ্ডকে অবলম্বন করিয়া স্পর্শবোধ হইতেছে সেই দেশখণ্ড অঙ্গের অধিকৃত দেশখণ্ডাপেক্ষা বৃহত্তর। কিন্তু এইরূপে আমরা যে বিস্তৃতিকে—যে দেশকে—জ্ঞাত হই, তাহাও যে জ্ঞানাশ্রিত বিষয় তাহা ইতিপূর্ব্বেই দেখান হইয়াছে।

এখন দ্বিতীয় শ্রেণীর স্পর্শবোধের বিষয় আলোচনা করা যাক্। এই শ্রেণীর স্পর্শবোধগুলি প্রথম শ্রেণীর স্পর্শবোধসমূহ হইতে এত ভিন্ন, যে ইহাদিগকে কেবল সুবিধার জন্যই স্পর্শবোধ বলা হইল। স্পর্শবোধের সঙ্গে ইহারা জড়িত, স্পর্শবোধ না করিয়া এই সকল বোধ লাভ করা যায় না, কিন্তু ইহারা স্পর্শবোধ নহে। বস্তুর স্থানে হাত চালাইলে বা হাত নাড়িতে নাড়িতে দেয়ালে বা টেব্‌লে ঠেকিয়া হাতের গতিরোধ হইলে, যে ইন্দ্রিয়বোধ অনুভব করা যায়, হাত বা অন্য কোন অঙ্গদ্বারা টেব্‌ল টিপিলে যে ইন্দ্রিয়বোধ অনুভব

করা যায়,—এক কথায়, কোন্ অঙ্গের গতিরোধ হইলে যে জাতীয় বোধ অনুভূত হয়, তাহার দার্শনিক নাম প্রতিরোধ বা মাংসপৈশিক বোধ। চলিত কথায় ইহাকে স্থানবিশেষে কর্কশতা, স্থানবিশেষে কঠিনতা বলা হয়। এই মাংসপৈশিক বোধের সঙ্গে সঙ্গে ইহার কারণরূপী কোন জ্ঞান-নিরপেক্ষ শক্তির অস্তিত্ব অনুমান করা যুক্তিযুক্ত কি না তাহা পরে বিবেচ্য। পাঠক অগ্রে এই কথাটা বুঝিতে চেষ্টা করুন্ যে এই সকল স্থলে আমাদের সাক্ষাৎ জ্ঞানের বিষয় একটা বিজ্ঞানমাত্র। প্রত্যেকের মাংসপেশীর সাহায্যে স্বতন্ত্ররূপে এই বিষয় প্রকাশিত হয়, এবং শরীর মনের গঠনানুসারে ইহা পরিবর্ত্তনশীল, এই সমুদায় চিন্তা করিলেই পাঠক বুঝিতে পারিবেন যে বিষয়টি একটি জ্ঞান-নিরপেক্ষ স্বতন্ত্র বস্তু বা গুণ নহে, ইহা জ্ঞানাশ্রিত বিজ্ঞানমাত্র। কোন বস্তু কঠিন, ইহার অর্থ এই যে ইহার সংযোগে অধিক পরিমাণে মাংসপৈশিক বোধ উৎপন্ন হয়। এই যে "কোন বস্তুর" কথা বলা হইল, ইহাও কোন জ্ঞান-নিরপেক্ষ বস্তু নহে, ইহাকে পরীক্ষা করিলে দেখা যাইবে, ইহাও জ্ঞান-সাপেক্ষ, ইহাও বিস্তৃতি, স্পর্শবোধ প্রভৃতি মনোবিকার-লক্ষণাক্রান্ত বিষয়মাত্র। যাহা হউক, এই যে মাংসপৈশিক বোধ, ইহাও অন্যান্য অনুভবের ন্যায় অবস্থাভেদে পরিবর্ত্তনশীল। শিশুর পক্ষে যাহা কঠিন, বালকের পক্ষে তাহা কোমল, যুবকের পক্ষে কোমলতর। দুর্ব্বলের পক্ষে

যাহা কঠিন, সবলের পক্ষে তাহাই কোমল। সবলের নিকট যাহা কোমল, দুর্ব্বলের নিকট তাহাই কঠিন। ধনী বিলাসী ভদ্রলোকেরা যে আসন, শয্যা বা বস্ত্রকে কর্কশ বলিয়া পরিত্যাগ করেন, দরিদ্র চাষার নিকট তাহাই মসৃণ বলিয়া আদরণীয়। উপরি-উক্ত ইন্দ্রিয়-বিষয়গুলি স্পষ্টতঃই আপেক্ষিক, জ্ঞান-সাপেক্ষ, ব্যক্তিগত পরিবর্ত্তনানুসারে পরিবর্ত্তনশীল। ইহাদের মধ্যে যাহা কিছু সাধারণ. অপরিবর্ত্তনীয়, তাহার কারণ কেবল মানুষের শারীরিক ও মানসিক গঠনের সাধারণ সাদৃশ্য। এই সাদৃশ্য সম্পূর্ণ নহে, তাই বিজ্ঞানও ঠিক একরূপ নহে। যাহা হউক, যদি ব্যক্তিগত পরিবর্ত্তনানুসারে কঠিনতা কোমলতা ইত্যাদি পরিবর্ত্তনশীলই হইল, তবে আর ইহাদের স্বতন্ত্রতা কোথায় রহিল? অন্যান্য জড়ীয় গুণের ন্যায় ইহারাও জ্ঞান-সাপেক্ষ মনোবিকারমাত্র, জ্ঞান হইতে পৃথক্ করিলে কিছুই নহে।

আমাদের জড়ীয় গুণের আলোচনা শেষ হইল। পাঠক দেখিলেন, যাহাদিগকে লোক জ্ঞান-নিরপেক্ষ স্বতন্ত্র গুণ বলিয়া মনে করে, প্রকৃতপক্ষে সে সকল জ্ঞানাশ্রিত বিজ্ঞান বা মনোবিকারমাত্র। সুতরাং যাহাকে আমরা জড়-জগৎ বলি, তাহাকে প্রত্যক্ষ করিতে গিয়া প্রকৃতপক্ষে আমরা আত্মার বাহিরে যাই না, অধ্যাত্মজগতের বাহিরে যাই না, আমরা আত্মা ও আত্মার আশ্রিত বিষয় সমূহকেই প্রত্যক্ষ করি।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

প্রকৃতিবাদ-খণ্ডন

যে সকল পাঠক দর্শনশাস্ত্রের আলোচনা করেন নাই, তাঁহারা হয় ত উপরি-উক্ত ব্যাখ্যাতেই পরিতৃপ্ত হইবেন;—লোকে যে জড়কে আত্মা হইতে স্বাধীন স্বতন্ত্র বস্তু বলিয়া বিশ্বাস করে, এই বিশ্বাসের ভ্রম বুঝিতে পারিবেন। কিন্তু যাঁহারা অল্পাধিক পরিমাণে দর্শনশাস্ত্রের আলোচনা করিয়াছেন তাঁহারা বোধ হয় এখনও সম্পূর্ণরূপে সন্দেহ-মুক্ত হইতে পারেন নাই। তাঁহারা এক শ্রেণীর দার্শনিকের নিকট শুনিয়াছেন এবং শুনিয়া বিশ্বাস করিয়াছেন যে লোকে যাহাকে জড় বলে তাহা ছাড়াও এক জড়বস্তু আছে যাহা প্রত্যক্ষগোচর নহে, অথচ নিশ্চয়ই আছে। সে জড়বস্তু যখন প্রত্যক্ষগোচর নহে, তখন প্রত্যক্ষগোচর জড়বস্তুর জ্ঞানাধীনত্ব দেখাইবার জন্য যে সকল যুক্তি দেওয়া হয়, সে সকল যুক্তি সেই বস্তু সম্বন্ধে খাটে না, সে সকল যুক্তি সেই প্রত্যক্ষ জ্ঞানের অতীত জড়বস্তুর স্বাতন্ত্র্য নষ্ট করিতে পারে না। এই পুস্তকের যে সকল পাঠক এই দার্শনিক মতে সায় দেন, তাঁহাদের অনুরোধে আমরা এই দার্শনিক মতের সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা ও সমালোচনা করিতে প্রবৃত্ত হইলাম। এই শ্রেণীর দার্শনিকেরা বলেন যে, যাহাদিগকে আমরা জড়ীয় গুণ বলি, তাহারা প্রকৃতপক্ষে বিজ্ঞানমাত্র বটে, কিন্তু তাহাদের আধার ও

কারণরূপী একটি অচেতন বস্তু আছে যাহা প্রত্যক্ষ জ্ঞানের অতীত। এই মতকে প্রকৃতিবাদ (Naturalism) বলা হয়। এই মতাবলম্বীরা মনে করেন যে জড়ের স্বাতন্ত্র্য স্বীকার না করিলে ইহার প্রকৃতত্বই স্বীকার করা হইল না। ইঁহারা জড়ের স্বাতন্ত্র্য স্বীকার করেন এবং এই অর্থে জড়ের প্রকৃতত্ব স্বীকার করেন বলিয়া আপনাদিগকে প্রকৃতবাদী (Realists) বলেন। জড় এবং আত্মাকে স্বতন্ত্র বস্তু মনে করেন বলিয়া এই মতাবলম্বীদিগকে জড়াত্মবাদী (Natural Dualists) ও বলা হয়। লৌকিক প্রকৃতিবাদ,—যাহা ইন্দ্রিয়-গোচর গুণসমূহকে আত্ম-নিরপেক্ষ স্বতন্ত্র বস্তু মনে করে,—তাহা হইতে এই দার্শনিক প্রকৃতিবাদ অতিশয় ভিন্ন। যাহা হউক, আমরা এই দার্শনিক প্রকৃতিবাদের ভ্রম প্রদর্শন করিয়া আমাদের লক্ষ্য অধ্যাত্মবাদের পথ পরিষ্কার করিতে চেষ্টা করিতেছি।

প্রকৃতিবাদের অনুমিত জড়বস্তুর আধারত্ব সম্বন্ধে এই বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে জড়ীয় গুণসমূহকে যখন বিজ্ঞান বলিয়া স্বীকার করা হইতেছে, তখন কোন অচেতন বস্তুকে ইহাদের আধার বলা একান্তই অসঙ্গত। বিজ্ঞানের আধার কেবল জ্ঞানই হইতে পারে। জড় অচেতন, জ্ঞানশূন্য; এরূপ বস্তু কখনও বিজ্ঞানের আধার হইতে পারে না,—কখনও জ্ঞান-সাপেক্ষ বিষয়ের ধারয়িতা হইতে পারেন না।

এখন দেখা যাক্ এই প্রকৃতিরূপী জড়বস্তুকে অনুভবের

কারণরূপে স্বীকার করা যায় কি না। আমরা আরো একটু বিশেষভাবে প্রকৃতিবাদের ব্যাখ্যা করিয়া তৎপরে ইহার সমালোচনা করিব। সম্মুখস্থিত টেব্‌লটিকেই দৃষ্টান্তরূপে গ্রহণ করিয়া এই বিষয়ের আলোচনা করা যাক্। টেব্‌লটি বিস্তৃতি, বর্ণ, মসৃণতা, কঠিনতা প্রকৃতি গুণাক্রান্ত। আমরা দেখাইয়াছি যে এই সমস্তই বিজ্ঞান; জ্ঞানময় আত্মার উপর এই সমুদায়ের অস্তিত্ব নির্ভর করে। আধুনিক প্রকৃতিবাদী দার্শনিক তাহা স্বীকার করেন; কিন্তু স্বীকার করিয়াও বলেন এই সমুদায় প্রত্যক্ষগোচর বিজ্ঞানের এক একটি অপ্রত্যক্ষ কারণ আছে, সেই কারণগুলিই প্রকৃত জড়ীয় গুণ বা উপকরণ এবং সেই সকল গুণ বা উপকরণের সমষ্টিই প্রকৃত জড়বস্তু। অর্থাৎ যে বিস্তৃতি আমাদের প্রত্যক্ষগোচর হয়, দর্শন বা স্পর্শ করিতে গিয়া আমরা যে বিস্তৃতিকে জানি, তাহা আবির্ভাবমাত্র বটে, তাহার অস্তিত্ব আত্মার উপর নির্ভর করে বটে, কিন্তু এই আবির্ভাব উৎপাদনের কারণ একটি অপ্রত্যক্ষ বিস্তৃতিগুণ আছে। তেমনি আমাদের প্রত্যক্ষ-গোচর বর্ণের কারণরূপী একটি অপ্রত্যক্ষ অর্থাৎ অদৃশ্য বর্ণ আছে। আমাদের অনুভূত কঠিনতার কারণরূপী একটি অননুভূয় কঠিনতা আছে; এবং এই সমুদায় গুণের সমষ্টি একটি ইন্দ্রিয়াতীত জড় বস্তু আছে। প্রকৃতিবাদ যে কি অসঙ্গত মত, এখান হইতেই তাহার আভাস পাওয়া যাইতেছে। অপ্রত্যক্ষ বিস্তৃতি, অদৃশ্য বর্ণ, অননুভূয় কঠিনতা,—পাঠক এই সমস্ত

অসঙ্গত অর্থহীন বিষয়ের কি কোন ধারণা করিতে পারিতেছেন? আর জিজ্ঞাস্য এই, এই সকল জড়ীয় গুণ যদি সমুদায় ইন্দ্রিয়ের অতীতই হইল, তবে এই সমুদায়ের পার্থক্য কোথায়? এই সমুদায়কে পৃথক্ পৃথক্ বল কেন? প্রত্যক্ষগোচর বিষয়সমূহকে পৃথক্ পৃথক্ বলিবার বিশেষ কারণ আছে। বর্ণ দৃষ্ট হয়, কিন্তু আঘ্রাত হয় না। কঠিনতা অনুভূত হয়, কিন্তু দৃষ্ট হয় না। সুতরাং বর্ণ ও কঠিনতা স্বতন্ত্র বিষয়। কিন্তু যে বর্ণ দেখা যায় না এবং যে কঠিনতা অনুভব করা যায় না, সে বর্ণ আর সে কঠিনতায় পার্থক্য কোথায়? এবং সে বর্ণ এবং কঠিনতাকে "বর্ণ" এবং "কঠিনতা" এই দুটা পৃথক্ নাম দিবারই বা প্রয়োজন কি? পার্থক্য কেবল কার্য্যে দেখিতে পাই, কারণে পার্থক্য কোথায়? কার্য্য ভিন্ন ভিন্ন হইলেই কি কারণ ভিন্ন ভিন্ন হইবে? এক ব্যক্তিই যখন ভিন্ন ভিন্ন কার্য্য করিতে পারে, তখন একটি জড়বস্তু কেন ভিন্ন ভিন্ন কার্য্য করিতে পারিবে না? সুতরাং প্রকৃতিবাদের পক্ষে সমস্ত অনুভবের একটিমাত্র জড়ীয় কারণ স্বীকার করিলেই যথেষ্ট হয়; এবং এই জড়ীয় কারণকে কেবল এই অর্থেই বহুগুণশালী বলা যায় যে ইহা ভিন্ন ভিন্ন বিজ্ঞান উৎপাদনে সমর্থ। এই কারণকে জড় বলাতে পাঠক এরূপ বুঝিবেন না যে আমাদের প্রত্যক্ষগোচর জড়ে যেরূপ বর্ণ, ঘ্রাণ ইত্যাদি বৈচিত্র্য আছে, ইহাতেও তেমনি বৈচিত্র্য আছে। আমরা এই মাত্র দেখাইলাম যে যাহা অপ্রত্যক্ষ,

অদৃশ্য, অনন্মুভূয়, তাহাতে এই বিচিত্রতা থাকিতে পারে না। এই কারণকে কেবল এই অর্থেই জড় বলা হয় যে ইহা চৈতন্যহীন, অজ্ঞান। সুতরাং প্রকৃতিবাদী এই জড়ীয় কারণের বিষয় এই পর্য্যন্ত জানেন যে ইহা এক দিকে অচেতন, জ্ঞানবিহীন, অপর দিকে শক্তিশালী অর্থাৎ বিজ্ঞান উৎপাদনে সক্ষম। এই দুটি লক্ষণ ব্যতীত ইহার বিষয় আর কিছুই জানা নাই, এবং জানা যায় না ; অন্যান্য বিষয়ে ইহা অজ্ঞেয়। জড়ীয় কারণের এই অজ্ঞেয়তা দেখিয়াই অনেক প্রকৃতিবাদী "অজ্ঞেয়তাবাদী" (Agnostics) নাম গ্রহণ করিয়াছেন। বলা বাহুল্য যে আমরা উপরে জড়ীয় কারণের যে বর্ণনা দিলাম তাহা আমাদের মনঃকল্পিত নহে। উক্ত বর্ণনা উচ্চতর প্রকৃতিবাদী-দিগের অনুমোদিত।*

এখন এই প্রকৃতিবাদ সম্বন্ধে আমাদের বক্তব্য এই ;—

১। যাহা প্রত্যক্ষ জ্ঞানের বিষয়, যাহা প্রত্যক্ষরূপে জানা যায়, কেবল তাহাই বা তদনুরূপ বস্তুই পরোক্ষ জ্ঞান বা অনুমানের বিষয় হইতে পারে। যাহা দেখিয়াছি, শুনিয়াছি,

* See Spencer's *Principles of Psychology*, Part VII (Vol. II) and Green's criticism of this part in the first volume of his works. See also the essay on "Science, Nescience and Faith" in Martineau's *Essays—Philosophical and Theological*, Vol. I, and the essay on "Agnostic Inconsistency" in my *Roots of Faith*.

অনুভব করিয়াছি বা আত্মজ্ঞানে প্রত্যক্ষ করিয়াছি, তাহা বা তদনুরূপ বস্তু এক সময় সাক্ষাৎ ভাবে না জানিলেও অন্যের সাক্ষ্যে বা অনুমানদ্বারা তাহার অস্তিত্ব জানিতে পারি। আত্ম-জ্যোতিতে যখন আপনাকে জানিয়াছি, তখন অন্য আত্মার সাক্ষাৎ জ্ঞান না হইলেও অন্য আত্মার অস্তিত্ব কল্পনা করিতে পারি বা অনুমান দ্বারা জানিতে পারি। রূপ, রস, গন্ধ, শব্দ, স্পর্শ প্রভৃতি গুণ যখন একবার জ্ঞানের বিষয়ীভূত হইয়াছে, তখন ইহারা এক সময় প্রত্যক্ষীভূত না হইলেও নিজের ভবিষ্যৎ জ্ঞানের বিষয়রূপে বা অন্য আত্মার বিষয়রূপে ইহাদের অস্তিত্ব কল্পনা করিতে পারি। দৃষ্টি বা দৃষ্ট বস্তুর আন্দোলন প্রত্যক্ষ করিয়া যখন বৈজ্ঞানিকেরা এমন সূক্ষ্ম বস্তুর (ইথারের) আন্দোলন কল্পনা বা অনুমান করেন যাহা আমাদের পক্ষে দৃশ্যও নহে, স্পৃশ্যও নহে, তখনও তাঁহারা যুক্তির বাহিরে যান না, কেননা এই অনুমিত আন্দোলন দৃশ্য বা স্পৃশ্য আন্দোলনের আদর্শেই কল্পিত; উহা আমাদের স্থূল ইন্দ্রিয়গোচর না হইলেও কোন সূক্ষ্মতর অনুভব-শক্তি-সম্পন্ন জ্ঞাতার পক্ষে অনুভবনীয়। কিন্তু যাহা আদৌ প্রত্যক্ষ জ্ঞানের বিষয়ীভূত হয় নাই, এবং হইতে পারে না, যাহার প্রকৃতি প্রত্যক্ষ জ্ঞানের বিষয়ীভূত বস্তুসমূহের প্রকৃতি হইতে সম্পূর্ণরূপে ভিন্ন, যাহা জ্ঞাতা নয়, জানাও নয়, বিষয়ী নয়, বিষয়ও নয়, তাহা কখনও পরোক্ষ জ্ঞানের বিষয় হইতে পারে না, তাহা কখনও অনুমানের

বিষয় হইতে পারে না, সুতরাং তাহার অস্তিত্ব কখনই বিশ্বাসযোগ্য হইতে পারে না। প্রকৃতিবাদের কল্পিত অজ্ঞেয় জড়বস্তু এই শ্রেণীর বস্তু, সুতরাং ইহার অস্তিত্ব কখনই বিশ্বাসযোগ্য নহে। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে দেব, যক্ষ, দানব, শয়তান প্রভৃতি বিষয়, যাহাদের অস্তিত্ব অভাবনীয় নহে, কিন্তু যাহাদের অস্তিত্বের প্রমাণাভাব, সেই সকল বস্তুর অস্তিত্বে অবিশ্বাসী হইয়াও, এমন কি পরমাত্মার অস্তিত্বে সন্দিহান হইয়াও, লোকে অবশেষে এই দার্শনিক শয়তানে বিশ্বাস করে। অজ্ঞানী লোকের নিতান্ত অমূলক কুসংস্কার অপেক্ষা জ্ঞানাভিমানীদিগের এই সংস্কার অধিকতর নিন্দনীয়।

২। প্রকৃতিবাদীরা যদি এই অজ্ঞেয় জড়বস্তুকে সম্পূর্ণরূপেই অজ্ঞেয় বলিয়া বর্ণনা করিতেন, তবে ইহাতে লোকের বিশ্বাস জন্মান কঠিন হইত, হয় ত অসম্ভব হইত; কিন্তু ইঁহারা তাহা না করিয়া এক মুখেই ইহাকে জ্ঞেয় ও অজ্ঞেয় দুইই বলেন। ইহা অজ্ঞেয় অথচ বিজ্ঞানোৎপত্তির কারণ। যাহা বিজ্ঞানোৎপত্তির কারণ তাহার অন্ততঃ একটি গুণ স্পষ্টই জানা যাইতেছে, সুতরাং সে আর অজ্ঞেয় হইতে পারে না। যাহা হউক, বিজ্ঞানোৎপত্তির কারণ নিতান্তই চাই। কার্য্য মাত্রেরই কারণ চাই; বিজ্ঞানোৎপত্তি যখন একটা কার্য্য, একটা ঘটনা, তখন ইহার কারণ চাই, সন্দেহ নাই। আর কারণটা স্থায়ী বস্তু হওয়া চাই। অস্থায়ী ঘটনার স্থায়ী কারণ না পাইলে জ্ঞান

তৃপ্ত হয় না। এই কারণেই যখন প্রকৃতিবাদী বলেন যে বিজ্ঞানের কারণরূপী একটা জ্ঞানাতীত অচেতন স্থায়ী বস্তু আছে, তখন লোকে তাঁহাকে সহজেই বিশ্বাস করে। কিন্তু জিজ্ঞাসা করি হাতের কাছে কারণ থাকিতে দূরে যাও কেন? আত্মা স্বয়ংই বিজ্ঞানোৎপত্তির যথেষ্ট কারণ নয় কি? আত্মা ক্রমাগত ভিন্ন ভিন্ন বিজ্ঞান-সমন্বিত হইতেছে, ভিন্ন ভিন্ন বিজ্ঞান অনুভব করিতেছে, ব্যাপারটা ত এই; ইহাঁরা জন্য একটা অজ্ঞেয় অভাবনীয় অনাত্মবস্তুর অস্তিত্ব কল্পনা করিবার কি প্রয়োজন? বিজ্ঞানোৎপত্তির পক্ষে কি কি আবশ্যক? বিজ্ঞানোৎপত্তির পক্ষে জ্ঞানরূপী আত্মার একান্তই প্রয়োজন, এই আত্মা ত আছেই। একটি স্থায়ী বস্তুর প্রয়োজন, যাহা পরিবর্ত্তনের মধ্যে স্থির থাকে, যাহার সম্বন্ধে পরিবর্ত্তন ঘটে। সেই বস্তুও আছে; আত্মাই সেই স্থায়ী বস্তু যাহা সমুদায় পরিবর্ত্তনের মধ্যে স্থির থাকে, এবং যাহার সম্বন্ধে পরিবর্ত্তন ঘটে। আর কি কিছুর প্রয়োজন আছে? পাঠক হয় ত বলিবেন বিজ্ঞানোৎপত্তির কারণরূপী একটি কর্ত্তৃত্বশালী বস্তুর প্রয়োজন? আমরা তাহা স্বীকার করি, কিন্তু আমরা বলি, আত্মা স্বয়ংই ত সেই কর্ত্তৃত্বশালী বস্তু, আবার আর একটা কর্ত্তৃত্বশালী বস্তু কল্পনা করিবার প্রয়োজন কি? আত্মা নিজের কর্ত্তৃত্বে নিজে বিজ্ঞান উৎপাদন করিতেছে, নিজে বিজ্ঞান-সমন্বিত হইতেছে, ইহা বিশ্বাস করিলেই ত হয়, আবার একটা অতিরিক্ত

কর্ত্তা ভাবিবার প্রয়োজন কি? এ স্থলে হয় ত প্রতিপক্ষ বলিবেন যে আমরা তো আর ইচ্ছাপূর্ব্বক বিজ্ঞান উৎপাদন করি না, আমাদিগকে কিরূপে বিজ্ঞানোৎপত্তির কারণ বলিব? তবে কি প্রতিপক্ষ স্বীকার করিতেছেন যে কারণ হইতে গেলে, কর্ত্তা হইতে গেলে, ইচ্ছাশালী হওয়া চাই? যদি তাহা স্বীকার করেন, তবে তাঁহার অজ্ঞেয়তাবাদ গেল, প্রকৃতিবাদ গেল; বিজ্ঞানোৎপত্তির কারণ যদি ইচ্ছাশালী হইলেন, তবে তিনি অজ্ঞেয়ও নহেন, অজ্ঞান প্রকৃতিও নহেন,—তিনি জ্ঞেয় জ্ঞানবান্ পুরুষ। যদি বলেন কারণ হইতে গেলে ইচ্ছার প্রয়োজন নাই, ইচ্ছা ব্যতীতও কর্ত্তৃত্ব থাকিতে পারে, তবে সেই কর্ত্তৃত্ব আত্মাতে আরোপ করিলেই হয়, একটা অজ্ঞেয় অচিন্তনীয় অনাত্মবস্তুতে আরোপ করিবার প্রয়োজন কি? আমরা কিছু এই কথা বলিতেছি না যে আমাদের ব্যক্তিগত ইচ্ছা বিজ্ঞানোৎপত্তির কারণ। আমাদের ব্যক্তিগত ইচ্ছা স্পষ্টতঃই বিজ্ঞানোৎপত্তির কারণ নহে। কিন্তু আমাদের ব্যক্তিগত ইচ্ছাতেই কিছু আত্মার আত্মত্ব পর্য্যবসিত হইতেছে না। আত্মাতে এমন অনেক বস্তু আছে যাহা আমাদের ব্যক্তিগত ইচ্ছা-সাপেক্ষ নহে। আমাদের জীবনের সারভূত যে জ্ঞানবস্তু, তাহা আমাদের ব্যক্তিগত ইচ্ছা-সাপেক্ষ নহে; এই জ্ঞানবস্তু আমাদের ব্যক্তিগত ইচ্ছা-নিরপেক্ষভাবে ইন্দ্রিয়বোধ, স্মৃতি, বুদ্ধি প্রভৃতি রূপে আত্ম-প্রকাশ করিয়া আমাদের জীবনলীলা রচনা করিতেছে; আমরা

পরে আরো বিস্তৃতভাবে এই বিষয়ের আলোচনা করিব। এখন পাঠককে কেবল এই কথাটি বুঝাইতে চাই যে বিজ্ঞান প্রভৃতি মানসিক ঘটনা উৎপাদনের জন্য আত্মার অতিরিক্ত কোন বস্তু কল্পনা করিবার প্রয়োজন নাই। প্রকৃতিবাদী তাঁহার কল্পিত কারণে যে যে লক্ষণ চান, সে সমস্তই আমাদের জীবনের সাররূপী জ্ঞানবস্তুতে আছে। তিনি চান যে বিজ্ঞানের কারণ স্থায়ী বস্তু হইবে এবং আমাদের ব্যক্তিগত ইচ্ছা-নিরপেক্ষ হইবে। আমাদের জীবনের সারভূত জ্ঞানবস্তুর এই উভয় গুণই আছে; সুতরাং বিজ্ঞানোৎপত্তির কর্তৃত্ব বা কারণত্ব ইহাতে আরোপ না করিয়া একটা অজ্ঞেয়, অভাবনীয়, অচেতন বস্তুতে আরোপ করিবার কোন প্রয়োজন নাই।

৩। এই জড়শক্তির কল্পনা যে কেবল অনাবশ্যক তাহা নহে, ইহা নিতান্ত যুক্তি-বিরুদ্ধ। এই কল্পিত শক্তিতে বিজ্ঞানোৎপত্তির কোন ব্যাখ্যাই হয় না। যদ্দ্বারা কার্য্যের যুক্তিযুক্ত ব্যাখ্যা হয়, তাহাই কার্য্যের প্রকৃত কারণ। যাহা কার্য্যকে ব্যাখ্যা করিতে পারে না, তাহাকে কারণ বলা যাইতে পারে না। আমরা দেখাইতে চেষ্টা করিব যে প্রকৃতিবাদের কল্পিত এই জড়ীয় স্পন্দন বিজ্ঞানোৎপত্তির কিছুই ব্যাখ্যা করিতে পারে না। প্রকৃতিবাদ বিজ্ঞানকে আত্মাশ্রিত বলিয়া স্বীকার করিয়াও ইহাকে প্রকারান্তরে আত্মা হইতে পৃথক্ বিষয় বলিয়া কল্পনা করে। তাহাতেই ইহা আত্মাকে ছাড়িয়া দিয়া বিজ্ঞানোৎপত্তি

ব্যাখ্যা করিতে চেষ্টা করে। এইরূপে আত্মা এবং বিজ্ঞানকে পৃথক্ মনে করাতেই, বিজ্ঞানকে একটা আত্ম-নিরপেক্ষ বস্তু বলিয়া কল্পনা করাতেই, ইহা বিশ্বাস করে যে একটা অচেতন অনাত্মবস্তুদ্বারা বিজ্ঞানের ব্যাখ্যা করা যায়। কিন্তু আমরা ইতিপূর্ব্বেই দেখাইয়াছি যে, আত্মাকে ছাড়িয়া বিজ্ঞান কিছুই নহে। বিজ্ঞান = আমি জানি; "আমি"কে ছাড়িয়া "বিজ্ঞান" অর্থহীন—কিছুই নহে; "কেবল বিজ্ঞান" বলিয়া কোন বিষয় নাই; সুতরাং "কেবল বিজ্ঞানের" কারণ কোন বস্তু থাকিতে পারে না,—এমন কোন বস্তু থাকিতে পারে না যাহা কেবল বিজ্ঞানের ব্যাখ্যা করে। কেবল সেই বস্তুই বিজ্ঞানের ব্যাখ্যা করিতে সক্ষম যাহা আত্মাকে ব্যাখ্যা করিতে পারে। প্রকৃতি-বাদের কল্পিত জড়শক্তি প্রকৃতিবাদীদের মতেই আত্মার ব্যাখ্যা করিতে অক্ষম, সুতরাং ইহা বিজ্ঞানের ব্যাখ্যা করিতেও অক্ষম; অতএব উহা কখনই বিজ্ঞানের কারণ নহে।

৪। বিজ্ঞানের কারণ কেবল তাহাই হইতে পারে যাহা আত্মার সহিত ঘনিষ্ঠভাবে সম্বন্ধ। আত্মার ভিতরে বিজ্ঞান জন্মাইতে পারে কেবল সেই যে আত্মার ভিতরে আছে অথবা যাহার ভিতরে আত্মা আছে,—আত্মা যাহার আয়ত্তাধীন। কিন্তু প্রকৃতিবাদের কল্পিত জড়শক্তি প্রকৃতিবাদীদের মতেই আত্মার বাহিরের বস্তু। আত্মার ভিতরকার বস্তু হইতে গেলেই ইহাকে হয় জ্ঞাতা অথবা অথবা জ্ঞাতার আশ্রিত কোন বিষয়

হইতে হইবে ; সুতরাং প্রকৃতিবাদীরা ইহাকে সাবধানে আত্মার বাহিরে রাখেন। কিন্তু আত্মার বাহিরে থাকাই যাহার প্রকৃতি, সে বাহিরে থাকিয়াও আবার আত্মার ভিতরে বিজ্ঞান জন্মায়, আত্মাকে অসংখ্য ভিন্ন ভিন্ন বিজ্ঞান-যুক্ত করে, ইহার অপেক্ষা অধিকতর অসঙ্গত কথা আর কিছুই হইতে পারে না। যাহা বাহিরের বস্তু তাহা ভিতরে কার্য্য করিতে পারে না, আর যাহা ভিতরে কার্য্য করে তাহা বাহিরের বস্তু হইতে পারে না। যাহা সম্পূর্ণরূপে বাহিরের বস্তু তাহাই আবার ভিতরে কার্য্য করে এই কথা স্পষ্টতঃই স্ববিরোধী। এরূপ স্ববিরোধী অসঙ্গত কথা দার্শনিক সত্য রূপে ব্যাখ্যাত হইতেছে এবং উচ্চ গভীর জ্ঞানের কথা বলিয়া গৃহীত হইতেছে, ইহা ভাবিলে সময়ে সময়ে কিছু ধৈর্য্যচ্যুতি হয়,—অন্ধের নেতা অন্ধ জ্ঞানাভিমানীদিগকে কিছু কটূক্তি করিতে ইচ্ছা হয়।

৫। প্রকৃতিবাদী "কারণ" কথাটার অর্থ একবারেই ভুলিয়া যান, তাহাতেই একটা অজ্ঞেয় বস্তুতে কারণত্ব আরোপ করিতে যান। জ্ঞেয় বস্তুদিগের পরস্পরের একটা সম্বন্ধকে আমরা কারণত্ব বলি। কারণত্বের জ্ঞান জ্ঞানরাজ্যেই হয়। কিন্তু প্রকৃতিবাদী 'কারণ' কথাটা জ্ঞান-জগতে শিক্ষা করিয়া ক্রমে ইহার অর্থ ভুলিয়া যান ; ভুলিয়া গিয়া জ্ঞেয় বস্তু ও অজ্ঞেয় বস্তুর একটা কল্পিত সম্বন্ধকে এই নামে অভিহিত করেন। আমরা এই কথাটা একটু বিশেষভাবে বুঝাইতেছি। 'কারণের'

বৈজ্ঞানিক অর্থ—"যাহার পর কার্য্যটা নিয়ত ঘটে," অথবা সংক্ষেপে (এই সংক্ষিপ্ত নামে কিছু ভুল আছে)—'নিয়ত পূর্ব্ববর্ত্তী'। অগ্নি-সংস্পর্শে দহন কার্য্য নিয়ত ঘটে, সেই জন্য অগ্নি-সংস্পর্শ দহন কার্য্যের বৈজ্ঞানিক কারণ। দর্শনেন্দ্রিয়ে আলোক সংস্পর্শ হইলে বর্ণবোধ নিয়তই ঘটে, সেই জন্য আলোক বর্ণবোধের কারণ। স্পর্শেন্দ্রিয়ে উত্তাপ নামক ঐথারিক আন্দোলন সংস্পর্শে উষ্ণতাবোধ নিয়তই ঘটে, সেই জন্য উত্তাপ উষ্ণতাবোধের কারণ। পুষ্পাদি বিশেষ বিশেষ বস্তুর রেণু ঘ্রাণেন্দ্রিয়ে সংস্পৃষ্ট হইলে ঘ্রাণবোধ নিয়তই ঘটে, সেইজন্য এই সকল রেণু ঘ্রাণের কারণ। অক্সিজেন ও হাইড্রোজেনের সংযোগে নিয়তই জল উৎপন্ন হয়, এই জন্য অক্সিজেন ও হাইড্রোজেনের সংযোগ জলের কারণ। "কারণের" এই এক অর্থ। এই বৈজ্ঞানিক কারণবাদ অনুসারে কার্য্যের কারণ যাহা তাহাও কার্য্য। এক কার্য্য বা কতিপয় কার্য্য অপর কার্য্যের কারণ; এই সমুদায় কার্য্যই বিজ্ঞান-নিচয়। বিজ্ঞান ব্যতীত আর কোন কার্য্য

---

* See J. S. Mill' *System of Logic.* Book III. Chap. V, and see Mill's view of Causation criticised in pp. 296-306 of the second volume of Green's Works. See also a brief exposition of Mill's view in my *Roots of Faith* : Cause—Physical and Spiritual, and in Babu Nagendranath Chatturji's "ধর্ম্ম-জিজ্ঞাসা," Lecture II.

আমরা জানি না, কল্পনা করিতেও পারি না। কোন জানা কার্য্যের কারণরূপী বিজ্ঞান বা বিজ্ঞান-নিচয় আমাদের ব্যক্তিগত জ্ঞানের বিষয় না হইতে পারে, কিন্তু ইহার বা ইহাদের প্রকৃত অস্তিত্বে বিশ্বাস করিতে হইলে ইহাও বিশ্বাস করিতে হইবে যে ইহা বা ইহারা কোন লোকাতীত জ্ঞানের বিষয়ীভূত। যে সকল ঐথারিক আন্দোলন বর্ণ ও উষ্ণতাবোধের কারণ, সে সমুদায় এক একটি বিজ্ঞান-প্রবাহ মাত্র। সেই সকল বিজ্ঞান-প্রবাহের অস্তিত্বে বিশ্বাস করিতে হইলে ইহাদের আধাররূপী কোন লোকাতীত জ্ঞানে বিশ্বাস করিতে হইবে। ঘ্রাণের কারণ যে পুষ্পরেণু প্রভৃতি, ইহারা আমাদের ব্যক্তিগত জ্ঞানের বিষয় না হইলেও দৃশ্য বা স্পৃশ্য বস্তু ব্যতীত আর কিছুই নহে; সুতরাং ইহাদের অস্তিত্বে বিশ্বাস করিতে হইলে ইহাদের আধাররূপী কোন লোকাতীত আত্মার অস্তিত্বে বিশ্বাস করিতে হইবে। তেমনি আস্বাদের কারণরূপী যে ভক্ষ্য বস্তুর সূক্ষ্মাংশ-সমূহ, এবং শব্দের কারণরূপী যে বায়ুর আন্দোলন, এই সমুদায় আমাদের ব্যক্তিগত জ্ঞানের বিষয় না হইলেও ইহারা দৃশ্য বা স্পৃশ্য বিষয়, সুতরাং কোন লোকাতীত জ্ঞানের আশ্রিত। সুতরাং পাঠক দেখিতেছেন যে, এই বৈজ্ঞানিক কারণবাদ আমাদিগকে জ্ঞানরাজ্যের বাহিরে লইয়া যায় না। ইহা বিজ্ঞানের যে সকল কারণ নির্দ্দেশ করে, সে সমুদায়ও বিজ্ঞান-মাত্র, সুতরাং জ্ঞানেরই বিষয়। বৈজ্ঞানিক কার্য্য-কারণত্ব এমন

একটা সম্বন্ধ যাহা কেবল জ্ঞানের বিষয়ীভূত বিজ্ঞানসমূহের পরস্পরের মধ্যেই খাটে। এই সম্বন্ধ একটা নির্দ্দিষ্ট পূর্ব্ববর্ত্তিত্ব ও পরবর্ত্তিত্ব ব্যতীত আর কিছুই নহে। কোন ঘটনা বা ঘটনাবলীর পরে নিয়তই যে ঘটনা ঘটে, তাহাই উক্ত ঘটনা বা ঘটনাবলীর কার্য্য; আর কার্য্যটি যে ঘটনা বা ঘটনাবলীর পরে নিয়তই ঘটে, সেই ঘটনা বা ঘটনাবলীই কার্য্যটির কারণ। "কারণের" এই অর্থ গ্রহণ করিলে স্পষ্টতঃই কোন জ্ঞানাতীত অজ্ঞেয় অভাবনীয় বস্তু বিজ্ঞানের কারণ হইতে পারে না। জ্ঞান-জগতে আমরা আর এক প্রকার কারণত্ব দেখিতে পাই, উহাকে দার্শনিক কারণত্ব বলা যায়। সে কারণত্বও আমাদিগকে জ্ঞান-জগতের বাহিরে লইয়া যাইতে পারে না; সে কারণত্বও এমন একটা সম্বন্ধ যাহা কেবল জানা বস্তুসমূহের মধ্যেই খাটে। আমরা দেখিতেছি আত্মা স্থায়ীভাবে আত্মজ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া বিবিধ বিজ্ঞান-সমন্বিত হইতেছে, নিজের সংযোগকারী শক্তিতে এই সমুদায় বিজ্ঞানকে সমষ্টিভূত করিয়া বিবিধ তত্ত্ব গঠন করিতেছে, এবং বিবিধ কার্য্য সম্পাদন করিতেছে। এ স্থলে আত্মা ও এই সমুদায় কার্য্যের মধ্যে কার্য্যকারণ সম্বন্ধ বর্ত্তমান। আত্মা এই সমুদায় কার্য্যের কারণ; কারণ এই অর্থে যে এই সমুদায় কার্য্য উৎপন্ন হইবার পক্ষে আত্মার অস্তিত্ব অপরিহার্য্য। কিন্তু এ স্থলেও কার্য্য-কারণত্বের সম্বন্ধ জ্ঞেয় বস্তুসমূহের মধ্যেই বর্ত্তমান;

কার্য্যগুলি জ্ঞেয়, কারণও জ্ঞেয়। এ স্থলেও কারণত্ব আমাদিগকে জ্ঞানরাজ্যের বাহিরে লইয়া যাইতেছে না, কোন জ্ঞান-নিরপেক্ষ অজ্ঞেয় বস্তুর সংবাদ আনিতেছে না। বরং এখানে কারণ যে, সে স্বয়ং জ্ঞানবস্তু—সমুদায় জ্ঞানের মূল, তাহাকে না জানিয়া আর কিছুই জানা যায় না, আর তাহার সমস্ত কার্য্যই জ্ঞানের উপর নির্ভর করে। আত্মা রূপরসাদি বিজ্ঞান অনুভবই করুক্, কোন তত্ত্ব মীমাংসাই করুক্, আর কোন কার্য্যই করুক্, সমস্তই জ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত হইয়া করে, এবং জ্ঞানবান্ বলিয়াই করে; জ্ঞানবান্ না হইলে এই সমুদায় কিছুই করিতে পারিত না; ইহার কর্তৃত্ব জ্ঞাতৃত্বের উপর নির্ভর করে। 'কর্তৃত্ব' ব্যাপারটা বুঝিতে গেলেই দেখি ইহা অপরিহার্য্যরূপে জ্ঞাতৃত্বের উপর নির্ভর করে; জ্ঞাতৃত্ব ছাড়িয়া কর্তৃত্ব অর্থহীন, অসম্ভব; সুতরাং যাহার জ্ঞাতৃত্ব নাই, যাহা জ্ঞানবান্ নয়, তাহা কখনও কর্ত্তা হইতে পারে না। অতএব প্রকৃতিবাদ ও অজ্ঞেয়তাবাদের ভ্রম আমরা পরিষ্কাররূপেই দেখিতে পাইতেছি। প্রকৃতিবাদ বিজ্ঞানের কারণরূপে যে এক অজ্ঞেয় অচেতন বস্তু কল্পনা করে তাহার কারণত্ব কিছুতেই থাকিতে পারে না। তাহা 'নিয়ত-পূর্ব্ববর্ত্তীর' অর্থে কারণ হইতে পারে না, কেননা সেরূপ কারণ জ্ঞানের ভিতর, এবং তাহার আবার কারণ চাই। আত্মা যে অর্থে মানসিক অবস্থা নিচয়ের কারণ

বা কর্ত্তা, সে অর্থেও তাহা কারণ হইতে পারে না, কেননা সেরূপ কারণত্ব জ্ঞাতৃত্বের উপর নির্ভর করে। সুতরাং প্রকৃতিবাদের কল্পিত অজ্ঞেয় কারণের কোন কারণত্বই নাই, উহা একটা কারণত্বহীন কারণ, অজ্ঞেয় জানা বস্তু, একটা সোনার পাথরের বাটী, একটা স্ববিরোধী কথার কথা মাত্র, উহা কিছুই নহে।

আমরা আত্মা ও অনাত্মার সম্বন্ধ বিষয়ে এই পর্য্যন্ত যতটকু আলোচনা করিলাম। তাহার সিদ্ধান্ত কি, পাঠক তাহা বুঝিয়া থাকিবেন। জ্ঞান—যাহা বিশ্বাস সম্বন্ধে আমাদের পরিচালক,—তাহা কিসের সাক্ষ্য দেয় ? জ্ঞান কোন অজ্ঞান অজ্ঞেয় বস্তুর সাক্ষ্য দেয় না, জ্ঞান জ্ঞানেরই সাক্ষ্য দেয়—জ্ঞানরূপী আত্মবস্তুর—জ্ঞানবস্তুরই—সাক্ষ্য দেয়। এই জ্ঞানবস্তুর দুই দিক্, এক দিক্ জ্ঞাতা এবং জ্ঞাতারূপে জ্ঞাত, আর দিক্ কেবলই জানা। প্রথম দিক্‌কে বিষয়ী, দ্বিতীয় দিক্‌কে বিষয় বলা যায়। এই দুই দিক্‌কে ভেদ করা যায়, কিন্তু, পৃথক্ করা যায় না। বিষয়কে লোকে বিষয়ী হইতে পৃথক্ করিতে যায়, কিন্তু আমরা দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছি যে বিষয়ী বিষয়ের অপরিহার্য্য আশ্রয় ; বিষয়ী হইতে বিষয়কে পৃথক্ করিলে বিষয়ের কিছুই থাকে না। আমরা দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছি যে যাহাকে আমরা জড় বলি তাহা জ্ঞানের আশ্রিত বিষয়, জ্ঞানের আশ্রয় ভিন্ন ইহা থাকিতে পারে না। এই যে জ্ঞানের দুই দিক্, কেহ ইচ্ছা করিলে এই দুই দিকের এক দিক্‌কে আত্মা, অপর দিক্‌কে অনাত্মা বলিতে পারেন, কিন্তু

সর্ব্বদা স্মরণ রাখা আবশ্যক যে আত্মা ও অনাত্মা একই অখণ্ড জ্ঞানবস্তুর দুইটি অচ্ছেদ্য দিক্ মাত্র; আসল খাঁটি বস্তু জ্ঞান,—আমরা ইহাকে অনেকস্থলে কেবল আত্মাই বলিয়াছি। ইহাকে আত্মা বলিলেই যথেষ্ট হয়, কেন না আত্মা বলিলে বিষয়িত্ব ও বিষয়ত্ব উভয়ই বুঝায়। জ্ঞান এই আত্মবস্তুর—এই জ্ঞানবস্তুরই—পরিচয় দেয়. আমরা যাহা কিছু প্রত্যক্ষ জ্ঞানদ্বারা জানি তাহা এই জ্ঞানবস্তুরই অন্তর্গত। যাহা কিছু প্রত্যক্ষ জ্ঞানদ্বারা জানি না অথচ অনুমানদ্বারা বিশ্বাস করি, তাহাও জ্ঞানের অন্তর্গত, জ্ঞানবস্তুর বিষয়ীভূত. বলিয়াই বিশ্বাস করিতে হইবে। পাঠক যদি বিশ্বাস করেন যে অনন্ত দেশে অনন্ত জগৎ বিদ্যমান রহিয়াছে, যদি বিশ্বাস করেন যে আমাদের ব্যক্তিগত জ্ঞানের অপেক্ষা না রাখিয়াও জগৎ বিদ্যমান থাকে, তবে বিশ্বাস করিতে হইবে যে জগতের আধাররূপী এক লোকাতীত জ্ঞান্ আছে। একই জ্ঞানবস্তু, একই পরমাত্মা, যে অনন্ত দেশ কালের আধাররূপে, এই বিচিত্র জগতের যাবতায় বস্তুর আধাররূপে, বর্ত্তমান রহিয়াছেন এবং আমাদের প্রাণরূপে প্রকাশ পাইতেছেন, আমাদের ব্যক্তিগত জীবনের অজ্ঞানতা, বিস্মৃতি ও নিদ্রার সময়েও যে জগৎ এক নিত্য অনন্ত চিরজাগ্রত আত্মাতে বর্ত্তমান থাকে, এই সকল কথা আমরা ক্রমে বুঝাইতেছি। এই পর্য্যন্ত আমরা এই মীমাংসায় উপনীত হইলাম যে জ্ঞানই জগতের আধার, জ্ঞানই জগতের কারণ; জ্ঞানকে ছাড়িয়া কিছুই থাকিতে পারে না।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

জ্ঞান ও ইন্দ্রিয়

উপরি-উক্ত মীমাংসা সম্বন্ধে একটি সন্দেহ হয় ত কোন কোন পাঠকের থাকিয়া যাইতেছে ; এই পরিচ্ছেদে আমরা এই সন্দেহ দুর করিতে চেষ্টা করিব। কোন কোন পাঠক বলিতে পারেন ইন্দ্রিয়ের বিষয়ীভূত সমুদায় বস্তুই জ্ঞানের আশ্রিত, ইহা যেন বুঝিলাম—বর্ণ, ঘ্রাণ, উষ্ণতা, কঠিনতা এই সমুদায় বিজ্ঞান-মাত্র, ইহা যেন স্বীকার করিলাম। কিন্তু যে সকল ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে এই সকল বিজ্ঞান অনুভব করি, সে সকল ইন্দ্রিয় কি জ্ঞান-নিরপেক্ষ নহে? ইন্দ্রিয় থাকিলে ত ইন্দ্রিয়বোধ হইবে? ইহাতেই ত বুঝা যাইতেছে যে বিজ্ঞানোৎপত্তির পূর্ব্বে বিজ্ঞানের অন্যতর কারণরূপে ইন্দ্রিয় বর্ত্তমান ছিল; সুতরাং ইন্দ্রিয় বিজ্ঞান-সাপেক্ষ নহে, ইন্দ্রিয় জ্ঞানাশ্রিত বস্তু নহে। আমরা এই কথার উত্তর দিতেছি। ইন্দ্রিয় বস্তুটা কি তাহা বুঝা আবশ্যক, বুঝিলে আর কোন গোল থাকে না। ইন্দ্রিয়ের দুই অর্থ হইতে পারে; আমরা দেখাইতেছি যে, এই দুই অর্থের যে অর্থই গ্রহণ করা যাক্, উভয় অর্থেই ইন্দ্রিয় জ্ঞানাধীন বিষয়। ইটি সর্ব্বদা স্মরণ রাখা আবশ্যক যে, ইন্দ্রিয় জ্ঞাতা নহে, আত্মাই জ্ঞাতা। চিন্তাহীন লোকে ভাবে চক্ষুই দেখে, কর্ণই শুনে, জিহ্বাই আস্বাদন করে, হস্তই স্পর্শ করে। এই সকল কথা যে ভুল

তাহা চিন্তাশীল ব্যক্তি মাত্রেই জানেন। প্রাণবিহীন দেহ চক্ষু সত্ত্বেও দেখে না, কর্ণ সত্ত্বেও শুনে না, জিহ্বা সত্ত্বেও আস্বাদন করে না, হস্ত সত্ত্বেও স্পর্শ করে না। আত্মাই দ্রষ্টা, আত্মাই শ্রোতা, আত্মাই আস্বাদক, আত্মাই স্পর্শকারী। আত্মা ইন্দ্রিয়-দ্বারা দেখে, শুনে, স্পর্শ করে, এই পর্য্যন্ত বলিতে পারা যায়। দেখা যাক্, এই "দ্বারা" কথাটা কাহাকে বুঝাইতেছে। আত্মা দেখে, শুনে, স্পর্শ করে, এই সমস্ত আত্মারই জ্ঞান, আত্মারই কার্য্য। আত্মা যে দেখিতে পারে, এই যে আত্মার দেখিবার ক্ষমতা, ইহাকে আত্মার দর্শনশক্তি বা দর্শনেন্দ্রিয় বলা যাইতে পারে। কিন্তু এই শক্তি বা ইন্দ্রিয় স্পষ্টতঃই আত্মা হইতে স্বতন্ত্র বস্তু নহে, ইহা আত্মার সহিত একীভূত। এইরূপে আত্মার শ্রবণশক্তি বা শ্রবণেন্দ্রিয়, আত্মার স্পর্শশক্তি বা স্পর্শেন্দ্রিয়, এই সমুদায় আত্মার সহিত একীভূত। জ্ঞাতা এবং জ্ঞান-শক্তি দুই নহে, একই বস্তু। ইন্দ্রিয়ের অর্থ যদি ইহাই হয়, তবে আত্মা ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে জানে, আত্মা নিজের জ্ঞানশক্তিতে জানে, এই কথা বলাতে আত্মার অতিরিক্ত জ্ঞান-নিরপেক্ষ কোন বস্তুর কথা বলা হইল না; আত্মা যে জ্ঞাতা, কেবল এই কথাটাই একটু ঘুরাইয়া বলা হইল। এই যে আত্মার সহিত একীভূত জ্ঞানশক্তি বা জ্ঞানেন্দ্রিয়, ইহা কিছুর উপর নির্ভর করে না, বরং অন্য সমুদায় বস্তুই ইহার উপর নির্ভর করে। আত্মজ্ঞান সমুদায় জ্ঞানের আশ্রয়, অব-

লম্বন। জ্ঞানবস্তু যে আত্মা, সে অন্য সমুদায় বস্তুর আশ্রয়, অবলম্বন।

ইন্দ্রিয়ের আর এক অর্থ চক্ষু কর্ণাদি শারীরিক অঙ্গ প্রত্যঙ্গ। এই সকল অঙ্গ প্রত্যঙ্গের আভ্যন্তরিক গঠনই দেখা যাক্ আর বাহ্যিক গঠনই দেখা যাক্, ইহারা সর্ব্বাংশেই ভৌতিক বস্তু—ইহারা বিষয়-জগতের অংশ,—ইহারা জ্ঞানের বিষয়ীভূত বস্তু। জ্ঞান অন্যান্য জড় বস্তুকে যেমন প্রকাশিত করে, ইহাদিগকেও তেমনি প্রকাশিত করে; অন্যান্য বস্তু যেমন জ্ঞানে আশ্রয় লাভ করিয়া সত্তাবান্ হয়, ইহাদের সম্বন্ধেও সেই কথা ঠিক্। চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক্, স্নায়ুযন্ত্র, মাংসপেশী, এই সমুদায় দৃষ্ট বা দৃশ্য বস্তু, স্পৃষ্ট বা স্পৃশ্য বস্তু। সুতরাং দৃষ্টি ও স্পর্শ-গোচর বস্তু সম্বন্ধে আমরা যাহা কিছু বলিয়াছি, সমস্তই এই সকল বস্তু সম্বন্ধে খাটে। জ্ঞানের আশ্রয়ে ভিন্ন এই সকল বস্তু থাকিতে পারে না। তাহাই যদি হইল, এই সকল বস্তু যদি জ্ঞানরূপা আত্মারি আশ্রিত বস্তুই হইল, তবে আর কিরূপে বলিব যে আত্মা এই সকল বস্তুকে অবলম্বন করিয়া জ্ঞানবান্ হয়, এই সকল বস্তুকে অবলম্বন করিয়া বিজ্ঞান অনুভব করে? যে জ্ঞানের আশ্রয়ে ভিন্ন ইন্দ্রিয় থাকিতে পারে না, সেই জ্ঞান কিরূপে ইন্দ্রিয়-সাপেক্ষ হইবে? আমরা কিছু এই কথা বলিতেছি না যে চক্ষু কর্ণ প্রভৃতি অঙ্গ প্রত্যঙ্গ আমাদের ব্যক্তিগত জ্ঞানের অধীন—আমাদের জ্ঞান বিকশিত

হইবার সঙ্গে সঙ্গে ইহারা উৎপন্ন হইয়াছে। ইহারা যে আমাদের ব্যক্তিগত জ্ঞানের অধীন নহে, আমাদের জ্ঞান বিকশিত হইবার পূর্ব্বেই যে ইহারা গঠিত হইয়াছিল, তাহাতে আর সন্দেহ কি? কিন্তু আমাদের ব্যক্তিগত জ্ঞান-নিরপেক্ষ বলিয়াই যে ইহারা সমুদায় জ্ঞান-নিরপেক্ষ এবং জ্ঞানমাত্রেরই অপরিহার্য্য অবলম্বন, তাহা নহে। কেবল ইন্দ্রিয় কেন, আমাদের জানা কোন বস্তুই আমাদের ব্যক্তিগত জ্ঞানের অধীন নহে, সমুদায়ই আমাদের জন্মের পূর্ব্বে বর্ত্তমান ছিল। কিন্তু অন্যান্য বস্তু যেমন আমাদের ব্যক্তিগত জ্ঞানের অধীন না হইয়াও কোন লোকাতীত জ্ঞানের অধীন, আমাদের চক্ষু কর্ণাদি ইন্দ্রিয়সমূহও তেমনি কোন লোকাতীত জ্ঞানের অধীন। ইন্দ্রিয়সমূহের মধ্যে যখন জড়ের সমস্ত লক্ষণ বর্ত্তমান, তখন যে যুক্তিতে অন্যান্য জড়বস্তু জ্ঞানের আশ্রিত, সেই যুক্তিতেই ইহারাও জ্ঞানের আশ্রিত। যে লোকাতীত জ্ঞানে অন্যান্য বস্তু আশ্রয় লাভ করিয়া সত্তাবান্ হইয়াছে, সেই লোকাতীত জ্ঞানে ইন্দ্রিয়সমূহও আশ্রয় লাভ করিয়া সত্তাবান্ হইয়াছে। সেই জ্ঞানের পক্ষে ইন্দ্রিয়ের কোন বিশেষত্ব নাই। সেই জ্ঞান ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে বিজ্ঞান লাভ করে, এই কথা নিতান্তই অসঙ্গত। ইন্দ্রিয়ের অস্তিত্বের পক্ষে অগ্রে জ্ঞান থাকা আবশ্যক, জ্ঞান আবার কিরূপে ইন্দ্রিয়ের সাহায্য-সাপেক্ষ হইবে? যদি কেহ বলেন যে লোকাতীত জ্ঞানের অস্তিত্বের কোন প্রমাণ নাই, তবে আমরা

আপাততঃ কেবল এই পর্য্যন্ত বলিতে পারি যে চক্ষুরাদি অঙ্গপ্রত্যঙ্গ-সমূহ যে আমাদের ব্যক্তিগত জ্ঞানের বিষয়ীভূত হইবার পূর্ব্বে বর্ত্তমান ছিল, অথবা আমাদের ব্যক্তিগত জ্ঞান হইতে বিচ্যুত হইলে যে ইহারা বর্ত্তমান থাকে, তাহারও কোন প্রমাণ নাই। চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় ও অন্যান্য সমুদায় জড়বস্তু আমাদের ব্যক্তিগত জ্ঞানেই প্রথমতঃ আমাদের নিকট প্রকাশিত হয়; এই প্রকাশকে ভিত্তি করিয়াই বিজ্ঞানশাস্ত্র সিদ্ধান্ত করে যে এই সমুদায় বস্তু আমাদের ব্যক্তিগত জ্ঞান বিকাশের পূর্ব্বেও বর্ত্তমান ছিল। বৈজ্ঞানিক মীমাংসার আর কোন ভিত্তি নাই। এই প্রকাশই যদি এই সিদ্ধান্তের প্রমাণ হয়, তবে এই প্রকাশ এই সিদ্ধান্তেরও প্রমাণ যে, যে জ্ঞানের আশ্রয়ে এই সমস্ত বস্তু প্রকাশিত হয় সেই জ্ঞানের ব্যক্তিগত সসীম আকারটাই নূতন, জ্ঞানবস্তুটা নূতন নহে, এই ব্যক্তিগত আকার ধারণের পূর্ব্বেও বস্তুটা বর্ত্তমান ছিল। যাহা হউক, এই বিষয়ের বিস্তৃত আলোচনা পরে হইবে। আমরা এখন কেবল এই পর্য্যন্ত দেখাইলাম যে আমাদের ব্যক্তিগত জীবনে জ্ঞান প্রকাশিত হইবার পূর্ব্বে যে ইন্দ্রিয়সমূহ বর্ত্তমান ছিল এই সত্যের যে প্রমাণ, এই সকল ইন্দ্রিয়ের আশ্রয়রূপে যে এক জ্ঞানবস্তু বর্ত্তমান ছিল এই সত্যেরও সেই একই প্রমাণ। ইন্দ্রিয় যখন সেই জ্ঞানের আশ্রিত বস্তু, তখন সেই জ্ঞান মূলে ইন্দ্রিয়-সাপেক্ষ হইতে পারে না, সেই জ্ঞান ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে

জানে, অর্থাৎ ইহার আশ্রিত বিষয়ের সাহায্যে জানে, এই কথা নিতান্তই অসঙ্গত।

কিন্তু জ্ঞান মূলে ইন্দ্রিয়-সাপেক্ষ না হইলেও আমাদের ব্যক্তিগত জীবনে জ্ঞানের যে প্রকাশ, তাহা যে এক অর্থে ইন্দ্রিয়-সাপেক্ষ, তাহা স্পষ্টই দেখা যাইতেছে। চক্ষু, কর্ণ, স্নায়ুযন্ত্র প্রভৃতির কার্য্য না হইলে যে আমাদের ব্যক্তিগত জীবনে বর্ণ স্পর্শাদি বিজ্ঞান প্রকাশিত হয় না, এই বিষয়ে অধিক বলা বাহুল্য মাত্র। ইন্দ্রিয়ের ক্রিয়া যে ইন্দ্রিয়বোধের বৈজ্ঞানির কারণ, ইন্দ্রিয়বোধের নিয়ত পূর্ব্ববর্ত্তী ঘটনা, তাহাতে কোন সন্দেহই নাই। কিন্তু কার্য্যের বৈজ্ঞানিক কারণ কার্য্যের যথেষ্ট কারণ নহে, জ্ঞানের পক্ষে তৃপ্তিকর কারণ নহে। বৈজ্ঞানিক কারণগুলিও কার্য্যমাত্র, ইহারা আবার কারণান্তর-সাপেক্ষ। সমুদায় কার্য্যের মূল কারণ—দার্শনিক কারণ—জ্ঞানবস্তু। যে সকল ইন্দ্রিয় আমাদের ব্যক্তিগত বিজ্ঞান-সমূহের বৈজ্ঞানিক কারণ, সেই ইন্দ্রিয়সমূহও যে স্বতন্ত্র স্বাধীন নহে, সেই ইন্দ্রিয়সমূহও যে জ্ঞানের বিষয়ীভূত বস্তু, ইহা বোধ হয় এখন পাঠক বুঝিতে পারিলেন।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

আত্মা—ব্যষ্টি ও সমষ্টি

পাঠক এই পুস্তকের যতটকু পড়িয়াছেন, তাহাতে বোধ হইতে পারে যে আমরা জগতের একত্ব ও স্থায়িত্ব অস্বীকার করিতেছি, এক ও স্থায়ী জগৎকে ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তিগত আত্মা ও সেই আত্মাসমূহের অস্থায়ী বিজ্ঞানে পরিণত করিতেছি। আমাদের ব্যাখ্যার মর্ম্ম এরূপ বোধ হওয়া আশ্চর্য্যের বিষয় নহে, কিন্তু উহার প্রকৃত মর্ম্ম তাহা নহে। চলিত বিশ্বাসের পক্ষে যেমন, দার্শনিক জ্ঞানের পক্ষেও যে জগৎ তেমনি এক ও স্থায়ী, ইহা আমাদের দ্বিতীয় ও তৃতীয় অধ্যায় পড়িলেই পাঠক স্পষ্টরূপে বুঝিতে পারিবেন। এই বিষয়ে চলিত বিশ্বাস ও দার্শনিক জ্ঞানে প্রভেদ এই যে চলিত বিশ্বাসে বিষয়-জগৎ আত্মা হইতে স্বতন্ত্র, দার্শনিক জ্ঞানে ইহা জ্ঞানরূপী আত্মায় প্রতিষ্ঠিত। যাহা হউক, আমরা দ্বিতীয় ও তৃতীয় অধ্যায়ের বিস্তৃত ব্যাখ্যার অপেক্ষা না রাখিয়া এ স্থলেই উপরি-উক্ত সত্যের কিঞ্চিৎ আভাস দিতেছি। আমরা এই অধ্যায়ে প্রমাণ করিলাম যে স্বাধীন অনাত্মা বলিয়া কোন বস্তু নাই, যাহা আপাততঃ অনাত্মা বলিয়া বোধ হয় তাহা প্রকৃত পক্ষে আত্মার অধীন। আমরা প্রতি জ্ঞানক্রিয়ায় একটি, অখণ্ড বস্তুর পরিচয় পাই, সেই বস্তুর এক দিক্ জ্ঞানবান্ বিষয়ী, আর এক দিক্ জানা

বিষয়। জ্ঞানবান্ বিষয়ী ছাড়া জানা বিষয় থাকা অসম্ভব, জানা বিষয় ছাড়াও জ্ঞানবান্ বিষয়ী অর্থহীন—এই সত্যটি যদি পাঠক বুঝিয়া থাকেন, তবেই আমাদের এই অধ্যায় লেখা সার্থক হইয়াছে। এখন কথা এই যে প্রত্যেক জ্ঞানক্রিয়ায় আমরা যে আত্মার পরিচয় পাই সেই আত্মা ব্যষ্টি কি সমষ্টি, ব্যক্তিগত কি সার্ব্বভৌমিক? আমরা রূপ, রস, গন্ধ, শব্দ স্পর্শাদির জ্ঞানাধীনতা দেখাইতে গিয়া বার বার ইহাই বলিয়াছি যে ইহারা ভিন্ন ভিন্ন আত্মার ভিন্ন ভিন্ন বিজ্ঞান। কিন্তু স্থানে স্থানে আমরা ইহাও বলিয়াছি যে আমরা যাহাকে নিজ আত্মা বলি তাহা একান্ত ব্যক্তিগত নহে, ইহা মূলে সার্ব্বভৌমিক, সর্ব্বাধার, নিত্য, অনন্ত; ইহার ব্যক্তিগত প্রকাশই সসীম ও অনিত্য। এই সত্যের আভাস আমাদের প্রদত্ত জড়জগতের ব্যাখ্যায়ই প্রচ্ছন্ন আছে। চলিত বিশ্বাস এই যে জড়জগৎ আত্মা হইতে স্বাধীনভাবে আছে, জ্ঞানক্রিয়ার সময় সেই স্বাধীন জগৎ সসীম জীবাত্মার জ্ঞানগোচর হয়, তাহার জ্ঞানের সহিত সংযুক্ত হয়, এবং জ্ঞানক্রিয়ার অবসানে এই যোগ ভঙ্গ হয়। পাঠক যদি আমাদের ব্যাখ্যা বুঝিয়া থাকেন, তবে তিনি দেখিয়াছেন যে এই চলিত বিশ্বাস জ্ঞানক্রিয়ার প্রকৃত ব্যাখ্যা নহে। জ্ঞানক্রিয়ার প্রকৃত ব্যাখ্যা এই যে ইহাতে একটি অখণ্ড বিষয়-বিষয়ি-ভাব-সমন্বিত জ্ঞানবস্তু সসীম আকারে প্রকাশিত হয়; সেই বস্তুতে বিষয় ও বিষয়িভাব অচ্ছেদ্যরূপে

সম্বন্ধ। পরস্পরের সহিত অসম্বদ্ধভাবে অবস্থিত বিষয় ও বিষয়ী ক্ষণকালের জন্য আসিয়া পরস্পরের সহিত যুক্ত হয়, এই কথা যথার্থ নহে ; ভেদ ও অভেদ ভাবে নিত্যযুক্ত দুটি তত্ত্ব-সমন্বিত একটি অখণ্ড বস্তুই প্রতি জ্ঞানক্রিয়ায় প্রকাশিত হয়। সুতরাং পাঠক দেখিবেন, যে আমাদের আত্মাকে ব্যষ্টি বা ব্যক্তিগত বলিলে বিষয়জগতের সহিত আপাততঃ ইহার যে স্বতন্ত্রতা বুঝায়, প্রকৃত পক্ষে ইহার সেই স্বতন্ত্রতা নাই। আমরা যে-কোন বিষয়কে জানি, সেই বিষয়ের সঙ্গেই যখন নিজ আত্মাকে অচ্ছেদ্যরূপে জানি, তখন বিষয় হইতে ইহার স্বতন্ত্রতা কোথায় ? জ্ঞানক্রিয়ার প্রকৃত স্বরূপ না বুঝাতেই জ্ঞানী আত্মাকে জানা বিষয় হইতে স্বতন্ত্র বলিয়া বোধ হয়। জ্ঞানক্রিয়ার প্রকৃত স্বরূপ বুঝিলে দেখা যায় যে বিষয়কে জানিতে গিয়া অবশ্যম্ভাবীরূপে সেই বিষয়ের আশ্রয়রূপী আত্মাকে জানা হয় ; আশ্রয়রূপী আত্মাকে না জানিয়া আশ্রিত বিষয়কে জানা অসম্ভব। আর, যে আত্মাকে জানি সেই আত্মা আর কেহ নহে,- যাহাকে আমরা নিজ আত্মা বলি, উহা সেই আত্মাই। আমি যাহাকে নিজ আত্মা বলি সেই আত্মাই আমার জানা প্রত্যেক বিষয়ের আশ্রয়রূপে প্রকাশিত হয়। আমি যাহাকে নিজ আত্মা বলি সেই আত্মাই আমার শরীরকে জানিতে গিয়া শরীরের দ্রষ্টা, স্প্রষ্টা ও বোদ্ধারূপে, অর্থাৎ শরীররূপ বিষয়ের আধারভূত বিষয়ীরূপে, প্রকাশিত হয়।

আমার সম্মুখ স্থিত টেবল্‌কে জানিতে গিয়া, ইহাকে দেখিতে, ছুঁইতে, বুঝিতে গিয়া, ইহার আধাররূপে নিজ আত্মাকেই জ্ঞাত হই। যে-কোন বিষয়কেই জানি, প্রত্যেকের আশ্রয়রূপে নিজ আত্মাকেই জানি। প্রতি জ্ঞানক্রিয়াতে এই আত্মা সসীমরূপে প্রকাশিত হয় বটে, অর্থাৎ কতিপয় নির্দ্দিষ্ট বিষয় লইয়া প্রকাশিত হয় বটে, কিন্তু ইহা যে মূলে সসীম নহে, পরন্তু অসীম, তাহারও প্রমাণ প্রতিপদেই পাই। যে বিষয় পূর্ব্ব মুহূর্ত্তে আমার ব্যক্তিগত জ্ঞানে প্রকাশিত হয় নাই, তাহাই এখন প্রকাশিত হইতেছে, দিন দিনই পূর্ব্বের অজ্ঞাত বিষয় আমার জ্ঞানগোচর হইতেছে, ইহাতেই বুঝিতেছি যে যাহাকে আমি ব্যক্তিগত সসীম আত্মা বলিতেছি সে মূলে ব্যক্তিগত নহে, সসীম নহে; সে মূলে সার্ব্বভৌমিক, অসীম। এই সমুদায় তত্ত্বের আলোচনা করিলেই পাঠক বুঝিতে পারিবেন যে আমরা যাহাকে নিজ আত্মা বলি তাহার দুটি ভাব আছে,—ব্যষ্টি ও সমষ্টি; অন্য কথায়, ব্যক্তিগত ও সার্ব্বভৌমিক। আত্মা যে মূলে এক, এক পরমাত্মাই যে "সর্ব্বভূতান্তরাত্মা", তাহা পাঠক ক্রমশঃ বুঝিতে পারিবেন। আমাদের তৃতীয় অধ্যায়ে আমরা এই তত্ত্বের বিস্তৃত ব্যাখ্যা করিব। সম্প্রতি এই কথাটি বুঝিতে চেষ্টা করুন্ যে আমরা প্রতি জ্ঞানক্রিয়াতে একই আত্মাকে, যাহাকে নিজ আত্মা বলি সেই আত্মাকেই, ব্যক্তিগত "বিজ্ঞানাত্মা" ও সার্ব্বভৌমিক বিশ্বাত্মারূপে জ্ঞাত

হই। আমাদের জানা বিষয়সমূহ ব্যক্তিগত জ্ঞানের ভূমি হইতে সরিয়া পড়িলে বোধ হয় যেন তাহারা আমাদের আত্মা হইতে পৃথক্ হইয়া পড়ে। মনে হয় যে সেই অবস্থায় তাহারা অন্য কোন আত্মার বিষয়রূপে থাকিলেও থাকিতে পারে, কিন্তু নিশ্চয়ই আমার আত্মার বিষয়রূপে বর্ত্তমান নাই। কিন্তু পাঠক দেখিবেন যে তাহাদের সেই অবস্থার অস্তিত্বকে অবশ্যম্ভাবীরূপে জ্ঞানাধীন—নিজ আত্মারই জ্ঞানাধান—বলিয়া ভাবিতে হয়। এরূপ না ভাবিলে তাহাদের সম্বন্ধে কোন ভাবনা, কোন ধারণা, কোন বিশ্বাসই সম্ভব হয় না। আমার সম্মুখের টেব্‌ল্‌টিকে ইন্দ্রিয়গোচর অবস্থায় যেমন আমার নিজ আত্মার জ্ঞানাধীন বলিয়া প্রতিভাত হয়, ইন্দ্রিয়ের অগোচর অবস্থায়ও অবশ্যম্ভাবীরূপে তেমনি আমার নিজ আত্মারই জ্ঞানাধীন বলিয়া ভাবিতে হয়। এই রূপে না ভাবিলে ইহার সম্বন্ধে কোন ভাবনা, কোন ধারণা, কোন বিশ্বাসই সম্ভব হয় না। আর এরূপ ভাবনা, এরূপ বিশ্বাস, যে অবশ্যম্ভাবী, তাহার কারণ স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে। জ্ঞানক্রিয়ার সময় যদি আমরা কোন জ্ঞাননিরপেক্ষ স্বাধীন বস্তুর সাক্ষাৎ পাইতাম, তবে জ্ঞানক্রিয়ার অবসানেও সেই বস্তুকে জ্ঞান-নিরপেক্ষ স্বাধীন বলিয়াই ভাবিতে ও বিশ্বাস করিতে পারিতাম। কিন্তু জ্ঞানক্রিয়ার সময় আমরা এরূপ কোন বস্তুর সাক্ষাৎ পাই না, যাহাকে নিজ আত্মা বলি কেবল তাহারই সাক্ষাৎ পাই, আর তাহার সহিত অচ্ছেদ্য সম্বন্ধে আবদ্ধ

রূপরসাদি বিষয়ের সাক্ষাৎ পাই। সুতরাং জ্ঞানক্রিয়ার অবসানে ও অবর্ত্তমানেও যদি আমাদিগকে জানা বস্তুর অস্তিত্ব ভাবিতে হয়, বিশ্বাস করিতে হয়, তবে ইহাকে ঠিক্ যেমনটি জানিয়াছি তেমনটিই ভাবিতে হয়, বিশ্বাস করিতে হয়; অর্থাৎ নিজ আত্মা এবং তদধীন বিষয়রূপেই ভাবিতে ও বিশ্বাস করিতে হয়। সুতরাং পাঠক জ্ঞান ও বিশ্বাসের প্রকৃত স্বরূপকে তলাইয়া বুঝিতে গিয়া দেখিবেন আমরা প্রত্যেকে জগৎকে স্থায়ী, সংযুক্ত ও এক ভাবিতে গিয়া, বিশ্বাস করিতে গিয়া, নিজ আত্মাকেই স্থায়ী, সংযোগকারী ও এক বলিয়া ভাবি ও বিশ্বাস করি। জগৎ স্থায়ী, সংযুক্ত ও এক, ইহার অর্থ আর কিছু নয়, ইহার অর্থ এই যে আপাততঃ যে আত্মবস্তুকে বহু এবং পরস্পর হইতে ও জগৎ হইতে স্বতন্ত্র বলিয়া বোধ হয়, সেই আত্মবস্তু মূলে এক, অখণ্ড ও জগতের আধার। যেমন পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, যাহাকে আমরা নিজ আত্মা বলি তাহারই দুটি ভাব, ব্যষ্টি ও সমষ্টি, ব্যক্তিগত ও সার্ব্বভৌমিক। জগৎ-জ্ঞানের সময় বিশেষভাবে ইহার সমষ্টিভাব প্রকাশিত হয়; তখন দেখি ইহা বিশ্বাত্মা, বিশ্বের আধার। আবার, যথাসম্ভব জগতের জ্ঞান ছাড়িয়া যখন বিশেষ ভাবে আত্মজ্ঞানের দিকে মনোযোগ করি, তখন দেখি ইহা ব্যষ্টি বা ব্যক্তিগত আত্মা। কিন্তু এই ব্যষ্টি ও সমষ্টি ভাব পরস্পর অচ্ছেদ্য। পাঠক এই তত্ত্ব ক্রমশঃ আরো স্পষ্টরূপে বুঝিতে পারিবেন। একই সমষ্টি

আত্মা বহু জীবের প্রাণরূপে প্রকাশিত হওয়াতে ব্যষ্টি বা ব্যক্তিগত আত্মাসমূহকে যে জগৎ হইতে ও পরস্পর হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন বলিয়া বোধ হয়, অথচ এই ভিন্নতার পশ্চাতে যে মৌলিক অভেদ রহিয়াছে, তাহাও ক্রমশঃ বুঝিতে পারিবেন। আমরা সেই ব্যাখ্যার মূলসূত্র ইতিপূর্ব্বে দিয়াছি। ভিন্ন ভিন্ন জীবের অনুভূত বিজ্ঞান ভিন্ন ভিন্ন হইলেও সেই সকল ভিন্ন ভিন্ন বিজ্ঞানও সকলের জ্ঞেয়। সেই সকল ভিন্ন ভিন্ন বিজ্ঞানের মধ্যে একটা যোগসূত্র আছে। পাঠক ক্রমশঃ দেখিবেন যে সমষ্টি আত্মাই সেই যোগসূত্র, এবং সেই সমষ্টি আত্মা আমাদের প্রত্যেকের অন্তরাত্মা হইয়া আছেন বলিয়াই আমরা ভিন্ন ভিন্ন মনের ভিন্ন ভিন্ন অবস্থা অবগত হইতে সমর্থ হই। পুনশ্চ, আমরা বলিয়াছি যে সমুদায় দেশই পরস্পর সংযুক্ত, আর আত্মা সেই সংযোগের সূত্র। আমরা প্রত্যেকে সাক্ষাৎ ইন্দ্রিয়-জ্ঞানদ্বারা ভিন্ন ভিন্ন দেশাংশকে, অর্থাৎ আপন আপন শরীরকে, অবগত হই। শরীরের বহিরস্থ বস্তু শরীরে স্পৃষ্ট হইলে তাহাকেও অবগত হই বটে, কিন্তু সেই জ্ঞান সাক্ষাৎ ইন্দ্রিয়ঘটিত জ্ঞান নহে; সেই জ্ঞান অনুমান বা মীমাংসাদ্বারা ব্যবহিত। যাহা হউক, দেশের জ্ঞান প্রত্যক্ষই হউক বা পরোক্ষই হউক, উহাতে একত্ব ও অসীমের ভাব নিহিত আছে। প্রত্যেক দেশখণ্ডকেই আমরা এক অসীম মহাদেশের অন্তর্গত বলিয়া জানি। আর এই এক অসীম

দেশজ্ঞানের মূলে আত্মার মৌলিক একত্ব ও অসীমত্বের জ্ঞান নিহিত আছে। আমরা মূলে এক, অদ্বিতীয়, অনন্ত পরমাত্মার সহিত এক না হইলে এক অনন্ত দেশকে জানিতে পারিতাম না। আমরা আমাদের 'দ্বৈতাদ্বৈতবিবেক' নামক অধ্যায়ে এই বিষয় যথাসাধ্য পরিস্ফুটরূপে ব্যাখ্যা করিব।

দ্বিতীয় অধ্যায়—নিত্যানিত্য-বিবেক

প্রথম পরিচ্ছেদ—বিজ্ঞানবাদ ও মায়াবাদ

এই নিত্যানিত্য-বিবেক নামক দ্বিতীয় অধ্যায়ের উদ্দেশ্য জ্ঞানের নিত্যত্ব প্রতিষ্ঠা। যে জ্ঞান আমাদের জানা সমুদায় বিষয়ের আলোক ও আধাররূপে প্রকাশিত হয়, যে জ্ঞান আমাদের এক মাত্র সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষগোচর জ্ঞান, যে জ্ঞান আমাদের ব্যক্তিগত ইচ্ছার অধীন নহে, পরন্তু যাহা ব্যক্তিগত ইচ্ছার মূল কারণ, যে জ্ঞান আমাদের ব্যক্তিগত অজ্ঞানতা, বিস্মৃতি ও নিদ্রার সময়ে আমাদের জীবনে প্রকাশিত না থাকিলেও পুনরায় আমাদের ইচ্ছা-নিরপেক্ষ ভাবে প্রকাশিত হইয়া আমাদের অজ্ঞানতা, বিস্মৃতি ও নিদ্রা ভঙ্গ করে, সেই জ্ঞান যে কেবল আমাদের ব্যক্তিগত জ্ঞান নহে, সেই জ্ঞান বস্তু যে মূলে সর্ব্বজ্ঞ, চির-স্মৃতিশীল, চিরজাগ্রত, সেই জ্ঞানে যে সমস্ত জগৎ নিত্যভাবে প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে, এই সত্য যুক্তির সহিত ব্যাখ্যা করাই এই অধ্যায়ের উদ্দেশ্য।

আমরা এই অধ্যায়ের প্রথমেই উপরি-উক্ত সত্যের বিরোধী দুটি দার্শনিক মত ব্যাখ্যা করিব, এবং তৎপরে কিছু বিস্তৃত ভাবে জ্ঞানের নিত্যত্ব ব্যাখ্যা করিয়া এই মতদ্বয় খণ্ডন করিব। এই মতদ্বয়ের নাম বিজ্ঞানবাদ (Sensationalism) ও মায়াবাদ (Subjective Idealism)। বিজ্ঞানবাদ বলে

যে আমরা ইন্দ্রিয় সহকারে যাহা কিছু প্রত্যক্ষ করি তাহা যখন বিজ্ঞানপরম্পরা ব্যতীত আর কিছুই নহে, তখন জগতের স্থায়িত্ব কোথায়? আমাদের ব্যক্তিগত জ্ঞান ভিন্ন অন্য কোন জ্ঞান আমরা প্রত্যক্ষভাবে জানি না; আমরা যাহা কিছু প্রত্যক্ষ করি, সমুদায়ই আমাদের ব্যক্তিগত জ্ঞানের উপর নির্ভর করে। কিন্তু আমাদের ব্যক্তিগত জ্ঞান যখন অজ্ঞানতা, বিস্মৃতি ও নিদ্রাশীল, আমাদের জানা বস্তু সকল যখন ক্রমাগতই আমাদের জ্ঞান-বিচ্যুত হইতেছে, তখন এই সমুদায় বস্তুকে স্থায়ী বস্তু বলিব কিরূপে? এই সমুদায় বস্তু আমাদের মনের সাময়িক অবস্থামাত্র, জগৎ একটি অস্থির অস্থায়ী বিজ্ঞান-প্রবাহ মাত্র। এই মুহূর্ত্তে যাহা আছে, পর মুহূর্ত্তে তাহা নাই; পর মুহূর্ত্তে যাহা আসে তাহা সেই মুহূর্ত্তের নূতন বিজ্ঞান। যদি বল বিজ্ঞানের আধাররূপী একটি স্থায়ী আত্মবস্তু আছে যাহা প্রবাহশীল নহে, তবে বলি সেই আত্মবস্তু বিগত বিজ্ঞান-সমূহের একটি স্মৃতি-সমষ্টি ব্যতীত আর কি? এই আত্ম-বস্তুকে আমরা বিজ্ঞানের অনুভবকারী এবং বিজ্ঞানের স্মরণকারী বলিয়া জানি, ইহার বিষয় আর কিছু জানি না, সুতরাং ইহা যখন নিদ্রিত বা অন্য কোন প্রকারে সংজ্ঞা-হীন হয়, যখন ইহা আর বিজ্ঞানের অনুভবকারী থাকে না, বিজ্ঞানের স্মরণকারীও থাকে না, তখন যে ইহার অস্তিত্ব থাকে তাহাই বা কিরূপে বুঝিব? বিজ্ঞান অনুভব করাতেই যখন

ইহার অস্তিত্ব, তখন বিজ্ঞানশূন্য অবস্থায় ইহা কিরূপে থাকিবে ? জগৎকে ও আত্মাকে যে স্থায়ী বস্তু বলিয়া বোধ হয়, তাহা কেবল ভাবযোগ ও প্রত্যাশার ফল। আমরা আমাদের সম্মুখস্থ টেব্‌লটিকে দৃষ্টান্ত-স্থানীয় করিয়া বিজ্ঞানবাদের জগৎতত্ত্ব ব্যখ্যা করিতেছি। টেব্‌ল্‌টিকে যখন আমরা দেখি, স্পর্শ করি, উহার উপর হস্ত বা অন্য কোন অঙ্গদ্বারা বল প্রয়োগ করি, তখনই ইহার প্রকৃত অস্তিত্ব; কেননা টেব্‌ল্‌টি কতকগুলি বিজ্ঞান-সমষ্টি ব্যতীত আর কিছুই নহে। যখন এই বিজ্ঞাননিচয় আমরা অনুভব করি না, তখন যে ইহা প্রকৃতরূপে বর্ত্তমান থাকে, তাহার কোন প্রমাণ নাই। আর প্রকৃতরূপে বর্ত্তমান থাকিলেও তাহা অন্য কোন মনের অনুভবরূপেই থাকিতে পারে, আমার পক্ষে তাহা প্রকৃতরূপে কিছুই নহে। কিন্তু আমার পক্ষে তাহা প্রকৃতরূপে না থাকিলেও সম্ভবনীয়রূপে বর্ত্তমান থাকে। আমি যখন টেব্‌ল্‌টীকে কেবল মাত্র দেখি, ইহাকে স্পর্শ বা ইহাতে হস্তচালনা বা বল প্রয়োগ করি না, তখন ইহার বর্ণমাত্র আমার পক্ষে প্রকৃতরূপে বর্ত্তমান; কিন্তু অন্যান্য গুণগুলি প্রকৃতরূপে বর্ত্তমান না থাকিলেও সম্ভবনীয়-রূপে বর্ত্তমান। টেব্‌লটাকে এক কালে বা অব্যবহিত পূর্ব্ব-পর সময়ে দর্শন, স্পর্শ, এবং ইহাতে হস্তচালনা ও বলপ্রয়োগ করিয়া আমরা যে বর্ণ, শীতলতা, মসৃণতা, কঠিনতা প্রভৃতি বিজ্ঞান অনুভব করিয়াছি, সেই সমস্ত বিজ্ঞানের স্মৃতি আমাদের

মনে পরস্পর সংযুক্ত হইয়া আছে; সংযুক্ত হইয়া থাকাতেই একটা বিজ্ঞান অনুভব করামাত্র অন্যান্য বিজ্ঞানগুলি অনুভব করিবার প্রত্যাশা মনে জাগ্রত হইতেছে। টেব্‌ল্‌টীকে যখন দেখি, যখন কেবল মাত্র ইহার বর্ণ অনুভব করি, তখন ইহার শীতলতা, মসৃণনতা, কঠিনতা প্রকৃতরূপে বর্ত্তমান না থাকিলেও সম্ভবনীয়রূপে বর্ত্তমান থাকে, অর্থাৎ উপযুক্ত অবস্থা সংঘটনে ইহারা প্রকৃতরূপে অনুভূত হইবার সম্ভাবনা থাকে। আমরা অভিজ্ঞতাদ্বারা জানিয়াছি যে একটী বিশেষ স্থানে হাত দিলেই আমরা ইহার শীতলতা অনুভব করিব, স্পর্শ করিয়া হস্তচালনা ও বলপ্রয়োগ করিলেই ইহার মসৃণতা ও কঠিনতা অনুভব করিব। গুণগুলি অনুভব করিবার এই প্রত্যাশা, গুণগুলির এই যে সম্ভবনীয় অস্তিত্ব, ইহাকেই আমরা কার্য্যকালে প্রকৃত অস্তিত্ব বলিয়া বর্ণনা করি। শীতলতা, মসৃণতা, কঠিনতা প্রভৃতি প্রকৃতরূপে অনুভব না করিয়াও যে আমরা বলি টেব্‌ল্‌টী শীতল, মসৃণ বা কঠিন, টেব্‌ল্‌টীর শীতলতা, মসৃণতা ও কঠিনতা আছে, ইহার অর্থ কেবল এই মাত্র যে উপযুক্ত অবস্থা সংঘটনে আমাদের শীতলতা, মসৃণতা ও কঠিনতা অনুভব করিবার সম্ভাবনা আছে। এইরূপে টেব্‌ল্‌টীকে না দেখিয়া, কেবল মাত্র স্পর্শ করিয়াই যে আমরা বলি যে টেব্‌ল্‌টী কটা রংযুক্ত, টেব্‌ল্‌টীর কটা রং আছে, ইহার অর্থ এই যে ইহা আমার সম্মুখে আসিলেই আমার কটা রংরূপী বিজ্ঞান অনুভব করিবার সম্ভাবনা আছে। যখন

টেব্‌ল্‌টী সম্পূর্ণরূপেই অজ্ঞাত অবস্থায় থাকে, যখন ইহাকে দেখি না, স্পর্শ করি না, কিছুই করি না, তখনও যে বলি টেব্‌ল্‌টী আছে, এবং ইহা কটা রংযুক্ত, ইহা শীতল, মসৃণ, কঠিন ইত্যাদি, ইহার অর্থ আর কিছুই নহে, ইহার অর্থ এই মাত্র যে উপযুক্ত অবস্থা সংঘটনে এই সকল বিজ্ঞান অনুভব করিবার সম্ভাবনা আছে। এই সম্ভাবনা নিত্যই বর্ত্তমান আছে। দীর্ঘকালব্যাপী অভিজ্ঞতাদ্বারা প্রাকৃতিক নিয়মের অটলতার প্রতি আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস জন্মিয়াছে। আমরা বিশ্বাস করি যে, যে সকল ঘটনা বিজ্ঞানোৎপত্তির বৈজ্ঞানিক কারণ, সেই সকল ঘটনা যখনই ঘটিবে তখনই বিজ্ঞান উৎপন্ন হইবে। বিজ্ঞান সমষ্টিরূপী টেব্‌ল্‌টী অজ্ঞাতাবস্থায় থাকা কালেও আমরা জানি যে যখনই উপযুক্ত অবস্থা সংঘটন হইবে তখনই ইহার উপকরণ-রূপী বিজ্ঞান সমুহ অনুভূত হইবে। সেই সকল বিজ্ঞান কেবল সম্ভবনীয়রূপে নহে, নিত্য-সম্ভবনীয়-রূপে বর্ত্তমান আছে; সুতরাং আমাদের অননুভূত অবস্থায় এই সকল বিজ্ঞানকে নিত্য-সম্ভবনীয়-বিজ্ঞান-বা বিজ্ঞানের নিত্য-সম্ভাবনা * বলা যাইতে পারে। এই রূপে জগতের সমস্ত বস্তুই অননুভূত অবস্থায় নিত্য-সম্ভবনীয়-বিজ্ঞান ভিন্ন আর কিছুই নহে; জগৎ আছে অর্থ নিত্য-সম্ভবনীয়-

---

* "Permanent possibilities of sensation"—J. S. Mill. See his *Examination of Hamilton*, Chap. XI: Psychological Theory of the Belief in an External World.

বিজ্ঞান-সমষ্টিরূপে আছে। আত্মা ছাড়া যখন জগৎ থাকিতে পারে না, আর জীবের আত্মা ছাড়া অন্য উচ্চতর আত্মার যখন প্রমাণাভাব, এবং জীবের আত্মা যখন অজ্ঞানতা, বিস্মৃতি ও নিদ্রার অধীন, তখন জগতের প্রকৃত অস্তিত্ব স্থায়ী নহে; ইহাকে কেবল নিত্য-সম্ভবনীয়-বিজ্ঞান-সমষ্টিরূপেই স্থায়ী বলা যাইতে পারে।

বিজ্ঞানবাদের জগৎতত্ত্ব—জড়তত্ত্ব—এই। অধুনিক মায়াবাদের জগৎতত্ত্বও এই রূপই; উভয়ের পক্ষেই জগৎ অস্থায়ী বিজ্ঞান-প্রবাহ মাত্র। কিন্তু আত্মতত্ত্ব বিষয়ে বিজ্ঞানবাদ ও মায়াবাদে বিশেষ প্রভেদ আছে। বিজ্ঞানবাদের মতে জগৎ যেমন বিজ্ঞান-প্রবাহ মাত্র, আত্মাও তেমনি বিজ্ঞান-প্রবাহ মাত্র। সময়ে সময়ে দেখা যায় যে বর্ণ স্পর্শাদি বিজ্ঞান সাক্ষাৎভাবে অনুভব না করিয়াও আত্মা থাকিতে পারে, কিন্তু বস্তুতঃ এরূপ সময়ে আত্মাতে এই সকল বিজ্ঞানের অস্পষ্ট প্রতিরূপ থাকে, এরূপ সময়েও আত্মা ভিন্ন ভিন্ন বিজ্ঞানের স্মৃতি-সমষ্টি মাত্র। স্মৃত বিজ্ঞানগুলি প্রকৃত বিজ্ঞানেরই অপেক্ষাকৃত অস্পষ্ট প্রতিরূপ মাত্র, এবং স্মরণকালে আত্মা এই সকল অস্পষ্ট বিজ্ঞানের সমষ্টি মাত্র। সম্পূর্ণ বিস্মৃতি বা সুষুপ্তি কালে আত্মার অস্তিত্বের কোন প্রমাণই নাই, কোন অর্থই নাই। জাগরণ কালে পূর্ব্ব-স্মৃতি পুনরুদিত হইয়া আত্মা পুনর্গঠিত হয়, ইহা বলিলে কিছু অন্যায় বলা হয় না। যাহা

হউক, কোন বিজ্ঞানবাদীকেই এই মত সঙ্গত ভাবে এবং অসঙ্কুচিত্ত ভাবে ব্যাখ্যা করিতে দেখি নাই। পাশ্চাত্য বিজ্ঞান-বাদের আদিগুরু স্বয়ং হিউম সাহেবই ইহার অসঙ্গতি কিয়ৎ-পরিমাণে স্বীকার করিয়াছেন;* অস্থায়ী বিজ্ঞান-প্রবাহ কিরূপে স্মৃতিরূপে স্থায়ী হয়, কালপ্রবাহে প্রবাহিত হইয়াও কিরূপে আবার ফিরিয়া আসে, তাহা তিনিও বুঝাইতে পারেন নাই; আংশিক ভাবে হিউমের শিষ্য জন্ ষ্টুয়ার্ট্ মিল্ এই মত সমর্থন করিতে অনেক প্রয়াস পাইয়া পরে স্বীকার করিয়াছেন যে এই মত সংস্থাপনের একটা অনতিক্রমণীয় বিঘ্ন আছে। তাঁহার পুস্তকের † তৃতীয় সংস্করণে তিনি আত্মা সম্বন্ধে বিজ্ঞানবাদ পরিত্যাগ করিয়া মায়াবাদে বিশ্বাস প্রকাশ করিয়াছেন। উক্ত অনতিক্রমণীয় বিঘ্নটা এই;—বিজ্ঞান অস্থায়ী বিষয়, যাহা যায় তাহা যায়ই, তাহা আর আসিতে পারে না; যাহা পরে আসে, তাহা নূতন বিজ্ঞান, তাহা স্পষ্টই হউক আর অস্পষ্টই হউক। এখন, আমাদের স্মৃতি বলে যে, যে আমি পূর্ব্বের বিজ্ঞান অনুভব করিয়াছিলাম, সেই আমিই পরের বিজ্ঞান অনুভব করিতেছি, পূর্ব্বের বিজ্ঞান বিগত হইয়াছে বটে, কিন্তু

---

* See Hume's *Treatise on Human Nature*, Part IV, Sec. VI, and its Appendix. See also Green's *Introduction to Hume's Works.*

† *Examination of Hamilton*, Chap. XII and the following Appendix.

আমি তার সঙ্গে বিগত হই নাই। আত্মা যদি একটা বিজ্ঞান-প্রবাহ মাত্র হইত, তবে স্মৃতির এই কথার কোন অর্থ থাকিত না; অস্থায়ী বিজ্ঞান-প্রবাহ কখনো আপনাকে স্থায়ী প্রবাহ-শূন্য 'আমি' বলিয়া জানিতে পারে না। সুতরাং আত্মা একটা স্থায়ী বস্তু। এই কথাটা যে এত দেরিতে স্বীকার করা হইল ইহাই আশ্চর্য্যের বিষয়; মিল যখন ভাব-যোগ, প্রত্যাশা ইত্যাদি লইয়া স্বর্গ, মর্ত্ত্য, পাতাল গড়িতেছিলেন তখন এই কথাটা বুঝিতে পারেন নাই, অথচ আত্মার স্থায়িত্ব স্বীকার না করিলে ভাব-যোগ, প্রত্যাশা ইত্যাদির কোন অর্থই থাকে না;* আত্মার স্থায়িত্ব স্বীকার না করিলে কোন কথাই বলা যায় না।† যাহা হউক, বিজ্ঞানবাদ ও মায়াবাদের পার্থক্য এই স্থলে; মায়াবাদ আত্মার স্থায়িত্ব স্বীকার করে। কিন্তু মায়াবাদ আত্মার স্থায়িত্ব স্বীকার করিয়াও জ্ঞানের স্থায়িত্ব স্বীকার করে না। আত্মা যে সর্ব্বদাই জ্ঞানযুক্ত থাকে, উপাধিযুক্ত বা সগুণ থাকে, মায়াবাদ তাহা স্বীকার করে না। কোন কোন মায়াবাদ স্বীকার করে যে আত্মা জাগরণ, স্বপ্ন, বা সুষুপ্তি কোন কালেই আত্মজ্ঞান-চ্যুত হয় না, কিন্তু আত্মজ্ঞানের সহিত যে বিষয়-জ্ঞান অচ্ছেদ্য, আত্মজ্ঞানের সঙ্গে সঙ্গে বিষয়জ্ঞানও যে আত্মাতে

---

* See a short but nice criticism of Mill's "Psychological Theory" in Masson's *Recent British Philosophy.*

† "A consistent Sensationalism must be speechless".—Green.

সর্ব্বদা বর্ত্তমান থাকে, মায়াবাদ তাহা স্বীকার করে না। আমরা একটু বিশেষভাবে এই মায়াবাদ ব্যাখ্যা করিতেছি।

মায়াবাদের মূল কথাটা এই;—আত্মাতে যতক্ষণ ইন্দ্রিয়-ক্রিয়া হয় ততক্ষণ আত্মা উপাধিযুক্ত, কিন্তু এই সোপাধিকত্ব, এই উপাধিযুক্ত অবস্থা, যে আত্মার মূল প্রকৃতি নহে তাহা অতি সহজেই বুঝিতে পারা যায়। ইন্দ্রিয়-বিষয় সমূহ অস্থায়ী; যতক্ষণ চক্ষু মেলিয়া থাকি ততক্ষণই দৃশ্য জগতের অস্তিত্ব। চক্ষু মুদ্রিত করিলেই উহা বিলীন হইয়া যায়। তেমনি যতক্ষণ শুনি ততক্ষণই শব্দের অস্তিত্ব, যতক্ষণ স্পর্শ করি ততক্ষণই স্পৃশ্য বস্তুর অস্তিত্ব, ইত্যাদি। ইন্দ্রিয়-বিষয়-সমূহ অস্থায়ী—কাল-প্রবাহে নিয়ত প্রবাহিত। ইন্দ্রিয়-ক্রিয়া বন্ধ হইলে ইন্দ্রিয়গোচর জগতের অস্তিত্ব কোথায় থাকে? তখন কেবল নিত্য বস্তু নিরুপাধিক আত্মা বর্ত্তমান থাকে। আপত্তিকারী বলিতে পারেন যে ইন্দ্রিয়ক্রিয়া বন্ধ হইলেও জগৎ আত্মার স্মৃতির বিষয়রূপে,—অতীন্দ্রিয় বিশুদ্ধ জ্ঞানের বিষয়রূপে—বর্ত্তমান থাকে। কৈ? তারই বা প্রমাণ কোথায়? স্মৃতিও ত আত্মার একটি অস্থায়ী অবস্থামাত্র; যাহা কিছু জানি সবই কি সকল সময়ে স্মরণ থাকে? ইন্দ্রিয়-ঘটিত জ্ঞানের ন্যায় স্মৃতি-ঘটিত জ্ঞানও প্রবাহশীল। তার পর নিদ্রার অবস্থার ত কথাই নাই। স্বপ্নাবস্থায় বিষয়জ্ঞান বরং কিছু থাকে, সুষুপ্তির অবস্থায় বিষয়জ্ঞান একবারেই

বিলুপ্ত হয়। তখন কেবল আত্মার আত্মজ্ঞান মাত্র থাকে, কোন বিষয়জ্ঞান থাকে না। যদি বল বিষয়জ্ঞান না থাকিলে আত্মজ্ঞান থাকিতে পারে না, তবে মানিলাম যেন তখন এক আধ বিন্দু বিষয়জ্ঞানও থাকে. কিন্তু তাহাতে তোমার এই বিচিত্র জগতের স্থায়িত্ব সপ্রমাণ হইল কৈ? যদি বল জীবাত্মা জগৎ বিস্মৃত হয় বটে, কিন্তু পরমাত্মা বিস্মৃত হন না, তাঁহার জ্ঞান সর্ব্বদাই বিচিত্রতাপূর্ণ,—তবে ইহার উত্তর এই যে এই বিচিত্র জ্ঞানশালী উপাধিযুক্ত পরমাত্মার প্রমাণ কোথায়? আত্মজ্ঞানই ব্রহ্মজ্ঞানের ভিত্তি। আত্মজ্ঞান দ্বারা একটি নির্বিষয় নিরুপাধিক নিত্য আত্মার প্রমাণ পাইতেছি; এই নিরুপাধিক আত্মাই বিশ্বের বীজ। এই আত্মাই স্বীয় মায়াশক্তি-প্রভাবে উপাধিযুক্ত হইয়া বিশ্বরূপে প্রতিভাত হন; কিন্তু এই উপাধিযুক্ত অবস্থা ইঁহার স্থায়ী ভাব নহে, মূল ভাব নহে। মূলতঃ ইনি নিরুপাধিক, নির্গুণ, নির্বিষয় জ্ঞানমাত্র। তিনি জ্ঞানী নহেন, তিনি জ্ঞানম্।

এই মায়াবাদের যুক্তি আপাততঃ অকাট্য বলিয়া বোধ হয়। কিন্তু একটু গভীর ভাবে চিন্তা করিলে ইহার আপাত-যৌক্তিকতার ভিতরে গভীর অযৌক্তিকতা দেখিতে পাওয়া যায়। আমরা এই অযৌক্তিকতা ক্রমশঃ প্রদর্শন করিব। আত্মজ্ঞানই যে ব্রহ্মজ্ঞানের ভিত্তি তার আর সন্দেহ কি? কিন্তু মায়াবাদী আত্মজ্ঞানের সাক্ষ্য বুঝিতে পারেন নাই।

আত্মজ্ঞান কোন নির্বিষয় নিরুপাধিক আত্মার সাক্ষ্য দেয় না, এক বিচিত্র জ্ঞানশালী বিশ্বাত্মারই পরিচয় দেয়। আমরা যথাসাধ্য ইহা প্রদর্শন করিব।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ—জ্ঞানের দ্বৈতাদ্বৈত ভাব

পাঠক প্রথমাধ্যায়ের প্রথম পরিচ্ছেদে ব্যাখ্যাত দ্বিতীয় সত্যটি স্মরণ করুন্। আমরা সেখানে দেখিয়াছি যে আত্মা যেমন আপনাকে না জানিয়া কোন বিষয়কে জানিতে পারে না, তেমনি আবার কোন-না-কোন বিষয়কে না জানিয়া আপনাকে জানিতে পারে না। আত্মজ্ঞান যেমন বিষয়জ্ঞানের নিত্য আশ্রয়, বিষয়জ্ঞান তেমনি আত্মজ্ঞানের নিত্য সাথী। আত্মা আপনাকে কেবল জ্ঞাতারূপেই জানিতে পারে, এবং আপনাকে জ্ঞাতারূপে জানিতে গেলেই আপনার সঙ্গে প্রভেদ করা যায় এমন কিছু বিষয় জানা আবশ্যক। আমরা দেখিয়াছি যে আত্মা যাহা জানে,—জ্ঞানের বিষয় যাহা,—তাহা জ্ঞানেরই ভিতর, আত্মা হইতে স্বতন্ত্ররূপে তাহা থাকিতে পারে না; আত্মার সঙ্গে তাহার ভেদমাত্র আছে, পার্থক্য নাই। কিন্তু এই ভেদটুকু জ্ঞানের পক্ষে দরকার, এই ভেদটুকু না থাকিলে জ্ঞান হইতে পারে না; নিজের সঙ্গে প্রভেদ করা যায় এমন কিছু না জানিলে, আত্মা আপনাকে জানিতে পারে না। জ্ঞান দুটি ভিন্ন অথচ অচ্ছেদ্য উপ-

করণের সম্মিলন; একটি উপকরণ আত্মজ্ঞান, অপরটি বিষয়জ্ঞান; এই দুটি উপকরণের একটির অভাব হইলেই আর জ্ঞান সম্ভব নহে। ফলতঃ এই দুটি একটি বস্তুরই দুটি দিক্ মাত্র; একই অখণ্ড বস্তুর ভিতরে আশ্চর্য্যরূপে এই দ্বৈত ও অদ্বৈতভাব রহিয়াছে।

এখন কথা এই যে বিষয়জ্ঞান-শূন্য আত্মজ্ঞান যখন আমরা জানিও না ভাবিতেও পারি না, পরন্তু ইহা যখন একটা অসঙ্গত স্ববিরোধী ব্যাপার, তখন ইহার অস্তিত্বও বিশ্বাসযোগ্য নহে। যাহা জানা যায় না, ভাবা যায় না, যাহা অসঙ্গত স্ববিরোধী, তাহা যে কেহ প্রকৃতরূপে বিশ্বাস করে তাহাও হইতে পারে না; সুতরাং আমরা লৌকিক বা দার্শনিক বিশ্বাসের বিষয়ীভূত যে সকল অসার কথার-কথা সম্বন্ধে ইতিপূর্ব্বে আলোচনা করিয়াছি, ইহাও সেরূপ একটা অসার কথার-কথা মাত্র। মায়াবাদের ভ্রম আমরা স্পষ্টই দেখিতেছি। প্রকৃতিবাদের 'অজানা জানা বস্তু,' 'অননুভূয় অনুভব,' 'অজ্ঞেয় কারণ' অর্থাৎ 'অজ্ঞেয় জ্ঞেয় বস্তু' যে শ্রেণীর বস্তু, মায়াবাদের 'নির্বিষয় জ্ঞান,' ও 'বিষয়জ্ঞান-শূন্য বিষয়ী'ও সেই শ্রেণীরই বস্তু। কেবল বিষয় বা কেবল বিষয়ী, কেবল জ্ঞেয় বা কেবল জ্ঞাতা, প্রকৃত বস্তু নহে, দ্বৈতাদ্বৈতভাব-সম্পন্ন, ভেদাভেদ-স্বভাব বিষয়-বিষয়ী-রূপী জ্ঞানবস্তুই একমাত্র প্রকৃত বস্তু।*

---

* See Ferrier's *Institutes of Metaphysic*, Sec. III : Ontology, and Caird's *Hegel*, Chaps. VII and VIII.

বিষয়ীকে যে ভাবেই দেখা যাক্, ইহাকে বিষয়ের সহিত ভিন্ন অথচ সম্বদ্ধ বলিয়া দেখিতে পাওয়া যায়। বিষয়ী এক, বিষয় বহু; কিন্তু বহুত্বের সহিত সম্বন্ধ ছাড়িয়া দিলে একত্বের কোন অর্থই থাকে না; একের অর্থই বহুর-মধ্যে-এক। আত্মা স্থায়ী, অপরিবর্ত্তনীয়; কিন্তু অস্থায়িত্ব ও পরিবর্ত্তনের সহিত সম্বন্ধ ছাড়িয়া দিলে স্থায়িত্ব ও অপরিবর্ত্তনীয়তার কোন অর্থই থাকে না। স্থায়ীর অর্থই অস্থায়ী-বস্তু-সমূহের-মধ্যে-স্থায়ী। অপরিবর্ত্তনীয়ের অর্থই পরিবর্ত্তন-প্রবাহের-মধ্যে-অপরিবর্ত্তনীয়। আত্মা দেশের অতীত, আত্মা দেশ-ব্যাপ্ত বস্তু-সমূহের আধার, অথচ স্বয়ং দেশে ব্যাপ্ত নহে; কিন্তু আপনাকে দেশে ব্যাপ্ত বস্তুসমূহ হইতে ভিন্ন অথচ তাহাদের সহিত সম্বদ্ধ বলিয়া না জানিলে আত্মা আপনাকে দেশের অতীত বলিয়া জানিতে পারে না। দেশে অবস্থিত বস্তুসমূহের সহিত সম্বন্ধ ছাড়িয়া দিলে 'দেশের অতীত' কথার কোন অর্থই থাকে না। সুতরাং নির্বিষয় জ্ঞান একেবারেই অর্থহীন, অসম্ভব।

যে মায়াবাদ নির্বিষয় জ্ঞানে বিশ্বাস করে, সেই মায়াবাদের ভ্রম আমরা বুঝিতে পারিলাম। এখন যে মায়াবাদ সম্পূর্ণরূপে জ্ঞানশূন্য আত্মার অস্তিত্বে বিশ্বাস করে, বিশ্বাস করে যে আত্মা সময়ে সময়ে সম্পূর্ণরূপেই অজ্ঞান হইয়া যাইতে পারে এবং যায়, সম্পূর্ণরূপে আত্মজ্ঞান ও বিষয়জ্ঞান উভয় জ্ঞান-বিরহিত হইতে পারে এবং হয়, এই মায়াবাদের ভ্রম বুঝিতে আর

অধিক বিলম্ব হইবে না। এই মায়াবাদের বিপক্ষে প্রথম বক্তব্য এই যে আত্মা জ্ঞানরূপেই প্রকাশিত হয়, জ্ঞানরূপী বস্তুকেই আমরা আত্মা বলিয়া জানি ও আত্মা বলি, আত্মা বলিতেই আমরা জ্ঞানময় বস্তু বুঝি, অজ্ঞান আত্মা অর্থাৎ অজ্ঞান জ্ঞানবস্তু একটা স্ববিরোধী অসঙ্গত কথার-কথা মাত্র। আমরা ইতিপূর্ব্বে যে সকল স্ববিরোধী অসম্ভব বিষয়ের আলোচনা করিয়াছি, এই বিষয়টা কোন অংশেই উহাদের অপেক্ষা কম অসম্ভব নহে। জ্ঞানরূপেই যাহার প্রকাশ, জ্ঞানরূপেই যাহার পরিচয়, জ্ঞানরূপী বলিয়াই যাহাকে আত্মা বলি, জ্ঞানেই যাহার আত্মত্ব, জ্ঞানেই যাহার জীবন, সে জ্ঞান-বিরহিত হইলে তাহার আর রহিল কি? তখন সে আছে, এই কথা বল কেন? লক্ষণশূন্য বস্তুর বস্তুত্ব কোথায়? বস্তুর বস্তুত্ব যাহাতে, তাহা হারাইলে বস্তুর আর থাকে কি? জ্ঞানরূপী আত্মা জ্ঞান-বিরহিত হইলে তাহার আর থাকে কি? কিছুই থাকে না। জ্ঞানই যাহার লক্ষণ, জ্ঞানই যাহার জীবন, তাহার পক্ষে জ্ঞানশূন্য হওয়া আর মরিয়া যাওয়া একই কথা। দ্বিতীয় কথা এই যে যদি এক মুহূর্ত্তের জন্য স্বীকারই করা যায় যে জ্ঞানশূন্য হইলেও আত্মার কিছু থাকে,—একটা নির্গুণ সত্তামাত্র থাকে, ইহাতেও মায়াবাদীর বিশেষ লাভ হয় না। জিজ্ঞাসা করি এই নির্গুণ সত্তাকে জড় না বলিয়া আত্মা বল কেন? আত্মা চৈতন্যহীন হইলে জড়ের সঙ্গে ইহার কি প্রভেদ থাকে? মায়া-

বাদী মনে করেন যে এই নির্গুণ সত্তাই আবার জ্ঞানবান্ হইতে পারে এবং হইয়া থাকে, এই জন্য ইহাকে তিনি জড় না বলিয়া আত্মা বলেন। কিন্তু তাহা অসম্ভব ; যাহা একবার অজ্ঞান হইল, নিজের সমস্ত জ্ঞান হারাইল, তাহা আর কখনো হারান জ্ঞান পুনর্ব্বার লাভ করিতে পারে না। মায়াবাদী হয় ত বলিবেন, যাহা প্রতিদিনের অভিজ্ঞতায় ঘটিতেছে তুমি তাহাই অসম্ভব বলিতেছ। আমরা প্রতিদিন দেখিতেছি আমরা নিদ্রাকালে সমুদায় জ্ঞান—বিষয়জ্ঞান ও আত্মজ্ঞান সমস্ত—হারাইয়া আবার জাগরণকালে সমুদায় ফিরাইয়া পাইতেছি। আত্মা একবার অজ্ঞান হইয়াও যে পুনরায় জ্ঞান লাভ করিতে পারে, একবার নিরুপাধিক হইয়াও যে পুনরায় সোপাধিক হইতে পারে, উপরি-উক্ত প্রমাণের ন্যায় এই কথার উজ্জ্বলতর প্রমাণ আর কি হইতে পারে ? মায়াবাদীর যুক্তি এই। আমরা এই যুক্তির ভ্রম দেখাইতেছি ; আমরা দেখাইতেছি, মায়াবাদী যে অভিজ্ঞতার দোহাই দেন সে অভিজ্ঞতার অর্থ তিনি কত কম বুঝেন। আমি আমার সম্মুখস্থ দোয়াত, কলম, কাগজ, টেব্‌ল প্রভৃতির জ্ঞান এবং সেই সকল জ্ঞানের নিত্যসঙ্গী আত্মজ্ঞানকে হারাইয়া নিদ্রিত হইলাম। জ্ঞানগুলি একবারেই গেল, কেন না জ্ঞাতা অজ্ঞান হইলে জ্ঞান আর কোথায় থাকিবে ? আমার জীবনের সারভূত যে আত্মবস্তু, তাহা একটা শূন্য ভাণ্ডস্বরূপ হইয়া পড়িয়া রহিল। যথা সময়ে জাগ্রত হইলাম ; জাগ্রত

হইয়া আবার এই দোয়াত, কলম, কাগজ ও টেব্‌লের জ্ঞান এবং আমার আত্মজ্ঞান লাভ করিলাম; আমার স্মরণ হইল যে এই দোয়াত প্রভৃতিকে আমি নিদ্রার পূর্ব্বে জানিয়াছিলাম, এবং যে আমি ইহাদিগকে পূর্ব্বে জানিয়াছিলাম সেই আমিই ইহাদিগকে এখন জানিতেছি। এখন জিজ্ঞাস্য এই যে, যে জ্ঞান একবারেই বিনষ্ট হইয়াছিল, ভাণ্ড শূন্য করিয়া শুকাইয়া গিয়াছিল, সে জ্ঞান আবার আসিল কিরূপে? মায়াবাদীর কাছে জ্ঞান স্থায়ী বস্তু নহে, জ্ঞান অস্থায়ী বিজ্ঞান-প্রবাহ মাত্র। এখন দেখুন, পূর্ব্বকার জ্ঞান অর্থাৎ পূর্ব্বকার বিজ্ঞান-প্রবাহ নিদ্রাকালে বিলীন হইয়া গিয়াছে, এখন তাহা আর কিছু ফিরিয়া আসিতে পারে না; এখন যাহা আসিবে তাহা নূতন বিজ্ঞান। এখন যে কতকগুলি নূতন বিজ্ঞান হইতেছে তাহাতে সন্দেহ নাই, কিন্তু নূতন বিজ্ঞানের সঙ্গে কতকগুলি পুরাতন বিজ্ঞান আসিয়া উপস্থিত। নূতন বিজ্ঞানের সহিত পুরাতন বিজ্ঞানের সাদৃশ্যজ্ঞান, যাহাতে পূর্ব্ব-দৃষ্ট দোয়াত কলম প্রভৃতিকে এখন চিনিতে পারিতেছি, এবং তৎসঙ্গে সঙ্গে পূর্ব্বকার জ্ঞাতাকে এখনকার জ্ঞাতা বলিয়া জানিতেছি, এই সকল জ্ঞান নিশ্চয়ই পুরাতন জ্ঞান। এই পুরাতন জ্ঞান কেমন করিয়া আসিল? যে আত্মা আত্মজ্ঞান ও সমুদায় বিষয়জ্ঞান হারাইয়া শূন্য ভাণ্ড-স্বরূপ হইয়াছিল, তাহার পক্ষে এখন সমুদায় জ্ঞানই নূতন জ্ঞান বলিয়া বোধ হইবার কথা। যার পক্ষে পুরাতন বিনষ্ট হইয়া-

ছিল, তার কাছে আর পুরাতন আসিতে পারে না। পুরাতন জ্ঞান আবার যে আসিয়াছে ইহাতে অকাট্যরূপে সপ্রমাণ হইতেছে যে পুরাতন জ্ঞান বিনষ্ট হয় নাই; বিষয়জ্ঞান বা আত্মজ্ঞান কিছুই বিনষ্ট হয় নাই, আত্মা শূন্যভাণ্ডের ন্যায় হয় নাই; আত্মজ্ঞান ও আত্মজ্ঞানের নিত্য সাথী বিষয়জ্ঞান কিছুই বিনষ্ট হয় নাই। এই অখণ্ড জ্ঞানবস্তু সুষুপ্তি কালে, ব্যক্তিগত জীবনে প্রকাশিত হয় না বটে, কিন্তু সেই সময়েও ইহা অক্ষুণ্ণরূপে বর্ত্তমান থাকে; বর্ত্তমান না থাকিলে ইহা পুনরায় ব্যক্তিগত জীবনে প্রকাশিত হইতে পারে না। আশা করি এখন পাঠক মায়াবাদের ভ্রম বুঝিতে পারিলেন। পাঠক দেখিয়াছেন যে মায়াবাদী ও বিজ্ঞানবাদী "ভাবযোগ" কথাটার বড়ই বাড়াবাড়ি করেন, কিন্তু বস্তুতঃ ইহারা "ভাবযোগ" কথাটা ভাল বুঝিতে পারেন না। ইঁহারা মনে করেন যে একটা বিস্মৃতিশীল নিদ্রাশীল মনেও ভাবযোগ সম্ভব এবং এই ভাবযোগই স্মৃতি ও অভিজ্ঞতার কারণ। কিন্তু ইহা নিতান্তই ভুল। যে ক্ষণে ক্ষণে ভাবসমূহ ভুলিয়া যায়, একবারে হারাইয়া ফেলে, আত্মজ্ঞানকে পর্য্যন্ত হারাইয়া ফেলে, তাহার পক্ষে আবার ভাবযোগ কি? যে ক্ষণে ক্ষণে সম্পূর্ণরূপে ভাবশূন্য হইয়া যায়, তাহাতে ভাবগুলি কিরূপে সংযুক্ত থাকিবে? একটি চির-জাগ্রত চির-স্মৃতিশীল আত্মাতে জ্ঞানের বিষয়গুলি চির-সংযুক্ত না থাকিলে, এবং এই চিরজাগ্রত আত্মা আমাদের

ব্যক্তিগত জীবনে জ্ঞানরূপে প্রাণরূপে প্রকাশিত না হইলে স্মৃতি, অভিজ্ঞতা, এই সমুদায় কিছুই সম্ভব নহে। *

আমরা ইতিপূর্ব্বে বলিয়াছি যে আমাদের জীবনের সার-ভূত জ্ঞানবস্তু আমাদের ব্যক্তিগত ইচ্ছা-সাপেক্ষ নহে। ইহাও বলিয়াছি যে আমরা যাহাকে আমাদের ব্যক্তিগত জ্ঞান বলি, তাহা নিতান্ত ব্যক্তিগত নহে। এই কথা যে সত্য, বোধ হয় পাঠক এক্ষণে তার কিছু আভাস পাইতেছেন। যাহা হউক, আভাসই যথেষ্ট নহে। এই পরিচ্ছেদে আমরা যাহা সংক্ষেপে বলিলাম, পরে তাহা আরো বিস্তৃতরূপে বুঝাইব। জ্ঞান যে নিত্য, জ্ঞানের যে আরম্ভ নাই, শেষ নাই, এক কণা জ্ঞানও যে বিনষ্ট হইতে পারে না, আমরা তাহা পরিষ্কাররূপে দেখাইতে চেষ্টা করিব।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ—জ্ঞান ও ইচ্ছা

আমাদের জীবনের মূল যে একটি চির-জাগ্রত চির-স্মৃতিশীল নিত্য জ্ঞানবস্তু, এই সত্যটি বুঝিতে হইলে পূর্ব্বে ইটি পরিষ্কাররূপে বুঝা আবশ্যক যে আমাদের জ্ঞানক্রিয়া—আমাদের জীবনে বিজ্ঞান, স্মৃতি, বুদ্ধির আবির্ভাব ও

* See Caird's *Philosophy of Kant* (old edition) P. 285, P. 452 and sundry other places. Also শাঙ্কর-ব্রহ্মসূত্র-ভাষ্যম্ ১।২।৩১।

তিরোভাব,—আমাদের জাগরণ ও নিদ্রা—এই সমুদায় আমাদের ব্যক্তিগত ইচ্ছা-প্রসূত নহে। আমাদের ব্যক্তিগত ইচ্ছা এমন একটি কার্য্য যাহা বিজ্ঞান, স্মৃতি ও বুদ্ধির উপরে নির্ভর করে, অর্থাৎ এক কথায়, জ্ঞানের উপর নির্ভর করে। অগ্রে জ্ঞান, তার পর ইচ্ছা; না জানিলে, না বুঝিলে, ইচ্ছা করা যায় না। সুতরাং ইহা স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে আমাদের জীবনে যে জ্ঞানের আবির্ভাব হয়,—বিজ্ঞান, স্মৃতি, বুদ্ধির আবির্ভাব হয়, তাহা আমাদের ইচ্ছা-সাপেক্ষ নহে। আশ্চর্য্য এই যে এই সত্যটি সহজ হইলেও আমরা ইহার সম্বন্ধে এতদুর অন্ধ। আমরা এমন ভাবে 'আমার জ্ঞান, আমার বুদ্ধি, আমার জীবন' বলিয়া অহংকৃত হই যেন এই ব্যাপারগুলি আমাদের ব্যক্তিগত ইচ্ছা-প্রসূত, যেন আমাদের জ্ঞান, বুদ্ধি ও জীবনের স্রষ্টা আমাদের নিজ ইচ্ছা। এই অন্ধ অহংভাব বশতঃই আমরা বিশুদ্ধ ব্রহ্মজ্ঞান ও উজ্জ্বল ব্রহ্মোপলব্ধি হইতে বঞ্চিত থাকি। যাহা হউক, আমরা উপরি-উক্ত সত্যটির বিষয় কিঞ্চিৎ আলোচনা করিব।

এই যে দেখিতেছি, শুনিতেছি, স্পর্শ করিতেছি, এই যে অসংখ্য রূপ, রস, গন্ধ, শব্দ, স্পর্শ, অসংখ্য সুখ, দুঃখ, প্রীতি, শ্রদ্ধাদি ভাব আমাদের জ্ঞানগোচর হইতেছে, জ্ঞানগোচর হইয়া আমাদের জীবন সম্ভব করিতেছে,—এই সমুদায় কি আমাদের ইচ্ছা-সাপেক্ষ? আমরা কি নিজ নিজ ইচ্ছাতে

এই সকল উৎপাদন করিতেছি? স্পষ্টই বুঝিতেছি—না। এই সমুদায়ের উদয় সম্বন্ধে আমাদের ইচ্ছা সম্পূর্ণরূপেই নিষ্ক্রিয়। অগ্রে এই সমুদায় মানসিক ঘটনা না ঘটিলে আমাদের ইচ্ছা সম্ভবই হইত না। এই যে দিন দিন, মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে, এই সকল বিচিত্র বিজ্ঞান আমাদের মনে আবির্ভূত হইতেছে,—আমাদের মনোরূপ গৃহে দিন দিন মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে অসংখ্য বিচিত্র অভিনয় হইতেছে, অথচ এই সমুদায়ের উপর আমাদের ইচ্ছার কোন কর্ত্তৃত্ব নাই,—এই ব্যাপারে লোক কোন গভীর রহস্য দেখে না, মনের ভিতরে থাকিয়া কে মনকে লইয়া এত ক্রীড়া করিতেছে তাহা ভাবিয়া দেখে না; অথচ ইহার মতন গভীর ভাবপূর্ণ ব্যাপার আর কি আছে? যাহা হউক, এই সকল ক্রীড়ার উপর আমাদের ইচ্ছার যে কোন হাত নাই তাহা স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে। এই সমুদায় আবির্ভূত হইলে পর এই সমুদায়কে অবলম্বন করিয়া ইচ্ছা-ক্রিয়া চলিতে পারে, কিন্তু তার জন্য আবার স্মৃতির প্রয়োজন। এই সমুদায় বিজ্ঞান তিরোহিত হইলে পর পুনরায় এই সমুদায়ের স্মৃতি আমাদের মনে না আসিলে ইচ্ছা সম্ভব হয় না। কিন্তু স্মৃতি সম্পূর্ণরূপেই আমাদের ইচ্ছা-নিরপেক্ষ; স্মৃতি-উদ্রেকের কারণ আমাদের ইচ্ছা নহে। বিস্মৃতি বা ভুলিয়া যাওয়ার অন্য কথা "মনে না থাকা"। যাহা আমার মনে নাই, জ্ঞানে নাই, তাহার উপর আমার ইচ্ছার কর্ত্তৃত্ব

চলে না ; কেবল জানা বিষয়ের উপরই কর্তৃত্ব চলে। সুতরাং একটু চিন্তা করিলে সহজেই বুঝা যাইবে যে বিস্মৃত বিষয় যে পুনরায় আমাদের স্মরণে আসে, তাহা আমাদের নিজ ইচ্ছায় নহে। যদি কাহারো ইচ্ছায় আসে, তবে এমন এক জনের ইচ্ছায়ই আসে যিনি মনকে হাতে করিয়া আছেন, যিনি কোন কথা ভুলেন না এবং যিনি সর্ব্বদা মনের সঙ্গে স্মৃতি-বিস্মৃতি-রূপ খেলা খেলিতেছেন। প্রত্যক্ষ জ্ঞানের ন্যায় স্মৃতিকেও লোকে একটা সামান্য ব্যাপার মনে করে ; ইহাতে যে কোনও গূঢ় কথা আছে তাহা ভাবে না। কিন্তু বস্তুতঃ এই ব্যাপারটি গুহ্য তত্ত্বে পরিপূর্ণ। জীবনের নিতান্ত আবশ্যক কথাও ক্ষণে ক্ষণে ভুলিয়া যাইতেছি—যাহা পুনরায় মনে না আসিলে জীবন চলিত না ; কিন্তু কি গূঢ় উপায়ে ক্ষণে ক্ষণেই আবার এই সকল কথা স্মরণ হইতেছে ! কার্য্যে নিবিষ্টচিত্ত হইয়া নিজের নাম, ধাম, বয়স, এই স্থান ও কালের নাম, গৃহ, গৃহসামগ্রী ও পরিবার, বন্ধু বান্ধব, জীবনের অর্জ্জিত সমুদায় অভিজ্ঞতা, সমুদয় বিষয়, পূর্ব্ব মুহূর্ত্তের ঘটনা পর্য্যন্ত ভুলিয়া যাইতেছি। যদি যথা সময়ে এই সমুদায় স্মরণ না হইত, তবে কি কাণ্ডই হইত পাঠক একবার ভাবিয়া দেখুন। সম্পূর্ণরূপে স্মৃতিবিহীন হইলে নিষ্ক্রিয় জড়প্রায় হইতে হয়, কেন না একটু কাজ করিতে হইলেই স্মৃতি আবশ্যক। এই যে লিখিতেছি, এই লেখা সম্ভব হইত না যদি লিখনকার্য্যে ব্যবহৃত বস্তুসমূহের স্মৃতি—

যাহা ক্ষণকাল পূর্ব্বে ছিল না—তাহা যথাসময়ে মনে প্রকাশিত না হইত, যদি পূর্ব্বার্জ্জিত জ্ঞান মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে আত্মাতে উদিত না হইত। যে স্মৃতি জীবনের পক্ষে এত প্রয়োজনীয়, যাহা না হইলে জীবন সম্ভব নয়, তাহা আমাদের ইচ্ছার হাতে নহে। কাহার হাতে তাহা পরে বিবেচ্য।

তার পর, প্রত্যক্ষ জ্ঞান এবং স্মৃতি অপেক্ষা নিদ্রা হইতে জাগরণ ব্যাপারটা বরং আরো রহস্যপূর্ণ, অথচ অভ্যাস-দোষে ইহা লোকের নিকট রহস্যপূর্ণ বলিয়া বোধ হয় না। সুনিদ্রার সময়ে বিজ্ঞান, স্মৃতি, এমন কি আত্মজ্ঞান পর্য্যন্ত, তিরোহিত হয়। সুষুপ্তির ন্যায় মানবের দর্পহারা এমন আর কিছু নাই। মানব কতদূর পরাধীন তাহা সুষুপ্তি স্পষ্টরূপে দেখাইয়া দেয়। জ্ঞানী মূর্খ, ধনী নির্ধন, সবল দুর্ব্বল, সকলে এই সময়ে তুল্য-রূপে নিরাশ্রয়, পরাধীন; এই সময়ে লোকের পরাধীনতা ও নিরাশ্রয়তার কিছুই তারতম্য নাই। যাহা হউক, এই পরাধীন অচেতন অবস্থা হইতে সচেতন অবস্থা লাভ করা, জাগ্রত হওয়া, সম্পূর্ণরূপেই আমাদের ইচ্ছা-নিরপেক্ষ। নিদ্রা আমাদের ইচ্ছা-নিরপেক্ষ ভাবে আসে, ইচ্ছা-নিরপেক্ষ ভাবেই ভঙ্গ হয়। বরং স্বেচ্ছাক্রমে শরীর স্থির করিয়া আমরা নিদ্রাকর্ষণের সাহায্য করিতে পারি,—সাহায্যমাত্র, আর কিছুই নহে,—কিন্তু জাগরণ সম্পূর্ণরূপেই ইচ্ছার অনায়ত্ত। নিদ্রাকালে শরীর মন উভয়-সম্বন্ধীয় জ্ঞান তিরোহিত হয়, আত্মজ্ঞান পর্য্যন্ত বিলুপ্ত

হয়, কাহার উপর কে কর্ত্তৃত্ব চালাইবে? কি আশ্চর্য্য উপায়ে তিরোহিত জ্ঞান আবার আবির্ভূত হয়! না হইলেই ত হইত। জীবন-গৃহের কপাট যে বন্ধ হয়, তাহা না খুলিলেই ত হইত; খোলা না খোলা ত আমাদের হাত নয়। কিন্তু কপাট আবার খুলে; তিরোহিত আত্মজ্ঞান ও বিষয়জ্ঞান পুনঃপ্রকাশিত হইয়া আবার জীবন-লীলা রচনা করে। এই কার্য্য যাহার, সে যে নিদ্রাশীল হইতে পারে না, সে যে চির-জাগ্রত, তাহা আমরা ইতিমধ্যেই কতক দেখাইয়াছি, কিন্তু এই তত্ত্ব আরো বিস্তৃত ভাবে ব্যাখ্যা করা আবশ্যক।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

কাল ও ঘটনা *

জ্ঞান নিত্য বস্তু, এমন কাল ছিল না যখন জ্ঞান ছিল না, এমন কাল আসে না যখন জ্ঞান বিলুপ্ত হয়, এমন কাল আসিবে না যখন জ্ঞান থাকিবে না,—ইহা বুঝিতে হইলে জ্ঞানের সহিত কালের প্রকৃত সম্বন্ধ বুঝিতে হইবে। যাঁহারা জ্ঞানের নিত্যত্ব স্বীকার করেন না, যাঁহারা বলেন জীবোৎপত্তির সঙ্গে সঙ্গে জ্ঞান উৎপন্ন হইয়াছে, এবং এই জীব-গত জ্ঞান ক্ষণে ক্ষণে বিলুপ্ত: হয়, অথবা, জগতের আধার বা কারণ এমন একটি বস্তু যাহা এক সময়ে জ্ঞানযুক্ত ছিল না, কোন অনির্দ্দিষ্ট কালে জ্ঞানযুক্ত হইয়াছে এবং কোন অনির্দ্দিষ্ট কালে জ্ঞান-বিহীন হইবে বা হইতে পারে, তাঁহাদের মূল ভ্রম এই যে তাঁহারা কালকে জ্ঞান-নিরপেক্ষ মনে করেন,—জ্ঞানকে ছাড়িয়াও কাল থাকিতে পারে, এরূপ মনে করেন। আমরা ইঁহাদের ভ্রম দেখাইতে চেষ্টা করিতেছি। ইতিপূর্ব্বে আমরা দেখাইয়াছি যে দেশ এবং দেশাশ্রিত সমুদায় বস্তু জ্ঞান-সাপেক্ষ, জ্ঞানাধীন। এখন যদি আমরা দেখাইতে পারি যে কাল এবং কালের অধীন সমস্ত ঘটনা জ্ঞান সাপেক্ষ,

---

* See Green's *Lectures on the Philosophy of Kant* in the second volume of his works, pp. 72-81: "The 'Empirical Reality' of Time." See also an inconsistency of Kant on the subject of time pointed out in Sec F. of the same lectures, pp. 50-57.

তাহা হইলে সমস্ত জগৎ জ্ঞানের ভিতরে আসিয়া পড়িল, এবং অধ্যাত্মবাদের ভিত্তি,—প্রকৃত ব্রহ্মজ্ঞানের ভিত্তি—সুপ্রতিষ্ঠিত হইল। আমরা এই পরিচ্ছেদে কালের প্রকৃতি আলোচনা করিয়া পর পরিচ্ছেদে জ্ঞানের সহিত কালের সম্বন্ধ আলোচনা করিব।

'এথা' ও 'সেথা'র সম্বন্ধ, ভিন্ন ভিন্ন অংশের সংযোগ—ইহারই নাম দেশ; সংযোগ ছাড়িয়া উপকরণগুলি কিছুই নহে, এবং উপকরণগুলিকে ছাড়িয়া সংযোগও কিছু নহে। অসীম অংশের সংযোগেই দেশের অস্তিত্ব; এবং এই সংযোগের অপরিহার্য্য কারণ—জ্ঞান। দেশ সম্বন্ধে পাঠক এই কথা ইতিপূর্ব্বেই জানিয়াছেন। দেশ যেমন একটা সম্বন্ধবাচক বিষয়, কালও তেমনি। 'এখন' ও 'তখন'-এর সম্বন্ধের নাম কাল। পাঠক বলিতে পারেন কেবল 'এখন' বলিলেই ত কাল বুঝায়, 'তখন'-এর সঙ্গে সম্বন্ধের প্রয়োজন কি? ইহার উত্তর এই যে, কেবল 'এখন'-এর কোন অর্থই নাই। 'তখন' এর সঙ্গে সম্বন্ধ ভিন্ন 'এখন'-এর কোন অর্থ নাই। 'পূর্ব্ব'-এর সঙ্গে সম্বন্ধ ভিন্ন 'পর'-এর কোন অর্থ নাই, আর 'পর'-এর সঙ্গে সম্বন্ধ ভিন্ন 'পূর্ব্ব'-এরও কোন অর্থ নাই। 'এখন' আর 'তখন', 'পূর্ব্ব' আর 'পর' এই দুয়ের সম্বন্ধকেই কাল বলা যায়। পরস্পরের সম্বন্ধ না থাকিলে 'এখন' আর 'তখন', 'পূর্ব্ব' আর 'পর' ইহাদের কোন অর্থ নাই, আর

সম্বন্ধ বিষয় যে 'এখন' আর 'তখন', 'পূর্ব্ব' আর 'পর', ইহারা না থাকিলে সম্বন্ধটারও কিছুই অর্থ নাই। কাল সম্পূর্ণরূপেই সম্বন্ধবাচক বিষয়; 'এখন' আর 'তখন' 'পূর্ব্ব' আর 'পর'-এর সম্বন্ধ ভিন্ন কালের আর কোন অর্থ নাই। এখন কথা এই যে, 'এখন' ও 'তখন', 'পূর্ব্ব' ও 'পর', ইহারা কিছু শূন্য বিষয় নহে, ইহারা ঘটনাবাচক, ইহারা ঘটনার বিশেষণমাত্র; ঘটনা ছাড়িয়া ইহাদের কোন অর্থ নাই। 'এখন' আর 'তখন' অর্থ 'এই ঘটনা' আর 'সেই ঘটনা,' 'পূর্ব্ব' আর 'পর'-এর অর্থ 'পূর্ব্ববর্ত্তী ঘটনা' আর 'পরবর্ত্তী ঘটনা'। পাঠকের কখন কখন বোধ হইতে পারে যে ঘটনাকে ছাড়িয়াও যেন 'এখন' 'তখন'-এর, 'পূর্ব্ব' 'পর'-এর, কোন অর্থ আছে,—বোধ হইতে পারে যে 'এখন ঘটনাটা ঘটিল,' ইহাতে যেন বুঝাইতেছে যে ঘটনাকে ছাড়িয়াও 'এখন' কথাটার কোন অর্থ আছে; কিন্তু একটু ভাবিলেই বুঝিবেন যে ঘটনাকে ছাড়িয়া 'এখন'-এর কোন অর্থই নাই। ঘটনা অবশ্য নানা প্রকারের হইতে পারে, এক প্রকারের না হইয়া অন্য প্রকারের হইতে পারে; ঘটনা যাহাই হউক, প্রত্যেকের উপরই নির্ব্বিশেষে 'এখন' লাগিবে, ইহাতে বোধ হইতে পারে যেন 'এখন' একটা সাধারণ বিষয়, আর ঘটনা যেন বিশেষ বিষয়, যেন 'এখন' আর 'এখনকার ঘটনা' এক নয়। কিন্তু বস্তুতঃ বিশেষকে ছাড়িয়া দিলে সাধারণটা কিছুই

নহে। ঘটনা যে-কোন প্রকারের হইতে পারে, কিন্তু কোন না-কোন ঘটনাছাড়া 'এখন'-এর কোন অর্থই নাই। এমন অনেক সময় আসে যে সময়ে বাহিরের কোন ঘটনা—দেশ-গত জগতের কোন ঘটনা—আমাদের সমক্ষে ঘটে না; সেরূপ স্থলে বোধ হইতে পারে যেন ঘটনাছাড়াও 'এখন'-এর কোন অর্থ আছে; কিন্তু সেরূপ স্থলেও ঘটনা ঘটে, সেরূপ স্থলে আমাদের মনের ভিতর চিন্তা-প্রবাহ বহিতে থাকে, সেরূপ স্থলে 'এখন'-এর বিশেষ্য আমাদের চিন্তাসমূহ। আত্ম-পরীক্ষার অভাবে আমরা এই সকল ঘটনাকে ঘটনা বলিয়া ধরিতে পারি না, বুঝিতে পারি না। অতএব পাঠক বুঝিতে পারিতে-ছেন যে একটা 'পূর্ব্ববর্ত্তী ঘটনা' ও 'পরবর্ত্তী ঘটনা', ইহাই 'এখন' 'তখন'-এর, 'পূর্ব্ব' 'পর'-এর, প্রকৃত অর্থ; ঘটনাছাড়া 'পূর্ব্ব', 'পর', 'এখন', 'তখন' কিছুই নহে। সুতরাং আমরা কালকে যে একটা সম্বন্ধ বলিয়াছি, সে সম্বন্ধের সম্বন্ধ বিষয় ঘটনা। যে বিষয়সমূহের সম্বন্ধের নাম কাল, সে সম্বন্ধ বিষয়সমূহ—ঘটনা। কাল = পূর্ব্ব-পর-ঘটন-সমূহের সম্বন্ধ। ঘটনাকে ছাড়িয়া কাল কিছুই নহে; ঘটনা-শূন্য কাল অর্থহীন অসম্ভব ব্যাপার। অপর দিকে, কাল-শূন্য ঘটনাও অর্থহীন অসম্ভব ব্যাপার। আমরা ইতিপূর্ব্বেই বলিয়াছি যে সম্বন্ধ বস্তু-সমূহকে ছাড়িয়া সম্বন্ধ কিছুই নহে; এবং সম্বন্ধছাড়া সম্বন্ধ বিষয়গুলিও কিছুই নহে। কাল = পূর্ব্ব-পর-ঘটনা-সমূহের সম্বন্ধ,

সুতরাং এই সম্বন্ধকে ছাড়িয়া ঘটনা কিছুই নহে। ঘটনা-মাত্রই কালে ঘটে, ঘটনামাত্রই 'এখনকার ঘটনা, বা 'তখনকার' ঘটনা'; কিন্তু 'তখনকার ঘটনা'র সহিত সম্বন্ধছাড়া 'এখনকার ঘটনা'র কোন অর্থই নাই, এবং 'এখনকার ঘটনা'র সহিত সম্বন্ধছাড়া 'তখনকার ঘটনা'র কোন অর্থ নাই। সুতরাং ঘটনা-মাত্রই অন্য ঘটনার সহিত পূর্ব্ব-পর সম্বন্ধে আবদ্ধ; এমন ঘটনা ঘটিতে পারে না যাহা অন্য ঘটনার সহিত পূর্ব্ব-পর সম্বন্ধে আবদ্ধ নহে। অন্য ঘটনার সহিত অসম্বন্ধ ঘটনার অর্থ এমন ঘটনা যাহা কালে ঘটে না, অর্থাৎ যাহা আদৌ ঘটেই না। 'ঘটে' বলিলেই 'কালে ঘটে' বুঝায়; কাল-শূন্য ঘটনা অর্থহীন অসম্ভব ব্যাপার। আমরা যাহা বুঝাইতে চেষ্টা করিতেছি তাহা একটি স্বতঃসিদ্ধ সত্য। সত্যটির অর্থ বুঝিবামাত্রই ইহা স্বতঃসিদ্ধ বলিয়া প্রতীত হইবে; অর্থ না বুঝিলে ইহাকে সত্য বলিয়া বোধ হইবে না। যাহা বলা হইল তাহা সচিন্ত মনে কয়েকবার পড়িলেই পাঠক সত্যটী বুঝিতে পারিবেন।

যাহা বলা হইল তাহা হইতেই ইহা বোঝা যাইতেছে—আমরা কেবল স্পষ্টতার জন্য ইহা স্বতন্ত্র ভাবে বলিতেছি—যে এক বারে প্রথম ঘটনা বা একবারে শেষ ঘটনা বলিয়া কোন ঘটনা থাকিতে পারে না। একটা নির্দ্দিষ্ট ঘটনা-শৃঙ্খল—যার পূর্ব্বে ও পরে অন্যান্য ঘটনা ঘটিয়াছে ও ঘটিবে,—এরূপ ঘটনা-শৃঙ্খলের প্রথম ঘটনা বা শেষ ঘটনা বলিয়া অবশ্য

একটা ঘটনা থাকিতে পারে। ক, খ, গ, ঘ, এই ঘটনা-শৃঙ্খলের প্রথম ঘটনা ক হইতে পারে, শেষ ঘটনা ঘ হইতে পারে; কিন্তু যার পূর্ব্বে আর কোন ঘটনা আদৌ ঘটে নাই, অথবা পরে আর কোন ঘটনা আদৌ ঘটিবে না, এরূপ একটা ঘটনা থাকা অসম্ভব। আমরা এরূপ ঘটনার বিষয় কথা বলিতে পারি বটে, যেমন আর দশটা স্ববিরোধী অসঙ্গত বিষয় সম্বন্ধে কথা বলিয়াছি ও বলিতে পারি, কিন্তু ইহার বিষয় কথা বলিতে পারাতেই কিছু ইহার স্ববিরোধিতা, ইহার অসঙ্গতি-দোষ, দূর হয় না। 'একবারে প্রথম ঘটনা', যার পূর্ব্বে আর কোন ঘটনা ঘটে নাই, এরূপ ঘটনা এমন একটা পরবর্ত্তী ঘটনা যাহার কোন পূর্ব্ববর্ত্তী ঘটনার সহিত সম্বন্ধ নাই। কিন্তু 'পূর্ব্ববর্ত্তী'র সহিত সম্বন্ধছাড়া 'পরবর্ত্তী'র কোন অর্থই নাই। সুতরাং ইহা একবারে প্রথম ঘটনা নহে, ইহারও পূর্ব্ব-বর্ত্তী ঘটনা আছে। পাঠক হয়ত বলিবেন যে আমরা নিজের গড়া চক্রে ঘুরিতেছি, অথবা নিজের সৃষ্ট শত্রুর সঙ্গে যুদ্ধ করিতেছি। হয় ত বলিবেন, প্রথম ঘটনাকে 'পরবর্ত্তী' বলিবার প্রয়োজন কি? ইহাকে 'পরবর্ত্তী' বলিলে ইহার সহিত 'পূর্ব্ববর্ত্তীর' সম্বন্ধ ত বুঝাইবেই।" কিন্তু বস্তুতঃ আমাদের কোন অপরাধ নাই। 'একবারে প্রথম ঘটনা'র আর কোন অর্থই হইতে পারে না, কেবল এই অর্থই হইতে পারে যে ইহার পূর্ব্বে আর কোন ঘটনা ঘটে নাই। তবেই হইল যে ইহার

'পূর্ব্ব' আছে, আর 'পূর্ব্ব' থাকিলে পূর্ব্ববর্ত্তী ঘটনাও আছে; ঘটনাছাড়া 'পূর্ব্ব'-এর কোন অর্থই নাই; ঘটনাছাড়া কাল অর্থহীন, অসম্ভব, ইহা আমরা পূর্ব্বেই দেখিয়াছি। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে 'প্রথম ঘটনা'র কেবল এই অর্থই হইতে পারে যে ঘটনাটা কোন নির্দ্দিষ্ট ঘটনাবলীর প্রথম ঘটনা। 'এই ঘটনার পূর্ব্বে আর কোন ঘটনা ঘটে নাই' এই কথা কেবল এই অর্থেই সত্য হইতে পারে যে এই ঘটনার পূর্ব্বে এই শ্রেণীর ঘটনা আর ঘটে নহে, এই জাতীয় ঘটনা আর ঘটে নাই; অন্য শ্রেণীর ঘটনা, অন্য জাতীয় ঘটনা, অবশ্যই ঘটিয়া থাকিবে। একবারে প্রথম ঘটনা,—যার পূর্ব্বে আর কোন ঘটনা ঘটে নাই,—এরূপ ঘটনা স্ববিরোধী অসম্ভব ব্যাপার।

একবারে প্রথম ঘটনা যেমন অসম্ভব, একবারে শেষ ঘটনাও তেমনি অসম্ভব। 'একবারে শেষ ঘটনা,' অর্থ এমন একটা ঘটনা যার পরে আর কোন ঘটনা ঘটে না, অর্থাৎ যার 'পর' আছে, কিন্তু পরবর্ত্তী ঘটনা নাই। কিন্তু ঘটনাছাড়া 'পর'-এর কোন অর্থই নাই, ঘটনাছাড়া কাল অর্থহীন, অসম্ভব; সুতরাং একবারে শেষ ঘটনা, যার পর আর কোন ঘটনা ঘটে না, এরূপ ঘটনা থাকিতে পারে না। এস্থলেও বক্তব্য এই যে কোন বিশেষ শ্রেণীর বা বিশেষ জাতীয় ঘটনার সম্বন্ধে এরূপ বলা যাইতে পারে যে ইহার পর সেই শ্রেণীর বা সেই জাতীয়

ঘটনা আর ঘটে নাই বা ঘটিবে না ; কিন্তু অন্য শ্রেণীর বা অন্য জাতীয় ঘটনা অবশ্যই ঘটিয়াছে বা ঘটিবে। একবারে শেষ ঘটনা একটা স্ববিরোধী অসম্ভব ব্যাপার।

আর একটি কথা স্পষ্ট করিয়া বলা আবশ্যক। আমরা দেখিয়াছি যে ঘটনাছাড়া কাল অর্থহীন অসম্ভব; সুতরাং ইহা বোঝা যাইতেছে যে এমন কোন কাল থাকিতে পারে না যে কালে কোন ঘটনা ঘটিতেছে না ; একবারে প্রথম বা একবারে শেষ ঘটনা বলিয়া কোন ঘটনা থাকিতে পারে না। এখন, আর একটি কথা এই যে দুটি নির্দ্দিষ্ট ঘটনার মধ্যে এমন কাল থাকিতে পারে না যে কালে কোন ঘটনা ঘটিতেছে না। এরূপ কাল ঘটনা-শূন্য কাল, সম্বন্ধ-বিষয়-শূন্য সম্বন্ধ, সুতরাং ইহা একটা স্ববিরোধী অসম্ভব ব্যাপার। কাল আছে বলিলে ইহাও বুঝিতে হইবে যে কালের উপকরণরূপী ঘটনাও আছে। 'ক' ঘটিবার অব্যবহিত পরেই 'খ' না ঘটিয়া অনেক পরে ঘটিতে পারে ; কিন্তু সে স্থলে 'ক' ও 'খ'-এর মধ্যবর্ত্তী সময়ে কতকগুলি ঘটনা ঘটা চাই, সে সকল ঘটনা 'ক, খ' জাতীয়ই হউক আর অন্য জাতীয়ই হউক ; তাহা না হইলে এই মধ্যবর্ত্তী সময়ের কোন অর্থ ই নাই। 'ক' এর অব্যবহিত পরেই, যদি কোন ঘটনা না ঘটে, তবেই, হইল যে 'ক' এর সম্বন্ধে 'পর' আছে, কিন্তু পরবর্ত্তী ঘটনা নাই। তেমনি 'খ' এর অব্যবহিত পূর্ব্বেই যদি কোন ঘটনা না ঘটে, তবেই হইল যে, 'খ' এর সম্বন্ধে 'পূর্ব্ব'

আছে, কিন্তু পূর্ব্ববর্ত্তী ঘটনা নাই। কিন্তু পূর্ব্ববর্ত্তী ঘটনা ও পরবর্ত্তী ঘটনাছাড়া 'পূর্ব্ব' ও 'পর'-এর যে কোন অর্থই নাই তাহা আমরা উপরে বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছি। অতএব বোঝা গেল যে ঘটনা-শূন্য কাল থাকিতে পারে না, এমন এক মুহূর্ত্তও থাকিতে পারে না যখন কোন-না-কোন ঘটনা ঘটিতেছে না।

আমরা ইতিপূর্ব্বে দেখিয়াছি যে একবারে প্রথম ঘটনা বলিয়া কোন ঘটনা থাকিতে পারে না, কোন ঘটনার পূর্ব্বে শূন্য কাল থাকিতে পারে না। তার পরে দেখাইয়াছি যে একবারে শেষ ঘটনা বলিয়াও কোন ঘটনা থাকিতে পারে না, কোন ঘটনার পরে শূন্য কাল থাকিতে পারে না, কাল মাত্রকেই ঘটনাযুক্ত হওয়া চাই, ঘটনা-শূন্য কাল অর্থহীন অসম্ভব ব্যাপার। এই সমুদায় সত্য হইতে এই সিদ্ধান্ত হইতেছে যে ঘটনা-প্রবাহ অসীম,—ইহা অনাদি অনন্ত; ইহার আরম্ভ নাই, শেষ নাই। এই অসীম ঘটনা-শৃঙ্খলের অন্তর্গত কোন ঘটনাই অসম্বদ্ধ নহে, স্বতন্ত্র নহে; প্রত্যেকে প্রত্যেকের সহিত অপরিহার্য্য সম্বন্ধে সম্বদ্ধ। 'কাল অনন্ত'—ইহার দুই অর্থ; এক অর্থ এই যে ঘটনা-প্রবাহ অনন্ত; আর এক অর্থ এই যে কালরূপ সম্বন্ধের আশ্রয় যিনি—এই অনন্ত ঘটনা-শৃঙ্খলের আশ্রয় ও কারণ যিনি—তিনি অনন্ত অর্থাৎ নিত্য। কিন্তু এই সত্যের ব্যাখ্যা আমরা যথাস্থানে করিব।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

জ্ঞান ও কাল *

কালের অর্থ বুঝা গেল, এখন কালের সহিত জ্ঞানের সম্বন্ধ আলোচনা করা যাক্। এই আলোচনার প্রারম্ভেই পাঠককে আত্মানাত্ম-বিবেকের সিদ্ধান্তটি স্মরণ করাইয়া দিতেছি। যাহা কিছু আমরা জানি, জানিয়াছিলাম বা জানিব, যাহা কিছু ভাবি, ভাবিয়াছিলাম, ভাবিব বা ভাবিতে পারি,—যাহা কিছুর অস্তিত্ব বিশ্বাস-যোগ্য,—সমস্তই জ্ঞানাধীন। সুতরাং ঘটনা ব্যাপারটাও জ্ঞানাধীন, জ্ঞানাশ্রিত। ঘটনামাত্রই জ্ঞানগোচর বস্তুর আবির্ভাব বা তিরোভাব; সুতরাং ভূত, বর্ত্তমান, ভবিষ্যৎ, সমুদায় ঘটনাই জ্ঞানের বিষয়ীভূত। ঘটনা দ্বিবিধ হইতে পারে; এক প্রকার ঘটনা দেশে অবস্থিত বস্তুসমূহের মধ্যে ঘটে, যথা এই লিখনকার্য্য। কাগজ, কলম, কালি, এই সমুদায়ের যোগেই লেখা সম্ভব, এই বস্তুগুলি সমস্তই দেশে অবস্থিত; এই শ্রেণীর ঘটনাগুলিকে ভৌতিক কার্য্য বা ঘটনা বলা হয়। আর এক প্রকার ঘটনা আছে যাহার সহিত দেশের যোগ নাই, অন্ততঃ সাক্ষাৎ যোগ নাই, যথা, ইন্দ্রিয়-কার্য্যের মধ্যে শোনা, আর সম্পূর্ণ আভ্যন্তরিক কার্য্য,—সুখ, দুঃখ, প্রীতি,

---

* See Green's *Prolegomena to Ethics*, Chaps. I and II and Green's *Lectures on the Philosophy of Kant* (in his *Works* Vol II), Secs. C. F. and I. See also Caird's *Philosophy of Kant*, (old edition) Part Second, Chaps. V—IX.

ঘৃণা প্রভৃতি ভাবের উদয়। কিন্তু এই দুই জাতীয় ঘটনাই জ্ঞানসাপেক্ষ, জ্ঞানের অধীন।

মূল আলোচনায় প্রবৃত্ত হইবার পূর্ব্বে আর একটি কথা আছে। পাঠক 'বিজ্ঞান' বিষয়টির সহিত ইতিমধ্যেই অনেকটা পরিচিত হইয়াছেন, ইহার সম্বন্ধে এখন কেবল একটি কথা বক্তব্য। বিজ্ঞানের দুটি রূপ। বিশেষ বিশেষ কালে, বিশেষ বিশেষ পূর্ব্ববর্ত্তী ঘটনার সহিত সম্বদ্ধ হইয়া, যে বিজ্ঞান আবির্ভূত বা তিরোহিত হয়, বিজ্ঞানের এই এক রূপ। এই রূপকে আমরা অনেক সময়েই কেবল "ঘটনা" নামে উল্লেখ করিব। পুনশ্চ, বিজ্ঞান যে নিত্য অপরিবর্ত্তনীয় জ্ঞানরূপী আত্মার বিষয়ীভূত হইয়া,—আত্মার সহিত নিত্য সম্বন্ধে সম্বদ্ধ হইয়া—অপরিবর্ত্তনীয়রূপে বর্ত্তমান থাকে,—বিজ্ঞানের এই আর এক রূপ; বিজ্ঞানের এই রূপকে আমরা অনেক স্থলে "ঘটনার জ্ঞান" বলিয়া উল্লেখ করিব। ক্রমে পাঠক এই দুই রূপের প্রভেদ স্পষ্টরূপে বুঝিতে পারিবেন।

ঘটনাছাড়া কাল কিছু নহে, এবং জ্ঞানছাড়া ঘটনা কিছু নহে, ঘটনা মানসিক অবস্থানিচয়, ইহা পাঠক বুঝিয়াছেন। ঘটনা-প্রবাহ যে অনাদি অনন্ত, তাহাও দেখান হইয়াছে। এই অনাদি অনন্ত ঘটনা-প্রবাহ যে এক সম্বন্ধ-শৃঙ্খলে আবদ্ধ, কোন ঘটনা যে কোন ঘটনা হইতে বিযুক্ত নহে, তাহাও দেখান হইয়াছে। সুতরাং ইহা বোঝা যাইতেছে যে এমন কোন

কাল ছিল না যখন জ্ঞান ছিল না, এবং এমন কোন কাল আসিবে না যখন জ্ঞান থাকিবে না, এবং এই অনাদি অনন্ত জ্ঞান যে এক অখণ্ড, এই সত্যেরও অভ্যাস পাওয়া যাইতেছে। এমন কোন সময় ছিল না যখন ঘটনা ছিল না; কিন্তু ঘটনা জ্ঞান-সাপেক্ষ, সুতরাং এমন কোন সময় ছিল না যখন জ্ঞান ছিল না। এমন কোন সময় আসিবে না যখন ঘটনা থাকিবে না; কিন্তু ঘটনা জ্ঞান-সাপেক্ষ, সুতরাং এমন কোন সময় আসিবে না যখন জ্ঞান থাকিবে না। সমুদায় ঘটনাই পরস্পরের সহিত সম্বদ্ধ, অসম্বদ্ধ ঘটনা থাকিতে পারে না; কিন্তু ভিন্ন ভিন্ন উপকরণ-সমূহের মধ্যে সাধারণ কিছু না থাকিলে তাহাদের সম্বন্ধ বা যোগ সম্ভব নহে; এস্থলে জ্ঞানই এই সাধারণ বস্তু; জ্ঞান এক অখণ্ড হইয়াও ভিন্ন ভিন্ন বিজ্ঞান অনুভব করে; সুতরাং জ্ঞানই ঘটনা-প্রবাহের সংযোগকারী,—জ্ঞানই কাল-রূপ সম্বন্ধের আশ্রয়। সমুদায় ঘটনা এক যোগে আবদ্ধ; ভূত, বর্ত্তমান, ভবিষ্যৎ, সমুদায় ঘটনা এক কাল-শৃঙ্খলে আবদ্ধ; সুতরাং জ্ঞানবস্তুও এক। জ্ঞানই যে ঘটনার সংযোগকারী, জ্ঞানই যে কাল-শৃঙ্খলের রচয়িতা, সুতরাং কাল-শৃঙ্খলের অতীত, অজ, নিত্য, শাশ্বত,—আমরা তাহা আর একটু বিশেষ ভাবে বুঝাইতেছি।

১, ২, ৩, ৪, ক্রমান্বয়ে এই চারিটি ঘটনা ঘটিল, যথা এই চারিটি সংখ্যাকে আমি ক্রমান্বয়ে দেখিলাম, বা সম্মুখস্থ কাগজ-

খানাকে ক্রমান্বয়ে চারি বার স্পর্শ করিলাম। এই ঘটনা-শ্রেণীর প্রথম ঘটনা ঘটিবার পূর্ব্বেই যে জ্ঞান বর্ত্তমান ছিল, এবং ইহার পূর্ব্বে যে আরো ঘটনা ঘটিতেছিল, এবং সেই ঘটনাসমূহের সহিত যে এই ঘটনা সম্পর্কিত, পাঠক তাহা জানেন; তবে সেই সকল ঘটনাকে আমরা বর্ত্তমান শ্রেণীর অন্তর্গত বলিয়া ধরিতেছি না, সুতরাং তাহাদের বিষয় এখন বিশেষ কিছু বক্তব্য নাই। যাহা হউক, এই শ্রেণীর প্রথম ঘটনা ঘটিবার পূর্ব্বেই জ্ঞান বর্ত্তমান থাকিয়া এই ঘটনাকে জানিল; অর্থাৎ একটি বিজ্ঞানযুক্ত হইয়া আত্মা প্রকাশিত হইল। এই প্রথম ঘটনা ঘটিবার পক্ষেই জ্ঞান আবশ্যক। তার পর প্রথম ঘটনা শেষ হইলে পর দ্বিতীয় ঘটনা ঘটিতে হইলে প্রথম ঘটনার জ্ঞাতাকেই দ্বিতীয় ঘটনা জানা আবশ্যক, এবং দ্বিতীয় ঘটনাকে জানিবার সময় প্রথম ঘটনাকে স্মরণ রাখা আবশ্যক। জ্ঞানের এই একত্বের উপর এবং এই স্মরণের উপরই প্রথমের প্রথমত্ব ও দ্বিতীয়ের দ্বিতীয়ত্ব নির্ভর করে। প্রথমের সহিত দ্বিতীয়ের যোগ না হইলে প্রথমের প্রথমত্ব থাকে না, দ্বিতীয়ের দ্বিতীয়ত্ব থাকে না; কারণ 'প্রথম', 'দ্বিতীয়,' এই সমুদায় সম্বন্ধবাচক শব্দ, যোগবাচক শব্দ। এই যোগ জ্ঞানের একতার উপর নির্ভর করে। এক জ্ঞানে—এক অচ্ছেদ্য জ্ঞানক্রিয়াতে—'পূর্ব্ব' ও 'পর', 'প্রথম' ও 'দ্বিতীয়,' একত্র না হইলে 'পূর্ব্ব' ও 'পর'-এর 'প্রথম' ও 'দ্বিতীয়'-এর, কোন অর্থই থাকে না। প্রথম ঘটনা

বিগত হইবার সঙ্গে সঙ্গে যদি প্রথম ঘটনার জ্ঞানও বিগত হইত, বিলীন হইত, তবে প্রথমের প্রথমত্ব ও দ্বিতীয়ের দ্বিতীয়ত্ব কিছুই সম্ভব হইত না। জ্ঞাতা স্বয়ং ঘটনার সঙ্গে সঙ্গে বিগত না হইয়া, প্রবাহাতীত থাকিয়া, প্রথম ঘটনার স্মৃতিকে বহন করিয়া দ্বিতীয়ের সহিত সংযুক্ত করাতেই দ্বিতীয়ের দ্বিতীয়ত্ব সম্ভব হইয়াছে। এই রূপ তৃতীয় ঘটনার উৎপত্তিও সেই একই জ্ঞানের উপর নির্ভর করে, এবং জ্ঞান স্বয়ং প্রবাহাতীত থাকিয়া প্রথম ও দ্বিতীয়ের স্মৃতিকে বহন করিয়া তৃতীয়ের সহিত সংযুক্ত করাতেই তৃতীয়ের তৃতীয়ত্ব সম্ভব হইয়াছে। এই রূপে চতুর্থ ও পরবর্ত্তী ঘটনাসমূহ সম্বন্ধেও এই এক কথাই খাটে। সুতরাং পাঠক দেখিতেছেন যে জ্ঞানই কাল-শৃঙ্খলের রচয়িতা। প্রথমতঃ, জ্ঞান না থাকিলে ত ঘটনাই সম্ভব নহে; তার পরে, ঘটনার প্রকৃতিই এই যে ইহা এই আছে এই নাই। এরূপ অস্থায়ী অস্থির প্রবাহশীল বিষয়ের স্মৃতি যদি জ্ঞানরূপী আত্মাতে ধৃত না হইত, তবে কাল-শৃঙ্খল, কালরূপ সম্বন্ধ, কখনই রচিত হইতে পারিত না; তাহা হইলে 'পূর্ব্ব' ও 'পর,' 'এখন' ও 'তখন,' এই সমুদায় সম্বন্ধ আদৌ সম্ভব হইত না। 'পূর্ব্ব'-এর জ্ঞান স্থায়ী হয় বলিয়াই 'পর' কথাটা আসে; 'এখন' বিগত হইলেও 'এখন'-এর জ্ঞান বিগত হয় না, তাহাতেই 'তখন' কথাটা সম্ভব হয়। সুতরাং পাঠক দেখিতেছেন যে জ্ঞানই কালের আশ্রয় ও কারণ। 'এখন' ও 'তখন', 'পূর্ব্ব' ও 'পর,' 'অতীত' ও 'বর্ত্তমান'-এর সম্বন্ধের

নামই কাল। কিন্তু কেবল স্থায়ী প্রবাহশূন্য জ্ঞানবস্তুই এই সম্বন্ধ স্থাপন করিতে পারে। 'পূর্ব্ব' আর 'পর'কে কেবল সেই সংযুক্ত করিতে পারে যে পূর্ব্ব ঘটনা অতীত হইবার সঙ্গে সঙ্গে স্বয়ং অতীত হয় না, যে 'পূর্ব্ব'কে হারাইয়াও স্বয়ং আত্ম-হারা হয় না, পরন্তু পূর্ব্ব ঘটনা অতীত হইলেও পূর্ব্ব ঘটনার জ্ঞানকে ধরিয়া থাকে ও পরবর্ত্তী ঘটনার জ্ঞানের সহিত সংযুক্ত করে। এই কার্য্য কেবল জ্ঞানই করিতে পারে; সুতরাং জ্ঞানই কালরূপ সম্বন্ধের আশ্রয়, জ্ঞানই কাল-শৃঙ্খলের রচয়িতা।

এখন কথা এই যে, যে কাল-শৃঙ্খলের রচয়িতা, যে কাল-রূপ সম্বন্ধের আশ্রয় ও কারণ, সে কালের অধীন হইতে পারে না। যে-সকল উপকরণের সম্বন্ধকে কাল বলা হয়, জ্ঞান তাহাদের মধ্যে একটা হইতে পারে না। যাহাকে অবলম্বন না করিয়া ঘটনা ঘটিতে পারে না, যাহার স্থায়িত্ব ও প্রবাহ-হীনতা ঘটনা-শৃঙ্খল রচিত হইবার কারণ, সে কখনও উৎপন্ন, প্রবাহিত ও বিলীন হইতে পারে না। যাহাকে আমরা জীবের উৎপত্তি, জীবন ও মরণ বলি, তাহা এক একটা ঘটনা বা ঘটনা-প্রবাহ; এই সকল ঘটনা বা ঘটনা-প্রবাহ সংঘটিত হইবার পক্ষে জ্ঞানের প্রয়োজন; জ্ঞানই এই সমুদায় ঘটনা বা ঘটনা-প্রবাহের আশ্রয় বা কারণ; সুতরাং জ্ঞান জন্ম-মরণ-বিহীন, প্রবাহশূন্য। অতএব ইহা স্পষ্টরূপেই প্রতীত হইতেছে যে, যে জ্ঞান আমাদের জীবনের সার বস্তু; যে জ্ঞান আমাদের

জানা সমুদায় বস্তুর আলোক ও আধাররূপে প্রকাশ পাইতেছে, যে জ্ঞান বিচিত্র বিজ্ঞাননিচয়-সমন্বিত হইয়া এবং নিজ সংযোগকারিণী শক্তিতে সমুদায় বিজ্ঞানকে একীভূত করিয়া বিচিত্র বিশ্বরূপে প্রকাশিত হয়, যে জ্ঞান আমাদের ব্যক্তিগত বিস্মৃতি ও নিদ্রাকালে আমাদের ব্যক্তিগত ইচ্ছা-নিরপেক্ষভাবে তিরোহিত হয়, আবার আমাদের ব্যক্তিগত ইচ্ছা-নিরপেক্ষ ভাবে পুনরায় স্মৃতি ও জাগরণরূপে প্রকাশিত হইয়া আমাদের জীবনলীলা রচনা করে, যে জ্ঞানকে আমরা আমাদের নিজস্ব ক্ষুদ্র ব্যক্তিগত জ্ঞান বলিয়া অহংকৃত হই, কিন্তু যাহা সম্পূর্ণ-রূপেই আমাদের ব্যক্তিগত ইচ্ছা-নিরপেক্ষ এবং আমাদের ব্যক্তিগত ইচ্ছা ও কর্তৃত্বের মূল,—সেই জ্ঞান জন্ম-মরণহীন নিত্য বস্তু, ইহার আরম্ভ নাই, শেষ নাই। আমাদের ব্যক্তিগত জীবনের আরম্ভ আছে, তাহাতে আর সন্দেহ কি? কিন্তু এই আরম্ভের অর্থ কি? এই আরম্ভের অর্থ একটি বিশেষ ঘটনা-প্রবাহের আরম্ভ, এই প্রবাহের আশ্রয় ও কারণরূপী জ্ঞানবস্তুর আরম্ভ নহে। এই ঘটনা-শৃঙ্খল আরম্ভ হইবার পূর্ব্বেই এই জ্ঞান বর্তমান ছিল। এই ঘটনা-শৃঙ্খলের পূর্ব্ববর্ত্তী ঘটনাসমূহ এই শৃঙ্খলের অন্তর্গত না হইলেও উহারা এই শৃঙ্খলের সহিত অচ্ছেদ্য যোগে আবদ্ধ, এবং এই যোগের কারণ জ্ঞানের একতা। পূর্ব্ববর্ত্তী ঘটনাসমূহ এই ঘটনা-শৃঙ্খলের সহিত পূর্ব্ব-পর সম্বন্ধে সম্বদ্ধ; ঐ ঘটনাসমূহের

আশ্রয়রূপী জ্ঞান বর্ত্তমান ঘটনা-শৃঙ্খলের আশ্রয়রূপী জ্ঞানের সহিত এক না হইলে এই পূর্ব্ব-পর সম্বন্ধ কোন প্রকারেই সম্ভব হইত না। সুতরাং এই জ্ঞান যে অনাদি নিত্য বস্তু, তাহা স্পষ্টই প্রতীত হইতেছে। এই জ্ঞান যে অনন্ত অবিনাশী, বোধ হয় তাহা আর বিশেষ ভাবে বুঝাইতে হইবে না, পূর্ব্বোক্ত যুক্তি-প্রণালী অবলম্বন করিলে তাহাও স্পষ্টরূপে প্রতীত হইবে। কি যে মহাবস্তু আমরা হৃদয়ে ধারণ করিয়া আছি, কি যে মহাবস্তু আমাদের প্রত্যেক ইন্দ্রিয়বোধ, প্রত্যেক চিন্তা, প্রত্যেক ভাব, প্রত্যেক কার্য্যের সঙ্গে প্রকাশ পাইতেছেন, পাঠক এক-বার ভাবিয়া দেখুন্, দেখিয়া স্তম্ভিত হউন্। বিজ্ঞান যে অতি বিচিত্র অসংখ্য ঘটনা-শৃঙ্খলের তত্ত্ব প্রকাশ করে, সেই ঘটনা-শৃঙ্খলের আশ্রয় যিনি, সেই বিচিত্র অনন্ত লীলার রচয়িতা যিনি, তিনিই এই ক্ষুদ্র জীবন-লীলার রচয়িতারূপে প্রকাশ পাইতে-ছেন। যিনি বর্ত্তমান জগতের আদিম বস্তু আগ্নেয় বাষ্পকে করতলে ধারণ করিয়া ঘূর্ণিত করিয়াছিলেন, যিনি অনন্ত আকাশে অসংখ্য সূর্য্য, অসংখ্য গ্রহ উপগ্রহ নিক্ষেপ করিয়া-ছিলেন, যিনি কোটী কোটী বৎসর ধরিয়া কোটী কোটী প্রাকৃ-তিক পরিবর্ত্তন সংঘটন করিতেছেন, কোটী কোটী জীব সৃজন পালন ও বিনাশ করিতেছেন, যিনি অসংখ্য সোপান-পরম্পরার ভিতর দিয়া জগৎকে ক্রমাগত উন্নতির পথে পরিচালিত করিতেছেন, সেই অনন্ত জ্ঞান-শক্তিই আমাদের প্রত্যেকের

প্রাণরূপে জীবনাধাররূপে বিরাজ করিতেছেন। আমরা আর অধিক বলিব না; উপরে যাহা বলা হইল তাহা সচিন্ত মনে পাঠ করিলেই পাঠক বুঝিতে পারিবেন এই সকল কথা কবির কল্পনা নহে, ভাবুকের অস্থায়ী অমূলক ভাবোচ্ছ্বাস নহে, এই সমুদায় অবশ্যম্ভাবী অনতিক্রমণীয় সত্য।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

ঈশ্বর সর্ব্বজ্ঞ

জ্ঞানই যে কাল-শৃঙ্খলের রচয়িতা, জ্ঞানই যে ঘটনা-প্রবাহের প্রস্রবণ, উপরে আমরা এই সত্যের যে ব্যাখ্যা দিলাম তাহা হইতে ঈশ্বরের সর্ব্বজ্ঞত্ব স্পষ্টরূপে প্রতীত হইতেছে। আমরা দেখিয়াছি যে ঘটনা অস্থায়ী প্রবাহশীল বটে, কিন্তু ঘটনার জ্ঞান স্থায়ী প্রবাহ-শূন্য। উপরিউক্ত ব্যাখ্যার দৃষ্টান্ত-স্থানীয় ১, ২, ৩, ৪, এই ঘটনাসমূহ ক্রমান্বয়ে ঘটিতে লাগিল, কিন্তু ইহাদের প্রত্যেকের জ্ঞান স্থায়ী প্রবাহ-শূন্য থাকিয়া পরবর্ত্তী ঘটনার জ্ঞানের সহিত সংযুক্ত হইতে লাগিল, এবং উহা যে পর, এই জ্ঞানকে সম্ভব করিতে লাগিল। ঘটনা অতীত হইলেও ঘটনার জ্ঞান অতীত হইল না; ইহা জ্ঞাতার সহিত একীভূত হইয়া, জ্ঞাতার অঙ্গীভূত হইয়া, স্থায়ী হইল। এখন পাঠক বিশেষ মনোযোগের সহিত ঘটনা ও ঘটনার জ্ঞানের প্রভেদ বুঝুন্। ঘটনা অস্থায়ী প্রবাহশীল, ঘটনার জ্ঞান স্থায়ী প্রবাহ-শূন্য। ঘটনা জ্ঞানকে অবলম্বন না করিয়া ঘটিতে পারে না সত্য, কিন্তু ঘটনার প্রকৃতিই এই যে ইহা এই আছে, এই নাই; এক মুহূর্ত্তের ঘটনা পর মুহূর্ত্তে থাকে না, পর মুহূর্ত্তে তখন ঘটনা ঘটে। প্রবল বেগবতী নদীর প্রবাহ অপেক্ষাও

ঘটনা-প্রবাহ অধিকতর বেগবান্। বেগবতী নদীর জল এক মুহূর্ত্তের অধিক এক স্থানে থাকে না; ঘটনাপ্রবাহও তেমনি; মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে ঘটনার পর ঘটনা ঘটিতেছে। কিন্তু ঘটনার জ্ঞান প্রবাহ-শূন্য। ঘটনা-স্রোত বহিতে থাকে, কিন্তু ঘটনার জ্ঞান এই স্রোতের তীরে স্থির ভাবে দণ্ডায়মান থাকে, ইহা স্রোতের সঙ্গে প্রবাহিত হয় না। ঘটনাসমূহের পরস্পরের মধ্যে পূর্ব্ব-পরবর্ত্তিত্ব সম্বন্ধ বর্ত্তমান; একটি নির্দ্দিষ্ট ঘটনা-শৃঙ্খলের প্রথম ঘটনা ও শেষ ঘটনার মধ্যে অনেক কালের ব্যবধান। কিন্তু এই সকল ঘটনার জ্ঞান আত্মাতে একত্র বর্ত্তমান থাকে। এই জ্ঞান পূর্ব্ব-পরবর্ত্তী ঘটনার জ্ঞানরূপে আত্মাতে অবস্থিতি করে বটে; কিন্তু সেই অবস্থাতে ঘটনার পূর্ব্বপরবর্ত্তিত্ব নাই, কালের ব্যবধান নাই। ঘটনাসমূহ পরম্পরাগত, কিন্তু পরম্পরাগত ঘটনার জ্ঞান পরম্পরাগত নহে। পরম্পরাগত ঘটনার জ্ঞান এক অখণ্ড জ্ঞানক্রিয়া বা জ্ঞানখণ্ডে সংযুক্ত একীভূত না হইলে তাহাকে পরম্পরাগত ঘটনার জ্ঞানই বলা যাইতে পারে না। সুতরাং ইহা স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে ঘটনা কালের অধীন বটে, কিন্তু ঘটনার জ্ঞান কালের অধীন নহে, ইহাতে কালের গন্ধ নাই। যাহা কালের অধীন নহে, যাহা কালাতীত, তাহা আদৌ প্রবাহিত হইতে পারে না। সুতরাং ঘটনার জ্ঞান আমাদের ব্যক্তিগত জীবনে প্রকাশিত থাক্ আর নাই থাক্, ইহা অক্ষয় অবিনাশী চিরস্থায়ী বস্তু। যখন ইহা ব্যক্তিগত জীবনে

প্রকাশিত হয়, তখন ইহাকে ঘটনার বিপরীত লক্ষণাক্রান্ত বলিয়া বুঝিতে পারি ; সুতরাং ইহা ব্যক্তিগত জীবন হইতে তিরোহিত হইলেও ইহার বিনাশ আশঙ্কা করি না। প্রবাহিত হওয়া, বিনাশপ্রাপ্ত হওয়া, ইহার প্রকৃতিগতই নহে, ইহার প্রকৃতি-বিরুদ্ধ। আমরা পরে কিছু বিস্তৃত ভাবে দেখাইতেছি যে আমাদের জানা ঘটনাসমূহের জ্ঞান আমাদের ব্যক্তিগত জীবন হইতে তিরোহিত হইয়াও বার বার পুনঃপ্রকাশিত হয় ; পুনঃ-প্রকাশিত হইয়া ইহা স্পষ্টরূপে বুঝিতে দেয় যে ইহা ঘটনা নহে; ইহা প্রবাহাতীত অবিনাশী বস্তু। কিন্তু অনেক ঘটনার জ্ঞান হয়ত ব্যক্তিগত জীবনে একবারের অধিক প্রকাশিত হয় না, এবং যে সমুদায় কয়েক বার প্রকাশিত হইয়াছে তাহাদেরও পুনঃপ্রকাশের নিশ্চয়তা নাই। কিন্তু জ্ঞানমাত্রেরই প্রকৃতি এরূপ,—ইহা এরূপ স্থায়িত্ব লক্ষণাক্রান্ত,—যে ইহা একবার প্রকাশিত হইলে নিশ্চিতরূপে বুঝিতে পারা যায় যে ইহা অক্ষয় অবিনাশী বস্তু। ইহা সকল সময়ে আমাদের ব্যক্তিগত জীবনে প্রকাশিত থাকে না বটে, কিন্তু যে অদ্বিতীয় জ্ঞানবস্তু আমাদের ব্যক্তিগত জীবনের কারণ, যে জ্ঞানবস্তু আমাদের ব্যক্তিগত জীবন অপেক্ষা অনন্তগুণে বৃহৎ, যে জ্ঞানবস্তুর সহিত একীভূত হইয়া প্রত্যেক ঘটনার জ্ঞান প্রকাশিত হয়, সেই নিত্য কালাতীত জ্ঞানবস্তুতে যে প্রত্যেক ঘটনার জ্ঞান অক্ষুণ্নরূপে বর্ত্তমান থাকে, তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। আমাদের ব্যক্তিগত জীবনে

কোন্ জ্ঞানই বা স্থায়িরূপে প্রকাশিত থাকে? আমরা দেখাইয়াছি যে, যে দ্বৈতাদ্বৈতভাব-সম্পন্ন মূল জ্ঞানবস্তু আমাদের প্রাণরূপে জ্ঞানরূপে প্রকাশ পাইতেছেন, তিনি অনাদি অনন্ত চির-জাগ্রত। কিন্তু আমরা প্রতি দিনই সুষুপ্তি কালে সম্পূর্ণ রূপে অজ্ঞান হইয়া পড়ি; সেই সময়ে নিত্য জ্ঞান আমাদের ব্যক্তিগত জ্ঞানরূপে প্রকাশিত থাকেন না। কিন্তু এই তিরো-ভাবই কিছু বিনাশ নহে; সুষুপ্তি অন্তে পুনরায় সেই জ্ঞান আমাদের জীবনের আলোকরূপে প্রকাশিত হন। তেমনি বিশেষ বিশেষ বিষয়জ্ঞানের তিরোভাবই কিছু উহাদের বিনাশ নহে। মূল জ্ঞানবস্তু সময়ে সময়ে তিরোহিত হইয়াও যেমন নিত্য অবিনাশীই থাকেন, তেমনি তাঁহার অঙ্গীভূত, তাঁহার সহিত একীভূত, বিশেষ বিশেষ বিষয়জ্ঞান—বিশেষ বিশেষ ঘটনা-জ্ঞান—ব্যক্তিগত জীবন হইতে সময়ে সময়ে তিরোহিত হইলেও মূল জ্ঞানবস্তুতে অবিনাশিরূপে বর্ত্তমান থাকে।

বিশেষ বিশেষ বিষয়-জ্ঞান, বিশেষ বিশেষ ঘটনা-জ্ঞান, আমাদের ব্যক্তিগত জীবন হইতে সময়ে সময়ে তিরোহিত হইয়াও যে আমাদের প্রাণরূপী জ্ঞানবস্তুতে স্থায়িরূপে বর্ত্তমান থাকে, এবং আমাদের ব্যক্তিগত জীবনে পুনঃপ্রকাশিত হইয়া আমাদের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতাকে সম্ভব করে, আমরা কতিপয় দৃষ্টান্তদ্বারা এই সত্যকে দৃঢ়তর করিতেছি।

৮। সম্মুখস্থ এই টেবিল্‌টিকে প্রত্যক্ষ করিয়া—ইহাকে দেখিয়া ও

ছুঁইয়া, আমি স্থানান্তরিত হইলাম এবং বিষয়ান্তরে মনোযোগ দিয়া ইহাকে ভুলিয়া গেলাম। তৎপরে অন্য এক সময়ে ইহাকে পুনরায় প্রত্যক্ষ করিলাম বা প্রত্যক্ষ না করিলেও ইহা কোন ক্রমে স্মরণে আসিল। ইহাকে প্রত্যক্ষ করিয়া ইহাকে পূর্ব্বের জানা টেব্‌ল্‌ বলিয়া চিনিতে পারিলাম, অথবা ইহা স্মরণে আসাতে বুঝিতে পারিলাম যে, যে টেবল্‌টির প্রত্যক্ষ জ্ঞান পূর্ব্বে লাভ করিয়াছিলাম, ইহা সেই টেব্‌লেরই স্মৃতি। এই স্মৃতি ব্যাপারটী কিরূপে ঘটিল? বিষয়জ্ঞান যদি একটা ঘটনামাত্র হইত, একটা প্রবাহশীল বিনাশশীল বস্তু হইত, ইহা যদি প্রবাহশূন্য অবিনাশী বস্তু না হইত, তবে যে বিষয়জ্ঞান একবার মানসক্ষেত্র ছাড়িয়া গিয়াছিল তাহা আর কখনও মনে আসিত না; কিন্তু এই স্মৃতিব্যাপারে দেখিতেছি পূর্ব্বকার বিষয়জ্ঞানই আবার ফিরিয়া আসিয়াছে। টেবল্‌টীকে পুনর্ব্বার দেখাতে ও ছোঁয়োতে কতকগুলি নূতন ঘটনা ঘটিতেছে বটে, কিন্তু যাহা ফিরিয়া আসিল তাহা যে পূর্ব্বকার পুরাতন জ্ঞান, তাহাতে সন্দেহ নাই। অতীত ও বর্ত্তমানের যোগ না হইলে স্মৃতি সম্ভব হয় না; কিন্তু অতীত কাল চিরদিনের জন্যই অতীত হইয়াছে, তাহা কদাচ ফিরিয়া আসিতে পারে না; অতীত ঘটনা চিরদিনের জন্যই অতিবাহিত হইয়াছে, নূতন কালে নূতন ঘটনা ঘটে। তবে অতীত সম্বন্ধীয় কি বস্তু আসিয়া এই স্মৃতিব্যাপার সংঘটন করিল? অতীত সম্বন্ধীয় জ্ঞান—অতীত ঘটনার জ্ঞান—যাহা

অতীত ঘটনার সঙ্গে প্রবাহিত হয় নাই, বিনষ্ট হয় নাই, সেই প্রবাহশূন্য অবিনাশী জ্ঞানই বর্ত্তমানে পুনঃপ্রকাশিত হইয়া অতীত ও বর্ত্তমানকে সংযুক্ত করিল এবং স্মৃতি-ক্রিয়া সংঘটন করিল। পূর্ব্বে টেব্‌ল্‌টিকে প্রত্যক্ষ করিবার সময়ে যে বর্ণ স্পর্শাদির আবির্ভাবরূপ ঘটনা ঘটিয়াছিল, সেই সকল ঘটনা তখনই অতিবাহিত হইয়াছে, এখন নূতন ঘটনা ঘটিতেছে; কিন্তু সেই সকল ঘটনা অতিবাহিত হইবার সঙ্গে সঙ্গে যদি উহাদের জ্ঞানও বিনষ্ট হইয়া থাকিত, যদি উহাদের জ্ঞান স্থির প্রবাহাতীত থাকিয়া এখন পুনঃপ্রকাশিত না হইত, তবে পুরাতন ও নূতনের সাদৃশ্যজ্ঞান কদাচ সম্ভব হইত না, সুতরাং স্মৃতিরও উদ্রেক হইত না, এবং পুরাতত্বের জ্ঞানের অভাবে নূতনের নূতনত্ব-জ্ঞানও সম্ভব হইত না। সুতরাং পাঠক দেখিতেছেন অতীতের জ্ঞান সময়ে সময়ে আমাদের সসীম বিস্মৃতিশীল মনকে পরিত্যাগ করে বটে, আমাদের ব্যক্তিগত জীবন হইতে তিরোহিত হয় বটে, কিন্তু স্মৃতিরূপে ইহা পুনঃপ্রকাশিত হইয়া ইহার অবিনাশিত্বের পরিচয় দেয়। এক দিকে আমরা বিস্মৃতিশীল, আমরা ক্ষণে ক্ষণে জীবনের প্রায় সমস্ত ব্যাপার ভুলিয়া যাইতেছি; কিন্তু আমাদেরই মধ্যে, আমাদের জীবনের নিত্য আধার-রূপী, আমাদের প্রাণরূপী, এমন একজন আছেন যিনি কোন কথাই ভুলেন না এবং যিনি প্রয়োজনমত আমাদের বিস্মৃত কথা স্মরণ করাইয়া দেন। তিনি অতীতের জ্ঞান লইয়া আমাদের

ভিতরে পুনঃপ্রকাশিত না হইলে আমাদের জীবন একবারেই অসম্ভব হইত। স্মৃতিবিহীন জীবন জীবনই নহে, স্মৃতিবিহীন জ্ঞান জ্ঞানই নহে। চির-স্মৃতিশীলের স্মৃতি আমাদের স্মৃতিরূপে প্রকাশিত হয়, তাহাতেই আমাদের জীবন সম্ভব হয়। সর্ব্বজ্ঞ পুরুষের জ্ঞান আমাদের জ্ঞানরূপে প্রকাশিত হয়, তাহাতেই আমরা জ্ঞানী হই।

স্মৃতি-বিস্মৃতির বিষয় আলোচনা করিলে যেমন দেখা যায় যে আমাদের ব্যক্তিগত সসীম মন বিস্মৃতিশীল বটে, কিন্তু আমাদের জীবনাধার প্রাণস্বরূপ পরমাত্মা চির-স্মৃতিশীল, এবং আমাদের মনে তাঁহার স্মৃতির পুনঃপ্রকাশই আমাদের স্মৃতি,—তেমনি নিদ্রা ও জাগরণের বিষয় আলোচনা করিলে দেখা যায় যে আমাদের ব্যক্তিগত জীবন নিদ্রাশীল বটে, কিন্তু আমাদের প্রাণরূপী পরমাত্মা চির-জাগ্রত। নিদ্রাকালে আমাদের সমুদায় জ্ঞান তাঁহাতেই বর্ত্তমান থাকে, এবং নিদ্রাবসানে সেই সমস্ত সহকারে আমাদের প্রাণরূপে যে তাঁহার পুনঃপ্রকাশ, ইহারই নাম জাগরণ। সুষুপ্তিকে আপাততঃ সমস্ত জ্ঞানের—আত্মজ্ঞান ও বিষয়জ্ঞান উভয়ের—বিলয়াবস্থা, বিনাশাবস্থা, বলিয়া বোধ হয়। অজ্ঞান অচেতন না হইলে আর সুষুপ্তি কি হইল? আমাদের ব্যক্তিগত জীবনের পক্ষে এই কথাকে বিশেষ অত্যুক্তি বলা যাইতে পারে না; বস্তুতঃই আমাদের ব্যক্তিগত সসীম মন তখন অজ্ঞান অচেতন হইয়া পড়ে,—আমাদের ব্যক্তিগত জীবনের

সমস্ত জ্ঞান তখন তিরোহিত হয়, তাহা না হইলে সুষুপ্তির কোনও অর্থই থাকে না। কিন্তু আমাদের ব্যক্তিগত জীবনই যদি সর্ব্বেসর্ব্বা হইত, যদি চির-জাগ্রত পরমাত্মা আমাদের জীবনাধার-রূপে, প্রাণরূপে, বর্ত্তমান না থাকিতেন, তবে সুষুপ্তি ও মরণে, জাগরণ ও পুনর্জ্জন্মে, কিছুই প্রভেদ থাকিত না। তাহা হইলে আমাদের নিদ্রা আমাদের মৃত্যু হইত, জাগরণ পুনর্জ্জন্ম বা নবজন্ম হইত। সুষুপ্তিকালে আমাদের আত্মজ্ঞান ও বিষয়জ্ঞানের যে তিরোভাব হয়, সেই তিরোভাবই যদি বিলয় হইত, বিনাশ হইত, তবে নিদ্রাবসানে আমরা সম্পূর্ণ নূতন লোক হইয়া জাগ্রত হইতাম, অথবা—জাগরণ কথা এ স্থলে ঠিক খাটে না—সৃষ্ট হইতাম। সেস্থলে নিদ্রার পূর্ব্বকার আত্মজ্ঞান ও পরবর্ত্তী আত্মজ্ঞানে কোনও একত্ব থাকিত না; নিদ্রার পূর্ব্বে প্রত্যক্ষীভূত বস্তু ও নিদ্রার পরে প্রত্যক্ষীভূত বস্তুসমূহের মধ্যে কোনও একত্ব বা সাদৃশ্যবোধ থাকিত না। পূর্ব্ব-প্রকাশিত আত্মজ্ঞান ও পর-প্রকাশিত আত্মজ্ঞানের একত্ববোধ হইতে গেলে পূর্ব্ব-প্রকাশিত আত্মজ্ঞান বিলুপ্ত না হইয়া স্থির থাকা আবশ্যক এবং পর-প্রকাশিত আত্মজ্ঞানের সহিত পুনঃপ্রকাশিত হওয়া আবশ্যক; আত্মজ্ঞান একবার বিলুপ্ত হইলে, আর তাহা আসিতে পারে না। পরবর্ত্তী কালে যাহা আসিবে তাহা নূতন বস্তু। বিষয়-জ্ঞানের সম্বন্ধেও যে এই কথা ঠিক, তাহা পূর্ব্বেই দেখান হইয়াছে। সুতরাং নিদ্রাবসানে আমাদের আত্মজ্ঞান ও বিষয়-

জ্ঞান পুনঃপ্রকাশিত হওয়াতে ইহা নিঃসন্দিগ্ধরূপে সপ্রমাণ হয় যে আমাদের আত্মজ্ঞান ও বিষয়জ্ঞান সুষুপ্তিকালে আমাদের ব্যক্তিগত জীবনে প্রকাশিত হয় না বটে, কালের উপকরণরূপী ঘটনা-প্রবাহ সহকারে আবির্ভূত হয় না বটে, কিন্তু সেই সময়েও তাহা বিলুপ্ত হয় না, সেই সময়েও তাহা আমাদের প্রাণরূপী পরমাত্মাতে অক্ষুণ্ণরূপে বর্ত্তমান থাকে। আমরা যখন ঘোর নিদ্রায় অভিভূত থাকি, তখন পরমাত্মা চির-জাগ্রত থাকিয়া আমাদের জীবনের সমুদায় জ্ঞানকে ধারণ করিয়া থকেন, এবং নিদ্রাবসানে এই জ্ঞানসহকারে আমাদের প্রাণরূপে প্রকাশিত হইয়া জাগরণ-ব্যাপার সংঘটন করেন; ইহাতেই আমাদের আত্মজ্ঞান ও বিষয়-জ্ঞানের একত্ব—আমাদের সমগ্র অভিজ্ঞতা—সম্ভব হয়।

ঘটনার জ্ঞান যদি নিত্য বস্তুই হইল, তবে ইহাও স্পষ্টরূপে বুঝা যাইতেছে যে আমাদের ব্যক্তিগত জীবন আরম্ভ হইবার পূর্ব্বে যে সকল ঘটনা ঘটিয়াছে, সেই সকল ঘটনার জ্ঞানও পরমাত্মাতে স্থায়ী অপরিবর্ত্তনীয়রূপে বর্ত্তমান আছে। ইতিহাস ও জনশ্রুতি যে সকল ঘটনার সাক্ষ্য দেয়, নানা শ্রেণীর বিজ্ঞান যে অসংখ্য ঘটনা-শ্রেণীর তত্ত্ব আবিষ্কার করে, যে অতীত অতি পুরাতন কালের কথা বিজ্ঞানও কিছু বলিতে পারে না, সেই সময়ের অসীম ঘটনা-শ্রেণী,—এই সমুদায়েরই জ্ঞান অনাদি অনন্ত নিত্য জ্ঞানের বিষয়ীভূত হইয়া রহিয়াছে, তাহাতে সন্দেহ

নাই। যে নিত্য পুরুষ কাল-শৃঙ্খলের রচয়িতা, যে নিত্য জ্ঞানের সংযোগকারিণী শক্তিতে সমস্ত ঘটনা এক শৃঙ্খলে আবদ্ধ রহিয়াছে, তাঁহা হইতে একটী ক্ষুদ্রতম তত্ত্বও স্খলিত হইতে পারে না, তিনি এক মুহূর্ত্তের ঘটনাও বিস্মৃত হইতে পারেন না। সুতরাং স্পষ্টই প্রতীত হইতেছে যে ব্যক্তিগত জ্ঞানের নিকট জগতের অধিকাংশ অপ্রকাশিত থাকিলেও, ব্যক্তিগত জ্ঞান হইতে জগৎ ক্ষণে ক্ষণে তিরোহিত হইলেও, তাহা নিত্য জ্ঞানের বিষয়রূপে সর্ব্বদা বর্ত্তমান থাকে।

ঘটনা অস্থায়ী ও প্রবাহশীল হইলেও ঘটনার জ্ঞান যখন প্রবাহাতীত স্থায়ী বস্তু, তখন এতদ্দ্বারা আর একটী সত্য সপ্রমাণ হইতেছে। ইহা যখন প্রবাহাতীত স্থায়ী বস্তু, ইহাতে যখন কালের গন্ধ নাই, তখন বুঝা যাইতেছে যে ইহা যে কেবল ঘটনার পরং বর্ত্তমান থাকে তাহা নহে, ইহা ঘটনার পূর্ব্বেও বর্ত্তমান ছিল। ইহা ঘটনার সঙ্গে সঙ্গে প্রকাশিত হয় বটে, কিন্তু ঘটনার সঙ্গে ইহার উৎপত্তি নহে। ইহা ঘটনাকে উপলক্ষ করিয়া প্রকাশিত হয়, ঘটনা ইহার প্রকাশ, কিন্তু উৎপত্তি নহে; ঘটনার পূর্ব্বেও ইহা বর্ত্তমান থাকে। ইতিপূর্ব্বে আমরা ঘটনা ও ঘটনার জ্ঞানের যে প্রভেদ দেখাইয়াছি, তাহাতে স্পষ্টই বোঝা যাইতেছে যে ঘটনার জ্ঞান কেবল যে বিনাশ প্রাপ্ত হইতে পারে না, তাহা নহে, ইহা উৎপন্নও হইতে পারে না। যাহার প্রকৃতিতে প্রবাহশীলতা নাই, কালের গন্ধ নাই, তাহা কালে

উৎপন্নও হইতে পারে না, বিনষ্টও হইতে পারে না। সুতরাং বোঝা যাইতেছে যে অতীত কালে যত ঘটনা ঘটিয়াছে, সেই সকল ঘটনা ঘটিবার পূর্ব্বেই সেই সকল ঘটনার জ্ঞান নিত্য জ্ঞানস্বরূপ পরমাত্মাতে বিদ্যমান ছিল, এবং ভবিষ্যতে যত ঘটন ঘটিবে, সেই সমুদায়ের জ্ঞানও তাঁহাতে বর্ত্তমান আছে। আমরা তাঁহার অনন্ত জ্ঞানের অতি ক্ষুদ্র অংশ লাভ করিয়া এই পর্য্যন্ত বুঝিতে পারিতেছি যে অতীত কালে অসীম ঘটনা-প্রবাহ প্রবাহিত হইয়াছে এবং ভবিষ্যতে অসীম ঘটনা-প্রবাহ বহিতে থাকিবে। কিন্তু অতীত কালে কি কি ঘটনা ঘটিয়াছে তদ্বিষয় আমরা অতি অল্পই জানি, এবং ভবিষ্যতে কি কি ঘটিবে তদ্বিষয় আরো অল্প জানি। কিন্তু যিনি ঘটনার কারণ, যিনি কাল-শৃঙ্খলের রচয়িতা, তাঁহার পক্ষে কিছুই অজ্ঞাত থাকিতে পারে না; ভূত ভবিষ্যতের জ্ঞান তাঁহাতে বর্ত্তমানের ন্যায় উজ্জ্বলরূপে বিদ্যমান। তাঁহাকে ছাড়িয়া যখন কিছুই নাই, সমুদয় ঘটনা যখন তাঁহাকে অবলম্বন করিয়াই ঘটিয়াছে, ঘটিতেছে ও ঘটিবে, তখন তাঁহার অজ্ঞাত কিছুই থাকিতে পারে না। প্রাকৃতিক কার্য্যের অটল নিয়ম দেখিয়া বিজ্ঞান জীবোৎপত্তির পূর্ব্বকালীন্ ঘটনাসমূহের প্রকৃতি নির্ণয় করে, বর্ত্তমান জগতের শৈশব ও বাল্যাবস্থার বিবরণ লিপিবদ্ধ করে, এবং জগতের ভবিষ্যৎ অবস্থা সম্বন্ধে নিশ্চিত ভবিষ্যৎবাণী বলে। এই সকল অটল নিয়ম যাঁহার আত্ম-প্রকাশের প্রণালীমাত্র, এই সকল নিয়মানুসারে

যিনি অসংখ্য বিচিত্র বিজ্ঞান-সমন্বিত হইয়া আপনাকে চিন্ময় বিশ্বরূপে প্রকাশ করিতেছেন ও করিবেন, তাঁহার কাছে ভূত বর্ত্তমান ভবিষ্যৎ কিছুই অজ্ঞাত থাকিতে পারে না ; তিনি সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বদর্শী, পূর্ণ জ্যোতির্ম্ময় পুরুষ।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

সৃষ্টিরহস্য

আমরা এই অধ্যায়ের প্রথমাংশে বলিয়াছিলাম যে আমরা জ্ঞানের নিত্যত্ব সপ্রমাণ করিয়া মায়াবাদের ভ্রম প্রদর্শন করিব। সেই ভ্রম বোধ হয় এখন পাঠক বুঝিতে পারিয়াছেন। মায়াবাদ জ্ঞানের অদ্বৈত ও নিত্য ভাবের দিকে ঝোঁক্ দেয়, জ্ঞানের ভিতরে যে একটী চিরন্তন দ্বৈতভাব আছে এবং অনিত্যের সহিত সম্বন্ধ-রহিত নিত্য যে অর্থহীন, তাহা দেখে না। এই দুটী সত্য বুঝাইয়া আমরা মায়াবাদের ভ্রম দেখাইয়াছি। কিন্তু স্বীকার করা আবশ্যক যে মায়াবাদের ভ্রম দেখাইয়াও আমরা যে সৃষ্টিরহস্য সম্পূর্ণরূপে ভেদ করিতে পারিয়াছি, তাহা নহে। অনাদি অনন্ত সৃষ্টিপ্রবাহ অনাদি অনন্ত সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বাধার পরম পুরুষকে আশ্রয় করিয়া প্রবাহিত হইতেছে, এবং তিনিই জীবের প্রাণ, জীবের ক্ষুদ্র জ্ঞানৈশ্বর্য্য তাঁহারই অসীম জ্ঞানৈশ্বর্য্যের অনু-প্রকাশ, ইহা পরিষ্কাররূপেই বোঝা যাইতেছে। জগৎ ও জীব যে

ঈশ্বরের আশ্রিত আপেক্ষিক সত্য, ইহারা যে মিথ্যা নহে, অবিদ্যা-কল্পিত নহে, এই বিষয়ে আর কোন সন্দেহ নাই। কিন্তু নিত্য বস্তুতে অনিত্যের স্থিতি, অসীমের ভিতর সসীমের অস্তিত্ব যে আমরা স্পষ্টরূপে বুঝিতে পারিয়াছি তাহা বলিতে পারি না। সৃষ্টিব্যাপার এখনও আমাদের নিকট রহস্যময় রহিয়াছে, এবং জীব কখনও সম্পূর্ণরূপে এই রহস্য ভেদ করিতে পারিবে কি না এই বিষয়েও সন্দেহ আছে। রহস্যটা কি তাহা আমরা বুঝাইতেছি। আমরা বলিয়াছি যে ঘটনাপ্রবাহ অস্থির অনিত্য হইলেও ঘটনার জ্ঞান নিত্যরূপে পরমাত্মাতে বিদ্যমান আছে; ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্ত্তমান, সমুদায়ই তাঁহার জ্ঞানে বর্ত্তমান; যাহা কিছু ঘটিয়াছে তাহা তিনি ঘটিবার পূর্ব্বেই জানিতেন, এবং যাহা কিছু ঘটিবে তাহাও তিনি ঘটিবার পূর্ব্বেই জানেন। এখন কথা এই যে, তাহাই যদি হইল, তবে ঘটনার অর্থ কি? পরিবর্ত্তনের অর্থ কি? পরমাত্মার নিকট সমুদায়ই যদি চির-বর্ত্তমান, তবে ভূত ও ভবিষ্যতের অর্থ কি? কালেরই বা অর্থ কি? আমরা দেখিয়াছি যে ঘটনার অর্থ—জ্ঞানগোচর বস্তুর আবির্ভাব ও তিরোভাব। কিন্তু নিত্য জ্ঞানের পক্ষে আবির্ভাব-তিরোভাব সম্ভব নহে। তাঁহাতে সমুদায় চিরবর্ত্তমান, চির-প্রকাশিত। সুতরাং আবির্ভাব-তিরোভাব হইতে গেলেই জীব আবশ্যক। কেবল জীবের নিকটই, কেবল জীবের জ্ঞানময় জীবনরূপেই, পরমাত্মার নিত্য বিজ্ঞানের আবির্ভাব-তিরোভাব

সম্ভব। তাহা হইলে দাঁড়াইল এই যে সৃষ্টির অর্থ—ঘটনা বা পরিবর্ত্তনের অর্থ—পরমাত্মা হইতে জীবের উৎপত্তি, পরমাত্মাতে জীবের জীবন-প্রবাহের স্থিতি, এবং (সম্ভব হইলে) পরমাত্মাতে সেই প্রবাহের বিলয়। সমস্ত সৃষ্টিব্যাপারটা—সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয়—পরমাত্মার জীবলীলা,—সেই জীব মানবই হউক, আর মানব হইতে শ্রেষ্ঠ বা নিকৃষ্ট অন্য জীবই হউক। পাঠক প্রথম অধ্যায়ে দেখিয়াছেন দেশগত-জগতে অনাত্ম অচেতন বস্তু বলিয়া কোন বস্তু নাই, এই দ্বিতীয় অধ্যায়ে দেখিলেন কালগত জগতেও অনাত্ম অচেতন বস্তু বা সেরূপ বস্তুর পরিবর্ত্তন বলিয়া কোন ঘটনা নাই, সমুদায়ই চেতনলীলা, জীবলীলা, ঐশী লীলা, জড়জগৎ বা জড়জগতের পরিবর্ত্তন বলিয়া কিছু আছে, ইহা মনে করা কেবল অবিদ্যার ফল। মায়াবাদী যে জড়জগৎকে মিথ্যা অবিদ্যা-কল্পিত বলেন, তার একটা অর্থ বোধ হয় পাঠক এখন বুঝিতে পারিলেন। কিন্তু মায়াবাদী আরো বেশি দূর যান। তিনি বলেন সৃষ্টি আদৌ হয় নাই—সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয়, সমুদায় ঘটনা, সমুদায় পরিবর্ত্তন, অবিদ্যা-কল্পিত। আমরা দেখাইয়াছি যে সৃষ্টি কল্পিত নহে, অনাদি অনন্ত ঘটনাপ্রবাহ নিত্য পরমাত্মার আশ্রিত আপেক্ষিক সত্য। কিন্তু আমরা এই সৃষ্টিলীলার যে অর্থ করিলাম—পরমাত্মার জীবলীলা—এই অর্থ কি স্পষ্টরূপে আমাদের হৃদয়ঙ্গম হইতেছে? যাহা তাঁহাতে নিত্য-বর্ত্তমান, চির-প্রকাশিত, তাহা তিনি জীবের জীবনরূপে প্রকাশিত করেন,

তিনি নিত্য প্রকাশস্বরূপ হইয়াও আবার কাল-প্রবাহে আংশিক ভাবে প্রকাশিত হন, ইহা কি রহস্যময় ব্যাপার নহে? যিনি নিত্য তিনি নিত্য থাকিয়াও কিরূপে অনিত্য জগৎ ও জীবরূপে প্রকাশিত হন? যিনি সর্ব্বজ্ঞ তিনি সর্ব্বজ্ঞ থাকিয়াও কিরূপে জীবের জীবনে অল্পজ্ঞরূপে আবির্ভূত হন? তিনি যে এরূপ হন, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই; অনিত্য ও সসীমের সহিত সম্বন্ধ-বিহীন নিত্য ও অসীম যে অর্থহীন, তাহাও সত্য; তথাপি নিত্যের পক্ষে নিত্য থাকিয়াও অনিত্য হওয়া, সর্ব্বজ্ঞের পক্ষে সর্ব্বজ্ঞ থাকিয়াও অল্পজ্ঞ হওয়া, অসীমের পক্ষে অসীম থাকিয়াও সসীম হওয়া,—এই সমস্ত ব্যাপারে যেন একটা স্ববিরোধিতা আছে বলিয়া বোধ হয়। এই আপাত-স্ববিরোধিতাই সৃষ্টির রহস্য, এবং এই রহস্যভেদ করিতে না পারিয়াই মায়াবাদী সৃষ্টিব্যাপারকে অবিদ্যা-কল্পিত বলেন, এবং এই অবিদ্যার কারণ-রূপে পরমেশ্বরে 'মায়া' নাম্নী একটি শক্তি আরোপ করেন। এই শক্তি মিথ্যা ব্যাপারকে সত্য বলিয়া ভ্রম জন্মায়, এই জন্য ইহার নাম 'মায়া'। কিন্তু পরমেশ্বরে এই মায়াশক্তি আরোপে সৃষ্টিরহস্য কিছুই ভেদ করা হয় না। ভ্রম যদি প্রকৃত হয়, তবে জীবও প্রকৃত; জীব প্রকৃত না হইলে প্রকৃত ভ্রম হইবে কাহার? আর জীব প্রকৃত হইলে যে শক্তিতে জীবের উৎপত্তি বা প্রকাশ হয় তাহাকে আর 'মায়া' বলা যায় না। সুতরাং মায়াবাদের ভ্রম স্পষ্টই দেখা যাইতেছে। মায়াবাদ এতটুকু

সম্মানের উপযুক্ত যে ইহা স্বষ্টির রহস্য বুঝিতে পারে,—স্বষ্টি-ব্যাপার যে স্পষ্টরূপে বোধ্য নয়, তাহা বুঝিতে পারে। কিন্তু ইহার সেই রহস্যভেদের চেষ্টা বিফল, ইহার মীমাংসা—স্বষ্টিকে মিথ্যা বলিয়া সিদ্ধান্ত করা—স্পষ্টতঃই ভ্রান্ত। যাহা হউক, জীব যে মিথ্যা নহে, মায়িক নহে, ব্যাবহারিক নহে, জীবতত্ত্ব যে পারমার্থিক তত্ত্ব, এবং জীবের সহিত পরমেশ্বরের নৈতিক সম্বন্ধ—পরমেশ্বরের প্রেম ও পবিত্রতা—যে তাঁহার স্বরূপলক্ষণ, কেবল তটস্থ মায়িক লক্ষণ নহে, এই সকল কথা আমরা আমাদের তৃতীয় ও চতুর্থ অধ্যায়ে যথাসাধ্য বুঝাইতে চেষ্টা করিব।

তৃতীয় অধ্যায়

দ্বৈতাদ্বৈত-বিবেক

প্রথম পরিচ্ছেদ—ঈশ্বর অনন্ত, অদ্বিতীয়

জগতের আধাররূপী জ্ঞানবস্তু যে এক অখণ্ড,—জীবের জ্ঞান যে সেই অদ্বিতীয় জ্ঞানের অনুপ্রকাশ,—ইহা আমরা ইতিপূর্ব্বেই দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছি। এই অদ্বিতীয় জ্ঞানে যে একটি চিরন্তন দ্বৈতভাব রহিয়াছে, তাহাও দেখান হইয়াছে। যাহা হউক, আমরা এই অধ্যায়ে এই বিষয়ের একটু বিশেষ আলোচনা করিব।

আমরা প্রথম অধ্যায়ে দেখাইয়াছি যে দেশ একটি অনন্ত সংযোগের ব্যাপার। অনন্তরূপে বিভাজ্য অসীম অংশসমূহের সংযোগেই দেশের অস্তিত্ব এবং এই সংযোগকারিণী শক্তি জ্ঞান। ভিন্ন ভিন্ন অংশগুলি এক জ্ঞানের সমক্ষে এক কালে বর্ত্তমান থাকাতেই ইহারা সংযুক্ত হইতে পারিয়াছে। এক জ্ঞানের সমক্ষে ইহাদের বর্ত্তমান থাকার নামই ইহাদের সংযোগ। এই যে সংযোগের ব্যাপার দেশ; ইহা এক, অনন্ত। আমরা প্রত্যেকে এক কালে অতি ক্ষুদ্র দেশাংশ প্রত্যক্ষ করিতে পারি, এবং প্রত্যেকে এক কালে ভিন্ন ভিন্ন দেশাংশ প্রত্যক্ষ করি। কিন্তু আমরা জানি যে আমাদের প্রত্যেকের প্রত্যক্ষীভূত ক্ষুদ্র দেশাংশের বাহিরে আরো দেশ আছে, অনন্ত দেশ আছে।

আমরা ইতিপূর্ব্বেই দেখাইয়াছি যে দেশের জ্ঞান, দেশের চিন্তা, অপরিহার্য্য, দেশের অস্তিত্ব অবশ্যম্ভাবী। সুতরাং আমাদের প্রত্যক্ষ জ্ঞান ক্ষুদ্র সীমায় আবদ্ধ থাকিলেও আমরা নিশ্চয় জানি যে এই সীমার বাহিরে অনন্ত দেশ প্রসারিত। দেশ যেমন এক দিকে অনন্তরূপে বিভাজ্য, তেমনি ইহা অপর দিকে অনন্তরূপে সংযুজ্য (infinitely addible)। দেশের সীমা আছে ইহা আমরা ভাবিতে পারি না। ইহা যে আমরা ভাবিতে পারি না তাহা আমাদের কোন মানসিক দুর্ব্বলতার ফল নহে; দেশ ব্যাপারটাই অনন্ত সংযোগের ব্যাপার। অনন্ত সংযোগের ব্যাপার ভিন্ন ইহার আর কোন অর্থই নাই। এই বিষয়টি এত সহজ ও পরিষ্কার যে এই বিষয় অধিক বলা আমাদের আবশ্যক বোধ হইতেছে না। পাঠকের ইচ্ছা হইলে ভাবিয়া দেখিতে পারেন দেশের সীমা ভাবিতে পারেন কি না। দেশের সীমা ভাবিতে গেলেই এই ভাবিতে হইবে যে অমুক স্থানে দেশ শেষ হইয়াছে, তাহার অপর দিকে আর দেশ নাই। কিন্তু ইহাতে দেশের সীমা ভাবা হইল না। এই 'অপর দিকে' কথাটাতেই প্রকাশ পাইতেছে যে কল্পিত সীমার বাহিরেও দেশ আছে। দেশের সীমা ভাবা অসম্ভব, দেশের সীমা থাকা অর্থহীন অসম্ভব ব্যাপার। এই যে অনন্ত সংযোগের ব্যাপার দেশ, ইহাকে অনন্ত ভাবা যেমন অপরিহার্য্য, ইহাকে এক ভাবাও তেমনি অপরিহার্য্য। ভিন্ন ভিন্ন অংশের সংযোগেই,

—একত্বেই-দেশের অস্তিত্ব। এই সকল অংশের পরস্পরের মধ্যে ভেদ আছে, পার্থক্য নাই। দেশের কোন অংশের সহিত অপর কোন অংশ বিযুক্ত থাকিতে পারে না। দেশের দুই ভিন্ন ভিন্ন অংশ পরস্পর হইতে কোটী কোটী যোজন দূরবর্ত্তী হইতে পারে; কিন্তু তাহাদের মধ্যবর্ত্তী দেশাংশ বা দেশাংশসমূহ এই দুই অংশের সহিত ও পরস্পরের সহিত সংযুক্ত থাকিয়া এই দূরবর্ত্তী অংশদ্বয়কে সংযুক্ত করিয়া রাখিয়াছে। আমরা প্রত্যেকে এক কালে ভিন্ন ভিন্ন দেশাংশকে জানি বটে, কিন্তু এই সকল ভিন্ন ভিন্ন অংশও পূর্ব্বোক্ত প্রকারে পরস্পর সংযুক্ত রহিয়াছে। সমুদায় দেশ এক অখণ্ড অনন্ত মহাদেশের অন্তর্গত। এই এক অখণ্ড অনন্ত মহাদেশকে জানিতে গিয়া আমরা ইহার আধাররূপে এক অনন্ত জ্ঞানকে—অর্থাৎ যাঁহাকে নিজ জ্ঞান, নিজ আত্মবস্তু বলি, সেই জ্ঞানকেই—অবগত হই। এই অনন্ত জ্ঞান-শক্তিই এই অনন্ত সংযোগব্যাপারের কারণ। দেশ এক অনন্ত, ইহার প্রকৃত অর্থ—তিনি এক অনন্ত। দেশের অনন্তত্ব ও তাঁহার অনন্তত্ব একই সত্যের ভিন্ন ভিন্ন আকারমাত্র, একই ভাবের ভিন্ন ভিন্ন প্রকাশমাত্র। কালও যে এক অনন্ত, এবং এক অখণ্ড জ্ঞানবস্তুই যে এই এক অনন্ত কাল-শৃঙ্খলের রচয়িত, তিনি যে নিত্য ত্রিকালজ্ঞ, এই সত্য আমরা পূর্ব্বাধ্যায়ে বিশেষ করিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছি। এ স্থলে এই বিষয় আর কিছু বলিব না। আশা করি এখন দেশকাল সম্বন্ধে

ঈশ্বরের অনন্তত্ব ও তাঁহার অদ্বিতীয়ত্ব ও অখণ্ডত্বের মূল প্রমাণ পাঠক কথঞ্চিৎ পরিষ্কাররূপে বুঝিতে পারিলেন। পাঠক দেখিবেন যে ঈশ্বরের নিত্যত্ব বুঝিতে হইলে যেমন অনন্তকালের অসংখ্য ঘটনা জানিবার কোন প্রয়োজন নাই, এমন কি অধিক সংখ্যক ঘটনা জানিবারও প্রয়োজন নাই, কাল ও অনিত্যতা ব্যাপ্যারটা বুঝিলেই কালাতীত নিত্যবস্তুর ধারণা হয়, জ্ঞানবস্তু—আমাদের আত্মারূপী জ্ঞানবস্তু—যে নিত্য তাহা বোঝা যায়, তেম'ন ঈশ্বর যে অনন্ত, সর্ব্বাধার, ইহা জানিতে ও বুঝিতে গেলে সর্ব্বদেশস্থিত বস্তু জানিবার, এমন কি অধিক সংখ্যক বস্তু জানিবারও, কোন প্রয়োজন নাই; দেশের প্রকৃতি জানিলেই দেশাতীত অনন্ত বস্তুর প্রকৃতি জানা হয়। দুটি দেশখণ্ডের সম্বন্ধ বুঝিলেই বোঝা যায় যে, যে জ্ঞান এই দেশ দুটিকে সংযুক্ত করিয়া রাখিয়াছে তাহা দেশাতীত, এক, অখণ্ড, অনন্ত। যে আত্মা দুটি বস্তুকে পরস্পর ভিন্ন বলিয়া জানে, সে অভিন্নভাবে উভয়ের আধাররূপে বর্ত্তমান। ভেদটা আত্মার বাহিরে নহে, আত্মার ভিতরে। অভেদভাব মৌলিক, ভেদভাব অবান্তর। 'এথা' ও 'সেথা'কে যে জানে, সে 'এথা' ও 'সেথা' উভয়ে সমভাবে বিদ্যমান। 'দূর' ও 'নিকট'কে যে জানে সে 'দূর' 'নিকট' উভয়ে নির্ব্বিশেষভাবে বর্ত্তমান। ফলতঃ শরীরের পক্ষেই 'দূর' 'নিকট' অর্থযুক্ত, আত্মার পক্ষে 'দূর' 'নিকট'-এর কোন অর্থ নাই; 'দূর'ও 'নিকট' উভয়ই সমানভাবে আত্মাতে

প্রতিষ্ঠিত। সুতরাং পাঠক দেখিবেন আমরা দেশকে জানিতে গিয়া দেশের জ্ঞাতাকে, দেশের আধারকে, দেশাতীত বলিয়া জানি; দেশের প্রকৃতিতে যে ভেদের ভাব, খণ্ডের ভাব, ব্যবধানের ভাব, বহুর ভাব আছে, তাহা জানিতে গিয়া দেশের আধার জ্ঞানবস্তুকে—যাকে নিজ জ্ঞানবস্তু বলি সেই জ্ঞানবস্তুকেই—অভেদ, অখণ্ড, অব্যবহিত ও এক বলিয়া জানি। এই দ্বিবিধ জ্ঞান এমনভাবে জড়িত যে ইহাদিগকে পৃথক্ করা যায় না। এই দুই শ্রেণীর তত্ত্ব—ভেদ ও অভেদ, দ্বৈত ও অদ্বৈত, খণ্ড ও অখণ্ড, ব্যবহিত ও অব্যবহিত, বহু ও এক—জ্ঞানের ভিতরে এমন ভাবে সংমিলিত, যে কেবল ইহাদের মিলনেই জ্ঞান সম্ভব; ইহাদের একটিকে ছাড়িলে আর জ্ঞান সম্ভব হয় না। ভেদাভেদ, দ্বৈতাদ্বৈত,—জ্ঞানের মৌলিক অবশ্যম্ভাবী প্রকৃতি।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

ভেদের মূলে অভেদ

জ্ঞানবস্তুর মৌলিক একত্ব সম্বন্ধীয় উপরি-উক্ত প্রমাণ সকলের নিকট তৃপ্তিকর হইবে কি না, সন্দেহ। এই প্রমাণ সম্বন্ধে স্বভাবতঃই এই আপত্তি উঠিবে যে আমরা স্পষ্টই দেখিতেছি জ্ঞান বহু, প্রত্যেক জীবের আত্মা পরস্পর হইতে ভিন্ন ও পৃথক্; আমরা প্রত্যেকে স্বতন্ত্ররূপে জানিতেছি, বুঝিতেছি ও

চিন্তা করিতেছি ; এই স্পষ্ট পৃথকত্ব সত্ত্বে জ্ঞানের একত্বসম্বন্ধীয় প্রমাণ কি কেবল একটা দার্শনিক শিল্প-চাতুরী মাত্র নহে ? এই পুস্তকেরই প্রথম অধ্যায়ে কত বার স্বীকার করা হইয়াছে যে আমাদের প্রত্যেকের মন ভিন্ন ভিন্ন। তবে আর এখন কিরূপে বলা হইতেছে যে একই জ্ঞানবস্তু প্রত্যেক জীবের জীবনাধার রূপে, প্রাণরূপে, বর্ত্তমান ? আমরা যথাসাধ্য এই আপত্তির উত্তর দিতেছি। আমরা প্রত্যেকে যে ভিন্ন ভিন্ন রূপে জানিতেছি, একের বিজ্ঞান যে অপরের বিজ্ঞান নহে, একের স্মৃতি যে অপরের স্মৃতি নহে, এক জনের কার্য্য যে আর এক জনের কার্য্য নহে, তাহাতে আর সন্দেহ কি ? জগতের এই অসংখ্য বিচিত্রতা অস্বীকার করা আমাদের অভিপ্রায় নহে ; ইহা অস্বীকার করা কেবল নিতান্ত নির্ব্বোধ বা অন্ধ লোকের পক্ষেই সম্ভব। কিন্তু আমরা দেখাইতেছি যে এই অসংখ্য বিচিত্রতার মধ্যে একটি আশ্চর্য্য একতা রহিয়াছে। জীবের মন বুদ্ধি ভিন্ন ভিন্ন বটে, কিন্তু পরস্পরের সহিত অসংযুক্ত নহে ; সমুদায়ের মধ্যে এক আশ্চর্য্য যোগ, এক আশ্চর্য্য একতা, রহিয়াছে। সমুদায়ের মূলে একই জ্ঞানবস্তু বর্ত্তমান, কেবল এই তত্ত্বই এই একতার একমাত্র ব্যাখ্যা। জীবাত্মা সকল যদি পরস্পর হইতে পৃথক্ পৃথক্ হইত, তবে ইহা নিশ্চয় যে কোন আত্মা কোন আত্মাকে জানিতে পারিত না, কোন আত্মার সঙ্গে অপর কোন আত্মার কোন প্রকার যোগ সম্ভব হইত না।

কিন্তু আমরা দেখিতেছি জীব-জগতের মধ্যে আশ্চর্য্য যোগ বর্ত্তমান রহিয়াছে। জ্ঞানে, ভাবে, কার্য্যে জীব সকল পরস্পরের সহিত সংযুক্ত রহিয়াছে। আমার ও আমার সম্মুখস্থ বন্ধুর জীবনের মূলীভূত জ্ঞানবস্তু যদি মূলে এক না হইত, তবে তিনি যে আছেন, আমি তাহা কোন প্রকারেই জানিতে পারিতাম না। তাঁহার অস্তিত্বের কল্পনা পর্য্যন্ত আমার মনে উঠিত না; আমি আমার নির্জ্জন ও অর্গলবন্ধ জীবন-গৃহে আবদ্ধ থাকিতাম, আমার ব্যক্তিগত মানসিক অবস্থাসমূহই আমার জ্ঞানের একমাত্র বিষয় হইত। কিন্তু প্রকৃত কথা এই যে আমি তাঁহাকে জানিতেছি, তাঁহার মন বুদ্ধি ও আমার মন বুদ্ধি ভিন্ন হইলেও আমাদের মধ্যে আশ্চর্য্য জ্ঞানের যোগ চলিতেছে। আমি যে কেবল তাঁহার অস্তিত্ব জানিতেছি তাহা নহে, তাঁহার ও আমার মধ্যে চিন্তা ও ভাবের বিনিময় চলিতেছে। আমি আমার মনের ভাব প্রকাশ করিতেছি, তিনি তাহা জানিতেছেন, বুঝিতেছেন। তিনি তাঁহার মনের ভাব প্রকাশ করিতেছেন, আমি তাহা জানিতেছি, বুঝিতেছি; উভয়ের মধ্যে শ্রদ্ধা, প্রীতি, সহানুভূতি প্রভৃতি ভাবের কোলাকুলি চলিতেছে। এই সমুদায় ব্যাপার কিরূপে সম্ভব হইতেছে? আমি বাক্য উচ্চারণ করিতে গিয়া যে প্রয়াস করিতেছি, সেই প্রয়াস আমার ব্যক্তিগত কার্য্য। এই প্রয়াসের ফলরূপে আমি যে শব্দ শুনিলাম, সেই শব্দও আমার ব্যক্তিগত মনের ব্যক্তিগত বিজ্ঞান। আমার বন্ধুর মন আমার

ইচ্ছার করতলস্থ নহে, অথচ কি নিগূঢ় উপায়ে আমার প্রয়াসকে উপলক্ষ করিয়াই আমার অনুভূত শব্দের অনুরূপ শব্দ তাঁহারও মনে উৎপন্ন হইল এবং আমি যে অর্থ বুঝিলাম তিনিও সেই অর্থই বুঝিলেন, আমার মনে সুখ.দুঃখাদি যে ভাবের উদয় হইল, তাঁহার মনেও সেই ভাবের উদয় হইল! আত্মায় আত্মায় এই যে যোগ, এই যে চিন্তাও ভাবের বিনিময়, ইহার আর কোন যুক্তিযুক্ত ব্যাখ্যা হইতে পারে না; ইহার একমাত্র যুক্তিযুক্ত ব্যাখ্যা এই যে সংযুক্ত আত্মাদ্বয়ের মূলে একই জ্ঞানবস্তু বর্ত্তমান। ভিন্ন ভিন্ন বস্তুর সংযোগ বলিলেই এমন একটি বস্তুর অস্তিত্ব বুঝায় যাহা সংযুক্ত বস্তুসমূহের মধ্যে সাধারণ। আমার মনের চিন্তা, আমার মনের ভাব, যখন অন্যের চিন্তা, অন্যের ভাব হইয়া উঠিতেছে, তখন ইহা নিশ্চয় যে উভয় মনের মূলীভূত জ্ঞানবস্তু একই। একই জ্ঞান-শক্তি উভয়ের জীবনের মূলে বর্ত্তমান থাকিয়া উভয়কে একসূত্রে বন্ধন করিতেছে, উভয়কে এক তালে নৃত্য করাইতেছে। হয় বলিতে হইবে যে ভিন্ন ভিন্ন মনের মধ্যে কোন যোগ নাই, কোন সম্বন্ধ নাই, প্রত্যেকে কেবল আপনাতেই আবদ্ধ রহিয়াছে, জগতের বিচিত্র আধ্যাত্মিক সম্বন্ধনিচয় অসার মায়ামাত্র; নতুবা স্বীকার করিতে হইবে যে একই অনন্ত জ্ঞান-স্তু, এক অনন্ত পরমাত্মা, প্রত্যেক আত্মার প্রাণরূপে, প্রত্যেক মনের চিন্তা ও ভাবের, সাধারণ কারণরূপে, বর্ত্তমান থাকিয়া এই অসংখ্য বিচিত্র আধ্যাত্মিক সম্বন্ধ-লীলা রচনা করিতেছেন।

এই আধ্যাত্মিক সম্বন্ধের বিষয় পাঠক যতই ভাবিবেন ততই আশ্চর্য্যান্বিত হইবেন এবং ততই এই মহান্ বিশ্বাস দৃঢ়ীকৃত হইবে যে জগতের কোটী কোটী বিচিত্রতার মূলে একই জ্ঞানবস্তু বর্ত্তমান থাকিয়া সমুদায় বিচিত্রতা, সমুদায় দেশ, সমুদায় কালকে একসূত্রে বন্ধন করিতেছেন। এই আধ্যাত্মিক যোগ কেবল পরস্পরের সম্মুখস্থ ব্যক্তিদিগের মধ্যেই আবদ্ধ নহে; ইহা দেশের ব্যবধান মানে না, কালের ব্যবধান মানে না। পৃথিবীর অপর পৃষ্ঠ-নিবাসী ঋষি এমার্সন্ যে চিন্তা করিয়াছিলেন আমি সেই চিন্তার অংশভাগী হইতেছি। তাঁহার মানসিক কার্য্য ও আমার মানসিক কার্য্য সংখ্যায় ভিন্ন ভিন্ন, কিন্তু ইহা নিশ্চয় যে আমাদের উভয়ের চিন্তা মূলে এক। ইংলণ্ডের কবি টেনিসন যে ভাবে প্রণোদিত হইয়া গান করিতেছেন, * সেই ভাবের তরঙ্গ আমার প্রাণে আসিয়া লাগিতেছে; আমার প্রাণ সেই তরঙ্গে নৃত্য করিতেছে। তাঁহার হৃদয় ও আমার হৃদয়ের যোগ নিঃসন্দেহ। যে ঈশ্বর-স্তোত্রে অতি প্রাচীন আর্য্য ঋষির হৃদয় ভাবে মগ্ন হইয়াছিল, সেই স্তোত্র উচ্চারণ করিয়া আমার হৃদয় ভাবে আপ্লুত হইতেছে; আমি তাঁহার সহিত আধ্যাত্মিক যোগে আবদ্ধ হইতেছি। এইরূপে বুদ্ধের গম্ভীর যোগ, ঈশার জ্বলন্ত বিশ্বাস, প্লেটোর গভীর জ্ঞান, চৈতন্যের উচ্ছ্বসিত ভক্তি, আমার প্রাণের সমক্ষে আসিয়া আমার প্রাণকে আকর্ষণ করিতেছে,

---

* এই কথা লিখিত হইবার সময়ে কবিবর জীবিত ছিলেন।

আমাকে এই সকল দেশকালে অতি দূরবর্ত্তী মহাত্মাদিগের সহিত গাঢ় যোগে আবদ্ধ করিতেছে। হয় এই সকল সম্বন্ধ মিথ্যা, অর্থহীন; আর যদি তাহা না হয়, এই সকল সম্বন্ধ যদি কোন অর্থে প্রকৃত সম্বন্ধ হয়, এই সকল সম্বন্ধের যদি কোন অর্থ থাকে, তবে ইহা নিশ্চিত যে এক, অখণ্ড, সর্ব্বদেশ-ব্যাপী সর্ব্বজীবের প্রাণরূপী পরম জ্ঞানই এই সমুদায় সম্বন্ধের একমাত্র ব্যাখ্যা, এক মাত্র কারণ।

এই সত্যেরই আর এক দিক্ দেখুন, যে দিক্ আমরা এই অধ্যায়ের প্রথমাংশেই সংক্ষেপে দেখাইয়াছি। এক দিকে আমি দেশকালে আবদ্ধ ক্ষুদ্র জীবমাত্র; আমার প্রত্যক্ষ জ্ঞান অতি ক্ষুদ্র সীমায় আবদ্ধ। আমি এক কালে দেশ ও কালের অতি ক্ষুদ্র অংশমাত্র জানিতে পারি, এবং আমার সাক্ষাৎ ইন্দ্রিয়-বোধের বিষয় আমার ব্যক্তিগত বিজ্ঞান-নিচয় মাত্র। অথচ অপর দিকে আমিই আমার অনন্ত দেশকালকে জানিতেছি। অনন্ত দেশকালের অন্তর্গত বিশেষ বিশেষ তত্ত্ব আমি জানি না, সত্য বটে; কিন্তু এক অর্থে,—একটী প্রকৃত অর্থে—আমি অনন্ত দেশকালকে জানিতেছি। বিশেষ বিশেষ দেশের অন্তর্গত বিশেষ বিশেষ বস্তু, বিশেষ বিশেষ কালের অন্তর্গত বিশেষ বিশেষ ঘটনা, এই সমস্ত আমি সমগ্ররূপে জানি না সত্য বটে, এই সমস্ত আমার ব্যক্তিগত জীবনে প্রকাশিত হয় না সত্য বটে, কিন্তু দেশ কাল-সম্বন্ধীয় সাধারণ তত্ত্ব, যাহা সমুদয় জ্ঞানের মূল

তত্ত্ব, যে সকল তত্ত্ব সার্ব্বভৌমিক ও অনতিক্রমণীয়, সেই সকল তত্ত্ব আমি পরিষ্কাররূপে জানিতেছি। দেশ যে এক ও অনন্ত, ঘটনা-প্রবাহ যে অনন্ত, ভূত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমান সমুদয় ঘটনা যে এক অচ্ছেদ্য শৃঙ্খলে আবদ্ধ এবং জ্ঞানের একতাই যে সমুদায় সম্বন্ধের কারণ, এই সমুদয় অনতিক্রমণীয় মূলতত্ত্ব আমি নিশ্চিতরূপে জানিতেছি। এই সমস্ত মূলতত্ত্ব সমুদয় জ্ঞানের অপরিহার্য্য প্রকরণ। সুতরাং বিশেষ বিশেষ উপকরণ সম্বন্ধে জ্ঞান যতই কেন ভিন্ন হউক না, বিশেষ বিশেষ বিষয় সম্বন্ধে ভিন্ন ভিন্ন দেশে ভিন্ন ভিন্ন কালে জ্ঞান যতই ভিন্নরূপ ধারণ করুক্ না, জ্ঞানের সাধারণ আকার কি, প্রকরণ কি, তাহা আমি নিশ্চিতরূপে জানিতেছি। কেবল তাহাই নহে; আমি ভিন্ন ভিন্ন মনের ভিন্ন ভিন্ন চিন্তা ভাব এবং ইচ্ছাও অনেক পরিমাণে জানিতেছি; প্রত্যক্ষ বিজ্ঞান সম্বন্ধে ক্ষুদ্র দেশকালে আবদ্ধ হইয়াও বহু দূরদেশের এবং অতি প্রাচীন কালের তত্ত্ব অবগত হইতেছি। এতদ্দ্বারা স্পষ্টই বোঝা যাইতেছে যে আমারই মধ্যে ক্ষুদ্র ও মহতের, সসীম ও অসীমের, ব্যক্তিগত ভাব ও বিশ্বজনীনত্বের, আশ্চর্য্য সম্মিলন রহিয়াছে। আমি এক দিকে ক্ষুদ্র, সসীম, ব্যক্তিগত; কিন্তু আমারই মধ্যে এমন কিছু রহিয়াছে যাহা মূলে অতি মহান্, অসীম ও বিশ্বজনীন। সেই অসীম বস্তু আমার "উচ্চতর আমি" (higher self) রূপে, আমার পরম আত্মারূপে, বর্ত্তমান থাকাতেই আমি আমার ব্যক্তিগত ভাবকে

অতিক্রম করিতে পারিতেছি,—আমার ব্যক্তিগত জীবনের বহিরিস্থ তত্ত্ব-সমুদয় অবগত হইতে পারিতেছি, অনতিক্রমণীয় বিশ্বজনীন সত্যের অধিকারী হইতে পারিতেছি, ক্ষুদ্র হইয়াও অনন্তের সহিত সংযুক্ত হইতে পারিতেছি। যে কেবল সসীম, কেবল ব্যক্তিগত, সে আর কিছু উচ্চতর তত্ত্ব জানা দূরে থাকু, সে তাহার নিজের সসীমত্ব ও ব্যক্তিগত ভাব,—সে যে সসীম ও ব্যক্তিগত ইহাই—জানিতে পারে না। কিন্তু যে আপনাকে সসীম ও ব্যক্তিগত বলিয়া জানিয়াছে, সে এই জ্ঞানেই নিজের সসীমত্ব ও ব্যক্তিগত ভাব অতিক্রম করিয়াছে। যে আপনার বাহিরে যাইতে পারে, আপনার ব্যক্তিগত জীবনের অতিরিক্ত তত্ত্ব জানিতে পারে, অনতিক্রমণীয় সাধারণ বিশ্বজনীন সত্যের অধিকারী হইতে পারে, সে কেবল মাত্র সসীম নহে, কেবল মাত্র ব্যক্তিগত নহে; তাহার মধ্যে সসীম ও অসীম, ব্যক্তিগত ভাব ও বিশ্বজনীনত্ব, অচ্ছেদ্যভাবে বর্ত্তমান। আমরা একদিকে সসীম ও ব্যক্তিগত ইহা যতদূর সত্য, অপর দিকে ইহাও ততদূর সত্য যে আমাদের সসীম ও ব্যক্তিগত জীবনের আধার, কারণ ও আলোকরূপে অসীম ও বিশ্বজনীন জ্ঞানময় জ্যোতির্ম্ময় পুরুষ বর্ত্তমান। জ্ঞানমাত্রেরই এই চিরন্তন দ্বৈতাদ্বৈতভাব। প্রত্যেক জীবাত্মাই সেই অনন্ত জ্যোতির প্রকাশে জ্যোতির্ম্মান।*

---

* See Principal Caird's *Introduction to the Philosophy of Religion* the latter portions of Chaps. IV and V and portions of Chap. VIII.

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

দ্বৈতবাদ, অদ্বৈতবাদ ও দ্বৈতাদ্বৈতবাদ

পাঠক বোধ হয় ইতিমধ্যেই বুঝিতে পারিয়াছেন যে এই পুস্তকে যে ব্রহ্মবাদ প্রতিষ্ঠিত করিতে চেষ্টা করা হইল সেই ব্রহ্মবাদ প্রচলিত দ্বৈতবাদ ও অদ্বৈতবাদ উভয় হইতে ভিন্ন। যে দ্বৈতবাদ জীব ও ব্রহ্মকে পরস্পর হইতে সম্পূর্ণরূপে পৃথক্ বলিয়া কল্পনা করে, সে দ্বৈতবাদ প্রকৃত ব্রহ্মবাদ নহে; উহা এক প্রকার দেববাদ মাত্র। এই দ্বৈতবাদই যখন আবার বলে ঈশ্বর জগতের আধার, জীবের জীবনাধার, তখন ইহা স্পষ্টতঃই স্ববিরোধিতা দোষে দোষী হয়। জগৎ ও জীব যাঁহা হইতে পৃথক্‌ভাবে, স্বতন্ত্রভাবে, অবস্থিতি করে, তিনি কখনো জগৎ ও জীবের আধার হইতে পারেন না। এই দ্বৈতবাদ মূলে গভীর উপাসনা ও অধ্যাত্মযোগেরও বিরোধী। ঈশ্বর যদি আমার আত্মার বাহিরেই হইলেন, তবে আর তিনি আমার অন্তর্যামী অন্তর্দর্শী হইবেন কিরূপে? এবং আমার পক্ষে তাঁহার দর্শন শ্রবণ স্পর্শ, তাঁহার সহিত গভীর হৃদয়ের যোগ, কিরূপে সম্ভব? প্রচলিত দ্বৈতবাদ-বিশ্বাসীদিগের মধ্যে যাঁহারা তাদৃশ চিন্তাশীল নহেন, তাঁহাদের হৃদয়ে জীবাত্মা ও পরমাত্মার নিগূঢ় সম্বন্ধ-বিষয়ক উচ্চতর সত্যসমূহ অন্ধ বিশ্বাসের আকারে থাকিতে পারে, এবং তাঁহাদের জীবন গভীর আধ্যাত্মিক ধর্ম্মের সাধনে

তৎপর থাকিতে পারে। কিন্তু এই মতাবলম্বীদিগের মধ্যে যাঁহারা বিশেষরূপে চিন্তাশীল ও সূক্ষ্মদর্শী, তাঁহারা উক্ত গভীর সত্যসমূহ সম্বন্ধে যে বারবার সন্দিহান হইবেন এবং তাঁহাদের ধর্ম্মজীবনে যে গভীর যোগ-ভক্তির বিশেষ অভাব লক্ষিত হইবে, ইহা আমাদের নিকট স্বতঃসিদ্ধ বলিয়া বোধ হয়। অপর দিকে প্রচলিত অদ্বৈতবাদ, যাহা জ্ঞানের চিরন্তন দ্বৈত-ভাব স্বীকার করে না, ইহাকেও প্রকৃতপক্ষে ব্রহ্মবাদ বলা যাইতে পারে না। এই অদ্বৈতবাদ ব্রহ্মকে নির্ব্বিষয় বিষয়ী, অনিত্যের সহিত সম্বন্ধ-রহিত নিত্য বস্তু এবং সসীমের সহিত সম্বন্ধ-রহিত অসীম বলিয়া ব্যাখ্যা করে। ইহা মায়াবাদে অন্ধ হইয়া বিষয়, পরিবর্ত্তন ও সীমার প্রকৃতত্ব অস্বীকার করে। কিন্তু বিষয় হইতে পৃথক্ করিলে বিষয়ীর কোন অর্থ থাকে না। পরি-বর্ত্তনের সহিত সম্বন্ধ-রহিত হইলে অপরিবর্ত্তনীয়ের কোন অর্থ থাকে না। সীমার প্রকৃতত্ব অস্বীকার করিলে অসীমেরও কোন অর্থ থাকে না। বিষয়, পরিবর্ত্তন ও সীমা, এই সমুদায় আপেক্ষিক, তাহাতে আর সন্দেহ কি? ইহারা বিষয়ী, নিত্য ও অসীমের উপর নির্ভর করে, তাহাতে আর সন্দেহ কি? কিন্তু ইহারা আপেক্ষিক বলিয়াই অপ্রকৃত নহে, ইহারা অপেক্ষিকরূপেই প্রকৃত। প্রচলিত অদ্বৈতবাদ এই সমুদায়ের প্রকৃতত্ব অস্বীকার করিতে গিয়া ইহার ব্রহ্মকেও অর্থহীন করিয়া ফেলে। যিনি বিষয়, ঘটনা ও সসীমের সহিত

নির্লিপ্ত, অর্থাৎ যাঁহার সহিত বিষয়, ঘটনা ও সসীমের কোন অপরিহার্য্য অচ্ছেদ্য সম্বন্ধ নাই, এরূপ বস্তুকে ব্রহ্ম বলার কোন অর্থই নাই। ব্রহ্ম বলিতে আমরা এমন একটী মহাবস্তুকে বুঝি যিনি বিষয়, ঘটনা ও সসীমের আশ্রয় এবং ইহাদের আশ্রয় বলিয়াই ইহাদের হইতে ভিন্ন, ভেদযুক্ত। সুতরাং অদ্বৈতবাদের দ্বৈতভাব-রহিত অদ্বৈত ব্রহ্ম প্রকৃত ব্রহ্ম নহেন; যিনি দ্বৈতাদ্বৈতভাব-সমন্বিত, ভেদাভেদস্বভাব, যিনি বিষয়ের নিত্য আধাররূপী বিষয়ী, যিনি অনিত্য ঘটনার নিত্য কারণরূপী, যিনি সসীমের নিত্য আধাররূপী অসীম, তিনিই একমাত্র প্রকৃত ব্রহ্মবস্তু। বিষয়, পরিবর্ত্তন ও সসীম তাঁহার ঐশ্বর্য্যরূপে, বিভূতিরূপে, তাঁহাতে চিরবর্ত্তমান। বিষয় ও ঘটনা বিষয়ী ও নিত্যবস্তুর পক্ষে আপেক্ষিক হইয়াও প্রকৃত। ইহারা যে বিষয়ী ও নিত্যবস্তুর আশ্রিত হইয়া তাঁহাতে চিরবর্ত্তমান—বিষয়-জ্ঞান যে বিষয়ীতে নিত্যবর্ত্তমান, এবং ঘটনা-প্রবাহ যে অনাদি অনন্ত, তাহা আমরা ইতিপূর্ব্বেই দেখাইয়াছি; এখন অসীম জ্ঞানের আশ্রয়ে সসীম জ্ঞানের প্রকৃত অস্তিত্ব সম্বন্ধে ২।১টী কথা বলিব। এই যে আমার জ্ঞান, যাহা আমার জীবনের সার বস্তু, এই জ্ঞান যে অনন্ত জ্ঞানেরই প্রকাশ, তাহাতে আর সন্দেহ কি? কিন্তু ইহা অনন্ত জ্ঞানেরই প্রকাশ, ইহা যেমন নিঃসন্দেহ, এই জ্ঞান যে আংশিক, ইহা যে পরিমিত, তাহাও তেমনি নিঃসন্দেহ।

অনন্ত জ্ঞানের সহিত ইহার অভেদ যেমন সত্য, অনন্ত জ্ঞানের সহিত ইহার ভেদও তেমনি সত্য। ইহার আংশিকত্ব ও সসীমত্ব প্রকৃত বিষয়, কল্পিত বিষয় নহে, অবিদ্যা-সম্ভূত নহে। আমি যে ভ্রমবশতঃ আমার জ্ঞানকে সসীম মনে করিতেছি তাহা নহে; এই সসীমত্ব প্রকৃত অনতিক্রমণীয় বিষয়। আমার জ্ঞান অনন্ত জ্ঞানের সহিত এক, ইহা জানিয়াও, ইহা সম্পূর্ণরূপে স্বীকার করিয়াও, আমাকে বাধ্য হইয়া বলিতে হইতেছে যে আমার জ্ঞান অনন্ত জ্ঞানের আংশিক প্রকাশমাত্র। আমি যে এখন এই গৃহে উপাবিষ্ট থাকিয়া কেবল এই গৃহের বস্তুসমূহকেই জানিতেছি, এই গৃহের বহিরস্থ বস্তু সকলকে জানিতেছি না, অন্য নানা বিষয়ে যে আমার জ্ঞান পরিমিত, আমি যে কতকগুলি নির্দ্দিষ্ট কার্য্যমাত্র করিতে পারি, অপর অনেকগুলি কার্য্য করিতে পারি না, আমি যে কয়েকটী নির্দ্দিষ্ট লোককে মাত্র ভালবাসিতে পারি, সকলকে ভালবাসিতে পারি না, আমার অর্জ্জিত সাধুতা যে অপূর্ণ, পূর্ণ নহে, আমার দোষ যে অসংখ্য, এই সমস্ত বিষয় অবিদ্যা-জ[illegible] কল্পনা নহে, এই সমস্ত সত্য বিষয়; অর্থাৎ সংক্ষেপে বলিতে গেলে—সসীমের অস্তিত্ব নিঃসন্দেহ। আরও, আমার এই জীবন বিশেষ কালে প্রকাশিত হইয়াছে বটে, কিন্তু ইহা যে অনন্ত জ্ঞানের আশ্রয়ে সর্ব্বদা বর্ত্তমান ছিল, ইহাও নিঃসন্দেহ। সুতরাং অনন্ত জ্ঞান অসীম অদ্বিতীয় পূর্ণ হইয়াও তাঁহার মধ্যে

সমুদায় দ্বৈত জগতের সসীমতা, অপূর্ণতাও বিচিত্রতা নিত্যরূপে ধারণ করিয়া আছেন। অদ্বৈতবাদের দ্বৈতভাব-রহিত নিষ্ক্রিয় নির্লিপ্ত অসীম প্রকৃত অসীম নহেন। প্রকৃত অসীম তিনিই যিনি সমুদায় সসীমের আধার ও কারণ, অথচ সমুদায় সীমার অতীত। অসীমের ভিতরে সসীমের অবস্থিতি যে রহস্যময়, সম্পূর্ণরূপে বোধগম্য নহে, তাহা আমরা ইতিপূর্ব্বেই দেখাইয়াছি, এবং সসীমকে মিথ্যা বলিলে আর ঈশ্বরের সৃষ্টিশক্তিকে "মায়া" বলিলে যে সেই রহস্যভেদ হয় না, তাহাও দেখাইয়াছি। মায়াবাদীর মতে জীবের জীবত্ব বা সসীমত্ব ব্যাবহারিক মাত্র, পারমার্থিক নহে, অর্থাৎ অবিদ্যার ভূমির উপর দাঁড়াইলেই উহাকে সত্য বলিয়া বোধ হয়, জ্ঞানের ভূমির উপর দাঁড়াইলে দেখা যায় উহা সত্য নহে, কেবল এক অনন্ত অভেদ পরব্রহ্মই সত্য। এই সিদ্ধান্তের ভ্রম আমরা ইতিপূর্ব্বেই দেখাইয়াছি; কিন্তু এই বিষয়ে এস্থলে আরো কয়েকটী কথা বলিলে হয়ত বিষয়টা আর একটু পরিষ্কার হইতে পারে। মায়াবাদী বলেন জীবভাব অবিদ্যাকল্পিত; কিন্তু তাঁহাকে জিজ্ঞাস্য এই—অবিদ্যা কাহার? জ্ঞানময় পরব্রহ্মে অবিদ্যা থাকিতে পারে না, অথচ অবিদ্যা বা ভ্রম নিশ্চয়ই আছে, সুতরাং অবিদ্যা বা ভ্রমের আশ্রয় অসীম জীবও আছে। অবিদ্যা অভাবাত্মিকা, এসম্বন্ধে কোন সন্দেহ নাই, কিন্তু অভাবরূপে ইহার অস্তিত্ব যখন নিঃসন্দেহ, আর অনন্ত পূর্ণ পুরুষে যখন অভাব থাকিতে পারে না, তখন

অবিদ্যাগ্রস্ত—অভাবগ্রস্ত—জীব যে আছে, পূর্ণ পুরুষের আশ্রয়েই আছে, ইহাতে কিছু মাত্র সন্দেহ থাকিতে পারে না। সুতরাং সৃষ্টিরহস্য ভেদ করিতে না পারিয়াও,—অসীমের ভিতরে কিরূপে সসীম ভেদাভেদভাবে বর্ত্তমান, তাহা পরিষ্কাররূপে বুঝাইতে না পারিয়াও—আমরা এই নিঃসন্দিগ্ধ সিদ্ধান্তে উপনীত হইতেছি যে জীবের অস্তিত্ব ব্যাবহারিক নহে, অবিদ্যা-কল্পিত নহে, ইহা পারমার্থিক। জীব সত্য—কেবল প্রাতিভাসিকভাবে সত্য নহে—প্রকৃতরূপেই সত্য, ব্রহ্মের আশ্রয়ে সত্য। অভাবের দিক্ হইতে যেমন অবিদ্যা, ভাবের দিক্ হইতে তেমনি প্রেমও পুণ্য, এই সিদ্ধান্তের পোষক। প্রেম ও পুণ্য ভেদব্যঞ্জক, সম্বন্ধব্যঞ্জক। এক ব্যক্তি অপর ব্যক্তিকে প্রেম করে, এক ব্যক্তি অপর ব্যক্তির প্রতি ন্যায় ব্যবহার করে। জগতে যখন প্রেমপুণ্য আছে, তখন নিশ্চয়ই জগৎ নিরবচ্ছিন্ন অভেদাত্মক নহে, ইহার মধ্যে অবশ্য ভেদও আছে। যাঁহারা প্রেমপুণ্যের প্রকৃত অস্তিত্ব স্বীকার করেন তাঁহারা ইহা-দের মধ্যে দ্বৈতাদ্বৈতবাদের—ভেদাভেদবাদের—অকাট্য প্রমাণ পাইবেন। তাঁহারা দেখিবেন পিতা-পুত্র, স্বামী-স্ত্রী প্রভৃতি সর্ব্ববিধ প্রেমের সম্বন্ধে ভেদ ও অভেদ উভয়ই অপরিহার্য্যরূপে বর্ত্তমান; কেবল ভেদ বা কেবল অভেদে এই সকল সম্বন্ধ সম্ভব নহে। তেমনি দেখিবেন, সত্য, ন্যায়, আনুগত্য প্রভৃতি নৈতিক সম্বন্ধের ভিতরেও এই ভেদাভেদ ভাব বর্ত্তমান। অদ্বৈতবাদী

এই সকল সম্বন্ধকে অবিদ্যা-মূলক বলিতে পারেন; কিন্তু অবিদ্যায় গিয়া তাঁহাকে ঠেকিতে হইবে। অবিদ্যা যে ভেদের অকাট্য প্রমাণ, তাহা ইতিপূর্ব্বেই দেখান হইয়াছে। সুতরাং দ্বৈতবাদ নহে, অদ্বৈতবাদও নহে, দ্বৈতাদ্বৈতবাদই পারমার্থিক সত্য।

এখন দ্রষ্টব্য এই যে প্রচলিত অদ্বৈতবাদে যে সকল আধ্যাত্মিক বিপদ দেখিতে পাওয়া যায়, আমাদের ব্যাখ্যাত দ্বৈতাদ্বৈতবাদে সেই সকল বিপদের আশঙ্কা নাই। সসীম আত্মা আপনার অজ্ঞানতা, অপ্রেম ও অপবিত্রতা অনুভব করিয়া এবং আপনারই অভ্যন্তরে আপন প্রাণরূপে, আশ্রয়রূপে, অনন্ত জ্ঞান, অনন্ত প্রেম ও অনন্ত পবিত্রতার আধার পরম পুরুষকে বর্ত্তমান জানিয়া, চিরকালই প্রীতি-ভক্তিভরে তাঁহার উপাসনা করিবে, জ্ঞান প্রীতি ও পবিত্রতার পিপাসায় আকুল হইয়া তাঁহার নিকট প্রার্থনা করিবে এবং তাঁহার সহিত দিন দিন গভীর হইতে গভীরতর আধ্যাত্মিক যোগে আবদ্ধ হইতে থাকিবে। উপাসনা ও আধ্যাত্মিক জীবনের পক্ষে দুটী হেতু থাকা আবশ্যক। প্রথমতঃ, উপাসককে উপাসকের অন্তরের গভীরতম প্রদেশে থাকা আবশ্যক, উপাস্য উপাসকের মধ্যে অচ্ছেদ্য যোগ থাকা আবশ্যক, উপাসককে উপাস্যের সম্পূর্ণ আশ্রিত থাকা আবশ্যক। দ্বিতীয়তঃ, উপাস্য উপাসকের মধ্যে সুস্পষ্ট ভিন্নতা থাকা আবশ্যক, উপাস্যকে উপাসক হইতে অনন্তগুণে মহৎ হওয়া আবশ্যক। প্রচলিত দ্বৈতবাদ প্রথম হেতুর বিরোধী। যখন

উপাসক উপাস্যকে বলেন "তুমি আমার প্রাণ, তুমি আমার অন্তরাত্মা, তোমাকে ছাড়িয়া আমি এক মুহূর্ত্তও থাকিতে পারি না, আমি তোমাকে ছাড়িয়া কিছুই নই," তখন প্রচলিত দ্বৈতবাদ এই উচ্চ ভাবে বাধা দেয়; ইহা বলে "তা কেন? আমি ঈশ্বরের সৃষ্ট বটে, কিন্তু ঈশ্বর হইতে পৃথক্, স্বতন্ত্র; 'জীব তাঁহাকে ছাড়িয়া এক মুহূর্ত্ত থাকিতে পারে না' এই কথা বলিলে জীবের স্বাধীনতা অস্বীকার করা হয়"। এইরূপে যখনই জীব ও ব্রহ্মের অচ্ছেদ্য যোগ-সূচক কোন উচ্চ তত্ত্ব উচ্চারণ করা যায়, যখনই জীবের প্রেম, পবিত্রতা, ও শক্তিকে ব্রহ্মের প্রেম, পবিত্রতা ও শক্তির অনুপ্রকাশ বলিয়া ব্যাখ্যা করা যায়, তখনই প্রচলিত দ্বৈতবাদ এরূপ ব্যাখ্যার ভিতরে অদ্বৈতবাদের গন্ধ পাইয়া ইহার প্রতিবাদ করে, এবং উচ্চতর বিশ্বাস ও সাধন হইতে দূরে পড়িয়া থাকে। অপর দিকে, প্রচলিত অদ্বৈতবাদ উপরি-উক্ত দ্বিতীয় হেতুর বিরোধী। যখনই উপাসক নিজের হীনতা ও উপাস্য দেবতার মহত্ত্ব অনুভব করিয়া তাঁহার চরণতলে উপস্থিত হন, ভক্তিভরে তাঁহার অনন্ত গুণরাশি কীর্ত্তন করেন, এবং দীনতায় অবনত হইয়া বলেন "আমি নয়ন, তুমি জ্যোতিঃ, আমি অপ্রেমিক, তুমি প্রেমিক, আমি পাপী, তুমি পুণ্যময়, আমাকে মোহ হইতে মুক্ত কর, পাপ হইতে উদ্ধার কর, আমাকে তোমার প্রেমিক দাসানুদাস করিয়া রাখ," তখন প্রচলিত অদ্বৈতবাদ অসীম ও সসীমের অনন্ত ভেদ সম্বন্ধে

অন্ধতাবশতঃ এই মধুর দ্বৈতভাবের রহস্য ভেদ করিতে না পারিয়া ইহার ভিতরে কেবলই ভাবুকতা ও অজ্ঞানতা দেখিতে পায়। ইহা বলে "সবই ব্রহ্ম, কে কার উপাসনা করে?" যে অধ্যাত্মবাদ জ্ঞানের একত্ব অথচ চিরন্তন দ্বৈতভাব ও বিচিত্রতা দেখিতে পাইয়াছেন, কেবল সেই দ্বৈতাদ্বৈতবাদী আধ্যাত্মবাদই গম্ভীর ধর্ম্মসাধনের প্রকৃত ভিত্তি। এই দ্বৈতাদ্বৈতবাদ উপাসকের ভিতরে উপাস্যকে দেখিতে পান, উপাস্যের ভিতরে উপাসককে দেখিতে পান; শিষ্যের ভিতরে গুরুকে দেখিতে পান, গুরুর ভিতরে শিষ্যকে দেখিতে পান; ভক্তের ভিতরে ভগবানকে দেখিতে পান; ভগবানের ভিতরে ভক্তকে দেখিতে পান। যিনি উপাস্য, যিনি অনন্ত গুণশালী ভগবান্, তিনিই উপাস্যের প্রাণরূপে বর্ত্তমান। বিশ্বাস, প্রীতি, দীনতা, ব্যাকুলতা প্রভৃতি যে সকল বস্তু উপাসনার উপকরণ, এই সমুদায় তিনি স্বয়ংই উপাসকের প্রাণে সঞ্চারিত করেন; উপাসক তাহার অনুপ্রাণন ব্যতীত উপাসনার পথে এক পাও অগ্রসর হইতে পারেন না। সুতরাং ইহা সুস্পষ্ট যে যিনি উপাস্য তিনিই উপাসনার মূল কারণ, উপাসনাতে তাঁহার কর্ত্তৃত্ব অপরিহার্য্য। কিন্তু অপর দিকে দ্বৈতভাব ব্যতীত প্রকৃত উপাসনা সম্ভব নহে। পূর্ণে অপূর্ণে মিলন ও পরস্পরের সম্বন্ধেই উপাসনার উৎপত্তি; সুতরাং উপাসক উপাস্যে জীবিত হইয়াও, উপাস্যকর্ত্তৃক অনুপ্রাণিত হইয়াও, উপাস্য হইতে ভিন্ন।

উপাসকের আকাঙ্ক্ষাও কর্ত্তৃত্ব উপাস্য হইতে প্রাপ্ত—উপাস্যের আশ্রিত—হইলেও তাঁহা হইতে ভিন্ন, এবং এই অর্থেই—স্বাধীন। এই উপাসনা ব্যাপারে দ্বৈতভাব ও অদ্বৈতভাব উভয়ের আশ্চর্য্য সম্মিলন। কেবল দ্বৈতবাদের উপর দাঁড়াইয়া উপাসনা হয় না, কেবল অদ্বৈতবাদের উপর দাঁড়াইয়াও উপাসনা হয় না; দ্বৈতাদ্বৈতবাদই উপাসনার প্রকৃত ভিত্তি। মীমাংসার দিক্ হইতেই দেখা যাক্, আর সাধনের দিক্ হইতেই দেখা যাক্, দ্বৈতবাদ ও অদ্বৈতবাদ উভয়ই সত্যের একদেশ-দর্শী। দ্বৈতবাদও পূর্ণ সত্য নহে, অদ্বৈতবাদও পূর্ণ সত্য নহে; দ্বৈতাদ্বৈতবাদে দ্বৈতভাব ও অদ্বৈতভাবের মিলনই প্রকৃত পূর্ণ সত্য। সত্য ধর্ম্ম অবন্তীনগরের সেই দুই পৃষ্ঠ দুই বর্ণযুক্ত ঢালের ন্যায়। ইহার এক দিকে দ্বৈতভাব, অপর দিকে অদ্বৈতভাব।

চতুর্থ অধ্যায়

পূর্ণাপূর্ণ-বিবেক

প্রথম পরিচ্ছেদ—ঈশ্বর পূর্ণ প্রেম ও পূর্ণ পবিত্রস্বরূপ

ঈশ্বর যে সত্যস্বরূপ, তিনি যে সমুদয় বস্তুর আধার ও কারণ; তিনি যে জ্ঞানস্বরূপ, সর্ব্বজ্ঞ, প্রত্যেক জীবের অন্তর্যামী; তিনি যে অনন্তস্বরূপ, অনন্ত দেশকালের আধার; তিনি যে অদ্বিতীয় অখণ্ড, অথচ চিরন্তন দ্বৈতভাবসম্পন্ন, ঈশ্বরের এই সমুদায় স্বরূপ, অর্থাৎ যে সকল স্বরূপকে পাশ্চাত্য ব্রহ্মবিদ্যার ভাষায় দার্শনিক স্বরূপ (metaphysical attributes) বলা হয়,—সেই সকল স্বরূপ আমাদের সাধ্যানুসারে, এবং এই ক্ষুদ্র পুস্তকে যতদূর সম্ভব, আমরা ব্যাখ্যা করিতে চেষ্টা করিলাম। এখন ঈশ্বরের নৈতিক স্বরূপ (moral attributes) সম্বন্ধে, অর্থাৎ ঈশ্বর যে পূর্ণ প্রেম ও পূর্ণ পবিত্রতার আধার এই সম্বন্ধে, কিঞ্চিৎ আলোচনা করিব। এই বিষয়ের আলোচনা আমাদের ইচ্ছানুরূপ দীর্ঘ হইবে না, অনেকটা সংক্ষিপ্ত হইবে। তাহার কারণ এই যে এই বিষয়ে বিস্তৃতভাবে আলোচনা করিতে হইলে নীতির ভিত্তি সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ দার্শনিক আলোচনা করা আবশ্যক। কিন্তু নীতিবিজ্ঞান সম্বন্ধীয় বিশেষ আলোচনা এই ক্ষুদ্র পুস্তকের উদ্দেশ্যের মধ্যে নহে।* নীতির ভিত্তি

* On this subject see the author's *Philosophy of Brahmaism*, Lecture vii : Conscience and the Moral Law.

সম্বন্ধে আলোচনা না করিয়া যত দূর সম্ভব, এবং এই পুস্তকের ক্ষুদ্রতার দিকে দৃষ্টি রাখিয়া, এই বিষয় কিঞ্চিৎ আলোচনা করিব। নীতির মূলসূত্রসমূহ কি প্রণালীতে আমাদের জ্ঞানে প্রকাশিত হয়, এই বিষয়ে মতদ্বৈধ সত্ত্বেও যাঁহারা এই সাধারণ বিশ্বাস পোষণ করেন যে নীতি প্রকৃত বস্তু, কর্ত্তব্য কেবল সুখান্বেষণ মাত্র নহে, ইহা একটী উচ্চতর বস্তু, প্রেম-অপ্রেম ও পাপ-পুণ্যের প্রভেদ একটী প্রকৃত প্রভেদ,—আশা করি তাঁহাদের নিকট এই আলোচনা অনেক পরিমাণে তৃপ্তিকর হইবে। ঈশ্বর-তত্ত্ব নির্ণয় করিতে গিয়া আমরা পূর্ব্ব পূর্ব্ব অধ্যায়ে যে প্রণালী অবলম্বন করিয়াছি, এই অধ্যায়েও সেই প্রণালীই অবলম্বন করিব। ঈশ্বরের দার্শনিক স্বরূপই আলোচনা করা যাক্, আর নৈতিক স্বরূপই আলোচনা করা যাক্, আত্ম-জ্যোতিতেই ব্রহ্ম-জ্যোতির উজ্জ্বলতম প্রকাশ। অন্তরে যেমন তাঁহার সত্য, জ্ঞানও অনন্ত স্বরূপের উজ্জ্বল প্রমাণ, তেমনি অন্তরেই তাঁহার পূর্ণ মঙ্গলভাব ও পূর্ণ পবিত্রতার উজ্জ্বল প্রমাণ বর্ত্তমান। যে সকল ধর্ম্মবিজ্ঞানবিৎ অন্তরের আলোকের দিকে না চাহিয়া কেবল বহির্জগতের ঘটনাবলী দৃষ্টে ঈশ্বরের পূর্ণ মঙ্গলস্বরূপ ও পূর্ণ পবিত্রতা সপ্রমাণ করিতে প্রয়াস পান, তাঁহারা নিতান্তই স্থূলদর্শী; এবং তাহাদিগকে অনিবার্য্যরূপেই বিফলকাম হইতে হয়। কেবল বাহিরের ঘটনাবলী হইতে ঈশ্বরের পূর্ণ মঙ্গলস্বরূপ ও পূর্ণ পবিত্রতা সপ্রমাণ করা অসম্ভব।

জগতে সুখ ও শৃঙ্খলা দেখিয়া জগৎপতির প্রেম ও পবিত্রতা সম্বন্ধে যে সিদ্ধান্ত করা হয়, জগতে দুঃখ, অপূর্ণতা ও শৃঙ্খলার অভাব দেখিলে সে সিদ্ধান্ত নিশ্চয়ই বিচলিত হইবে। বিশ্বাসী যে শত শত দুঃখ ভুগিয়াও, দেখিয়াও, বিশ্বাস করেন যে ঈশ্বর দয়াময়,—অন্তরে ও বাহিরে শত শত পাপ অত্যাচার দেখিয়াও বিশ্বাস করেন যে ঈশ্বর পুণ্যবান্, তাহা বাহিরের ঘটনা দেখিয়া নহে; তাঁহার বিশ্বাসের ভিত্তি অন্তরের আলোক। এই আন্তরিক প্রমাণ কিরূপ দেখা যাক্। আমি যতই অপ্রেমের কার্য্য, পাপ কার্য্য, করি না কেন, আমার মধ্যে এমন কিছু আছে যাহা সর্ব্বদাই প্রেমিক ও পবিত্র থাকে। উহা সর্ব্বদা প্রেমিক ও পবিত্র থাকে বলিয়াই আমি আমার এবং অন্যের অপ্রেমকে অপ্রেম বলি, পাপকে পাপ বলি। ইহাই সমুদায় প্রেম-অপ্রেমের, সমুদায় পুণ্য-পাপের, বিচারক। ইহাই মানুষকে প্রেমিক বলে, অপ্রেমিক বলে; পাপী বলে, পুণ্যবান্ বলে; এবং ইহাই তাহাকে এক পূর্ণ প্রেম ও পূর্ণ পবিত্রস্বরূপ পুরুষে বিশ্বাস করিতে বাধ্য করে। এই বিশ্বাস ইহার প্রকৃতি-নিহিত, কারণ ইহার নিজস্বরূপ নিরবচ্ছিন্ন প্রেম-পবিত্রতাতে গঠিত। বস্তুতঃ ইহা সেই পূর্ণ পুরুষের সাক্ষাৎ প্রকাশ। ধর্ম্মসাহিত্যে ইহাই "বিবেক," বা ঈশ্বরবাণী," বলিয়া বর্ণিত হয়। এই পূর্ণ প্রেম ও পূর্ণ পবিত্রতা-সমন্বিত চিদ্‌বস্তু মানুষ মাত্রেরই 'পরম আত্মা' "উচ্চতর আমি" (Higher Self)

রূপে বর্ত্তমান। 'সত্য পালনীয়, অসত্য বর্জ্জনীয়, সত্য সুন্দর মহান্, অসত্য কুৎসিৎ, নীচ'; 'ন্যায় ব্যবহার কর্ত্তব্য, অন্যায় বর্জ্জনীয়', 'প্রেম স্বর্গীয় বস্তু, অপ্রেম নারকীয়, প্রেম ও অপ্রেমে অনতিক্রমণীয় প্রভেদ'; 'স্বার্থপরতা অপেক্ষা নিস্বার্থতা অনন্তগুণে শ্রেষ্ঠ', 'পবিত্র চিন্তা, পবিত্র দৃষ্টি, পবিত্র কথা, পবিত্র কার্য্য এবং অপবিত্র চিন্তা, অপবিত্র দৃষ্টি, অপবিত্র কথা ও অপবিত্র কার্য্যের মধ্যে অসীম প্রভেদ', ইত্যাকার মূলসূত্রসমূহ আমাদের 'উচ্চতর আমি'র প্রকৃতি-নিহিত মৌলিক লক্ষণরূপে আমাদের সমক্ষে প্রকাশিত হয়। এই সমস্ত সত্য শূন্য (abstract) মূলসূত্ররূপে প্রকাশিত হয় না ; আমাদের জীবনের মূলীভূত নিত্য জ্ঞানবস্তু এই সমস্ত মূলসূত্রের জীবন্ত মূর্ত্তিরূপে প্রকাশিত হন, এবং তিনি যে আমাদের পশুভাবাপন্ন প্রবৃত্তির অধীন 'নিম্নতর আমি' (lower self) হইতে অনন্তগুণে মহৎ, তাহা স্পষ্টরূপে বুঝিতে দেন,—আমাদের 'নিম্নতর আমি'কে যে তাঁহার সম্মুখে বলি দেওয়া আবশ্যক, তিনিই যে জীবনের একমাত্র ন্যায্য রাজা, ইহা নিঃসন্দিগ্ধরূপে বুঝিতে দেন। যখন উপরি-উক্ত মূলসূত্রসমূহ আমাদের অন্তরে প্রকাশিত হইয়া অন্ততঃ ক্ষণকালের জন্য আমাদের 'নিম্নতর আমি'কে সম্পূর্ণরূপে অধিকার করিয়া ফেলে, যখন আমাদের চিন্তা, ভাব ও ইচ্ছা সম্পূর্ণরূপে পবিত্র হইয়া যায়, যখন অপ্রেম ও অপবিত্রতার লেশমাত্র আমাদের হৃদয়ে থাকে

না, যখন আত্মা পবিত্রতার সুগন্ধে পরিপূর্ণ হয়, হৃদয় প্রেমে পূর্ণ হইয়া সমগ্র জগৎকে আলিঙ্গন করে, যখন প্রেম-পবিত্রতা আমাদের পক্ষে বাহিরের বস্তু থাকে না, সম্পূর্ণরূপে ভিতরের বস্তু হইয়া যায়, আত্মার নিশ্বাস ও রক্তমাংস স্বরূপ হইয়া যায়, এরূপ দুর্লভ সময়ে আমাদের প্রত্যক্ষ জ্ঞানের বিষয় কেবল একটা শূন্যময় আদর্শ নহে, এরূপ সময়ে আমাদের প্রত্যক্ষ জ্ঞানের বিষয় একটা পূর্ণ প্রেম ও পূর্ণ পবিত্রতা-সমন্বিত জ্ঞান-বস্তু। এই পরম বস্তুর অনুপম সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হইয়া সাধক বলেন—

"কে তুমি দাঁড়ায়ে হৃদয়-কাননে?
দেখিয়াছি অনেক রূপ, এমন রূপ আর দেখিনে।"

(ব্রহ্মসঙ্গীত।)

এরূপ সময়ে অসীম ও সসীমের প্রভেদ দূর হইয়া যায় না, ঈশ্বরের দার্শনিক অসীমতা আমাদের মধ্যে অবতীর্ণ হইয়া কিছু আমাদিগকে সর্ব্বজ্ঞ ও সর্ব্বশক্তিমান্ করিয়া দেয় না, অনন্তস্বরূপ অনন্ত জ্ঞান ও অনন্ত শক্তিযোগে যে অসংখ্য মঙ্গল কার্য্য ও পুণ্য কার্য্য করেন, সে সমস্ত কিছু আমাদের সমক্ষে প্রকাশিত হয় না, কিন্তু তাঁহার নৈতিক পূর্ণতার মূল অবয়বগুলি বস্তুতঃই আমাদের অন্তরে প্রকাশিত হয়। পাঠক বলিতে পারেন যে এরূপ অবস্থায় আমরা কেবল আমাদের আত্মারই একটা বিশেষ অবস্থামাত্র জ্ঞাত হই। ইহার উত্তর এই যে যেমন 'কেবল বিজ্ঞান' বলিয়া কোন

বিষয় নাই, 'বিজ্ঞান-সমন্বিত আত্মা'ই সমগ্র বিষয়টা, তেমনি 'কেবল অবস্থা,' পূর্ণ প্রেম-পবিত্রতার 'কেবল অবস্থা', বলিয়া কোন বিষয় নাই : আমরা এরূপ মুহূর্ত্তে যাহা প্রত্যক্ষ করি তাহা একটা অবস্থামাত্র নহে, তাহা একটী জীবন্ত আত্মা,—পূর্ণ প্রেম-পবিত্রতা-সমন্বিত একটি পরম পুরুষ। এই পূর্ণ প্রেম ও পূর্ণ পবিত্রতা-সমন্বিত পরম পুরুষ অনেক সময়ই আমাদের সমক্ষে প্রকাশিত থাকেন না, সত্য ; অনেক সময়ই আমরা ইঁহার আলোক হইতে বঞ্চিত হইয়া প্রবৃত্তির প্ররোচনায় মোহ ও পাপে মগ্ন হই, সত্য, কিন্তু তাহাতে তাঁহার পূর্ণ প্রেম ও পূর্ণ পবিত্রতার কোন হানি হয় না। বিশ্বের বিচিত্র ছবি আমাদের ব্যক্তিগত জ্ঞান হইতে তিরোহিত হইলেও যেমন আমাদের প্রাণরূপী নিত্য জ্ঞানবস্তুতে নিত্যরূপে বর্ত্তমান থাকে, আমাদের আত্মজ্ঞান সুষুপ্তির অবস্থায় তিরোহিত হইলেও যেমন চিরজাগ্রত নিত্য জ্ঞানে অক্ষুণ্ণরূপে বর্ত্তমান থাকে, তেমনি পূর্ণ প্রেম এবং পূর্ণ পবিত্রতা আমাদের সমক্ষে প্রকাশিত হইয়া সময়ে সময়ে আমাদের ব্যক্তিগত হৃদয়ও ব্যক্তিগত ইচ্ছা হইতে তিরোহিত হইলেও আমাদের জীবনের মূলীভূত নিত্য পুরুষে স্থায়ীরূপে বর্ত্তমান থাকে এবং ক্ষণে ক্ষণে পুনঃপ্রকাশিত হইয়া আমাদের প্রত্যেক চিন্তা, প্রত্যেক দৃষ্টি, প্রত্যেক বাক্য ও প্রত্যেক কার্য্যের বিচার করে, এবং আমাদিগকে নিয়ত প্রেম-পবিত্রতার পথে পরিচালিত করে।

যেখানেই ধর্ম্ম-সংগ্রাম বর্ত্তমান, যে আত্মাতে নৈতিক জীবনের বীজ অল্প মাত্রায় ও অঙ্কুরিত হইয়াছে, সেই আত্মাতেই এই "উচ্চতর আমি"—এই ধর্ম্মের আবহ—অল্পাধিক পরিমাণে প্রকাশিত। সকলেই যে এই "উচ্চতর আমি"কে সেই পূর্ণ-পুরুষের সাক্ষাৎ প্রকাশ ব'লিয়া বুঝিতে পারে, তাহা নহে। আত্মজ্যোতিকে যেমন অনেকেই ব্রহ্মজ্যোতির সাক্ষাৎ প্রকাশ বলিয়া বুঝিতে পারে না, তেমনি এই বিবেক-জ্যোতিকেও অনেকে সেই অনন্ত পুণ্য-জ্যোতির সাক্ষাৎ প্রকাশ বলিয়া বুঝিতে পারে না। তিনি বিবেকরূপে প্রকাশিত হইয়াও অনেকের নিকট অপরিচিত থাকেন। কিন্তু পরিচিতরূপেই হউক, আর অপরিচিতরূপেই হউক, ইঁহার প্রকাশের উপরেই নৈতিক জীবনের অস্তিত্ব নির্ভর করে। "উচ্চতর আমি" ও "নিম্নতর আমি"র পরস্পরের প্রতিঘাতেই—বিবেক ও প্রবৃত্তির বিরোধেই—ধর্ম্মসংগ্রাম উৎপন্ন হয়। এরূপ আত্মার কল্পনা করা যাইতে পারে, হয়ত এরূপ মানব প্রকৃত পক্ষেই আছে, যাহার মধ্যে নৈতিক জীবন একবারেই অঙ্কুরিত হয় নাই, যে মানব বুদ্ধি সম্বন্ধে মানব-পদবীতে আরোহণ করিয়াও নীতি সম্বন্ধে সম্পূর্ণ-রূপে প্রবৃত্তির অধীনই রহিয়াছে, নৈতিক জীবন সম্বন্ধে পশুর শ্রেণীভুক্ত রহিয়াছে। এরূপ মানবের মধ্যে বিবেকের কার্য্য দৃষ্ট না হইলেও, বিবেক প্রকাশিত না হইলেও, বিবেকের প্রকৃতত্বের কোন হানি হইল না। বিবেক ধর্ম্ম-জগতে প্রকা-

শিত, ধর্ম্ম-জগতের পক্ষেই ইহার আলোক আবশ্যক। ধর্ম্ম-জগতের সাধু অসাধু, জ্ঞানী অজ্ঞানী, সভ্য অসভ্য, সকলের মধ্যেই ইহা বর্ত্তমান। প্রশান্ত সময়ে, যে সময়ে পাশব প্রবৃত্তির উত্তেজনায় বিবেকচক্ষু মলিন হয় না, সেই সময়ে যদি অতি নৃশংসস্বভাব অত্যাচারীকে, অতি হীনস্বভাব পাপাত্মাকেও, জিজ্ঞাসা করা যায়, বল দেখি প্রেম ভাল কি অপ্রেম ভাল, পুণ্য শ্রেষ্ঠ কি পাপ শ্রেষ্ঠ, বল দেখি তুমি যে সমস্ত বস্তুর জন্য অত্যাচার কর, পাপ কর,—অন্ন, বস্ত্র, অর্থ, সুখ, যশ, মান, প্রভুত্ব,—এই সমস্ত যদি অত্যাচার না করিয়া পাও, তবে অত্যাচার কর কিনা, তবে—সে যদি শ্রেষ্ঠতা অশ্রেষ্ঠতার অর্থ বুঝে,—সে অসঙ্কোচে বলিবে "প্রেমই শ্রেষ্ঠ, পুণ্যই শ্রেষ্ঠ, বিনা অত্যাচারে অভিলষিত সমুদায় বস্তু পাইলে অত্যাচার করি না, পাপ করি না।" এই যে প্রেম-পুণ্যের প্রতি স্বাভাবিক শ্রদ্ধা, স্বাভাবিক আকর্ষণ, ইহা মানবমাত্রেরই অন্তরে বর্ত্তমান। সকলের মধ্যে ইহা সমান উজ্জ্বলরূপে প্রকাশিত নহে। শিক্ষা, সভ্যতা ও সাধনের তারতম্যানুসারে ইহার উজ্জ্বলতার তারতম্য হয়। কিন্তু সকলের মধ্যেই অল্পাধিক পরিমাণে পূর্ণ মঙ্গল ও পূর্ণ পবিত্রতার সাধারণ আদর্শ বর্ত্তমান। যাহার মধ্যে যে পরিমাণে ইহা প্রকাশিত, তাহার নৈতিক দায়িত্ব তত, তাহার মধ্যে পাপ-পুণ্যের সংগ্রাম তত অধিক। যাহা হউক, এই যে আত্মাতে ঈশ্বরের প্রকাশ, ইহাই তাঁহার পূর্ণ মঙ্গল

ভাব ও পূর্ণ পবিত্রতার উজ্জ্বল প্রমাণ। তিনি আত্মার ভিতরে স্পষ্টরূপে বলিতেছেন, "আমি পূর্ণ মঙ্গলস্বরূপ, আমি পূর্ণ পবিত্রস্বরূপ"। আমরা তাঁহার এই স্পষ্ট বাক্য শুনিয়া তাঁহার স্বরূপ সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হইতেছি। আমরা যে কখনও এই বাক্যে সন্দেহ করি না তাহা নহে, সময়ে সময়ে সন্দেহ করি; কিন্তু সে সন্দেহ আত্মঘাতী, সে সন্দেহ আপনিই আপনাকে খণ্ডন করে। আমরা তাহা দেখাইতেছি।

জগতের কতকগুলি আপাত-অমঙ্গলকর ও আপাত-অন্যায় কার্য্য দেখিয়া আমরা সময়ে সময়ে ঈশ্বরের পূর্ণ প্রেম ও পূর্ণ পবিত্রতা সম্বন্ধে সন্দিহান হই। আমরা যাহা প্রত্যক্ষ করি তাহা কার্য্যমাত্র; এই সকল কার্য্যের মূলে প্রেম আছে কি অপ্রেম আছে, পুণ্য আছে কি পাপ আছে, তাহা আমরা প্রত্যক্ষরূপে দেখিতে পাই না। দেখাও অসম্ভব; আমাদের নিজ নিজ মনের কার্য্য-প্রবৃত্তি (motive) ই আমাদের সাক্ষাৎ জ্ঞানের বিষয়, অন্য মনের কার্য্য-প্রবৃত্তি আমাদের প্রত্যক্ষ জ্ঞানের বিষয় হইতে পারে না। কিন্তু উপরি-উক্ত প্রাকৃতিক কার্য্যসমূহের অনুরূপ কার্য্য মানুষের দ্বারা কৃত হইলে তাহা নাকি অনেক স্থলেই অপ্রেম ও অপবিত্রতা-প্রসূত বলিয়া আমরা জানি, তাই এই সকল কার্য্য দেখিয়া আমাদের সহসা মনে হয় যেন এই সমুদায়ের কর্ত্তা ঈশ্বরও অপ্রেমিক বা

অন্যায়কারী। কিন্তু এরূপ সন্দেহের সময়ে অন্তরে প্রকাশিত ব্রহ্মালোকের দিকে তাকাইলেই এই সন্দেহের অসারতা বুঝিতে পারা যায়। জগতে ঈশ্বরের কার্য্যমাত্র প্রকাশিত, তাঁহার ভাব ও ইচ্ছা প্রত্যক্ষ ভাবে প্রকাশিত নহে। তাঁহার ভাব ও ইচ্ছা কেবল অন্তরেই প্রত্যক্ষভাবে প্রকাশিত। অন্তরে তিনি পূর্ণ প্রেম ও পূর্ণ পবিত্রতার আধাররূপে প্রকাশিত। এস্থলে তাঁহার নৈতিক পূর্ণতা অনুমানের বিষয় নহে, প্রত্যক্ষ জ্ঞানের বিষয়। সুতরাং তিনি জগতে অপ্রেমিক ও অপবিত্র রূপে বিদ্যমান, এই সন্দেহ বস্তুতঃ এই স্ববিরোধী কথা বলে যে তিনি পূর্ণ প্রেমিক অথচ পূর্ণ প্রেমিক নহেন, তিনি পূর্ণ পবিত্রস্বরূপ অথচ পূর্ণপবিত্রস্বরূপ নহেন। সুতরাং ইহা স্পষ্টতঃই আত্মঘাতী। বাহিরে তাঁহার কতকগুলি কার্য্যমাত্র দেখিতেছি, তাঁহার ভাব ও ইচ্ছা দেখিতেছি না; কিন্তু অন্তরে তিনি প্রত্যক্ষভাবে পূর্ণ প্রেম ও পূর্ণ পবিত্রতারূপে বর্ত্তমান; সুতরাং কার্য্যগুলি প্রহেলিকা-পূর্ণ হইলেও ইহারা যে অপ্রেম ও অপবিত্রতা-প্রসূত নহে, এই বিষয়ে আর সন্দেহ থাকিতেছে না।

আমরা যাহাকে ঈশ্বরের প্রত্যক্ষ প্রকাশ বলিয়া ব্যাখ্যা করিলাম, উহাকে যদি কেহ কেহ ঈশ্বরের প্রত্যক্ষ প্রকাশ বলিয়া গ্রহণ না করেন, তাঁহার কার্য্যমাত্র বলিয়া ব্যাখ্যা করেন, মানব-হৃদয়ে প্রকাশিত প্রেম-পুণ্যকে ঈশ্বরের প্রেম-

পুণ্য না বলিয়া কেবল মানবীয় প্রেম-পুণ্য বা প্রেম-পুণ্যের আদর্শ বলিয়া ব্যাখ্যা করেন, তাহা হইলেও ঈশ্বরের পূর্ণ প্রেম ও পূর্ণ পবিত্রতা সম্বন্ধীয় সন্দেহের অসারতা অনেক পরিমাণে দেখান যায়। স্পষ্টভাবে বলিতে গেলে এই সন্দেহ ইহাই বলে যে ঈশ্বর আপনি যত বড় তাহা অপেক্ষা বড় কয়েকটা আত্মা সৃষ্টি করিয়াছেন,—আপনাতে যাহা নাই, সৃষ্ট আত্মাগুলিকে তাহাই দিয়াছেন। বস্তুতঃ ইহাতে এই বলা হয় যে বিশ্ব-প্রেমিক ও পুণ্যাত্মা বুদ্ধদেব, ঈশা প্রভৃতি মহাত্মারা ত ঈশ্বরাপেক্ষা শ্রেষ্টই, আমাদের মত ক্ষুদ্র কীটেরাও তাঁহা অপেক্ষা সময়ে সময়ে শ্রেষ্ঠতর হয়, কেননা আমরাও সময়ে সময়ে সমগ্র জগৎকে আলিঙ্গন করিতে ইচ্ছা করি, আমরাও সময়ে সময়ে পুণ্যের সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হই, এবং যে মুহূর্ত্তে এরূপ হয়, সে মুহূর্ত্তে বস্তুতঃই নির্ম্মল প্রেম-পুণ্যে ভূষিত হই। আর উক্ত বাক্যে ইহাই বলা হয় যে ঈশ্বর অপ্রেমিক অপবিত্র হইয়াও মানুষকে এমন ভাবে গড়িয়াছেন যে মানুষ পূর্ণ প্রেম, পূর্ণ পবিত্রতাকেই ভালবাসে, এবং অপ্রেম অপবিত্রতাকে ঘৃণা করে; অর্থাৎ পিতা সন্তানকে এমন ভাবে গড়িয়াছেন যাহাতে সন্তান যতই বাড়িবে ততই পিতাকে অধিকতর ঘৃণা করিবে ও গালাগালি দিবে এবং যাহা পিতার মনোমত নহে (অর্থাৎ প্রেম ও পবিত্রতা) ক্রমাগত সে দিকেই ঝুঁকিবে, এবং অবশেষে সম্পূর্ণরূপে তাঁহার বিদ্রোহী হইয়া তাঁহার ঘৃণিত

প্রেম-পবিত্রতার রাজ্য সংস্থাপনেই ব্যস্ত হইবে। তাই ত! জগৎপিতা এতই নির্ব্বোধ! তাঁহার সৃষ্ট নিতান্ত নির্ব্বোধ মানুষও তাঁহা অপেক্ষা সুবোধ! মানুষও নিজ সন্তানকে পিতৃবিদ্বেষ ও পিতৃদ্রোহিতা শিক্ষা দেয় না।

সুতরাং পাঠক দেখিতেছেন ঈশ্বরের পূর্ণ প্রেম ও পূর্ণ পবিত্রতা-বিষয়ক সন্দেহসমূহ কি অসার, আর যাহারা এই সকল অসার আপত্তিদ্বারা পুস্তক পূর্ণ করিয়া অসার পাঠকদের কাছে বুদ্ধিমান্ দার্শনিক বলিয়া প্রশংসা লাভ করে, তাহারা কি স্থূলদর্শী! সন্দেহবাদী জগতের কতিপয় প্রহেলিকাপূর্ণ ঘটনা দেখিয়া ঈশ্বরের প্রেম-পুণ্যের উপর বিচারে বসে, ঈশ্বরের নিন্দা করে। সে দেখে না যে তাহার অন্তরে যে প্রেম-পুণ্যের আদর্শ বর্ত্তমান থাকাতে সে এই বিচারে প্রবৃত্ত হইয়াছে, সেই আদর্শ স্বয়ং ঈশ্বর-কর্ত্তৃক প্রকাশিত। সে যে প্রেম-পুণ্যের ভূমির উপর দাঁড়াইয়া ঈশ্বরের কার্য্যের সমালোচনা করে, ঈশ্বরকে অপ্রেমিক ও অন্যায়কারী বলিয়া সিদ্ধান্ত করে, সেই প্রেম-পুণ্যই ঐশ্বরিক প্রেম ও ঐশ্বরিক পবিত্রতার উজ্জ্বলতম প্রমাণ, সেই প্রেম-পুণ্যই তাহার ভ্রান্ত সিদ্ধান্তের প্রবলতম প্রতিবাদ; সেই প্রেম-পুণ্যই সপ্রমাণ করে যে ঐ সকল প্রহেলিকাপূর্ণ কার্য্যের কারণ অপ্রেম বা অপবিত্রতা নহে, অন্য কিছু।

ঈশ্বরের পূর্ণ প্রেম, পূর্ণ পবিত্রতা সম্বন্ধে বিবেক-ঘটিত এই

প্রমাণই মূল প্রমাণ * । জগতের সুশৃঙ্খলা, জগতের অসংখ্য মঙ্গলকর বিধান, এই মূল প্রমাণকে সহস্র প্রকারে সমর্থন করিতেছে। এই সকল মঙ্গল-বিধানের সাহায্যে মানব ক্রমশঃই অধিক হইতে অধিকতর সুখ-সচ্ছন্দতা ও উচ্চ হইতে উচ্চতর পুণ্যের সোপানে আরোহণ করিতেছে। এই সমস্ত মঙ্গল-বিধান আমরা বিশেষ ভাবে বর্ণনা করিব না। জীবের অন্তর, বাহির, গৃহ, কার্য্যক্ষেত্র, গ্রাম, নগর, প্রান্তর, অসংখ্য মঙ্গল-বিধানে পরিপূর্ণ। সমুদয় বিজ্ঞান উচ্চৈঃস্বরে জগতের মঙ্গলভাবের সাক্ষ্য দিতেছে। জগতের মঙ্গলভাবই বিধি, মঙ্গলভাবই উন্নতিশীল। দুঃখকর ও প্রহেলিকাপূর্ণ ঘটনা সাময়িক ও অস্থায়ী। এই সকল ঘটনা সম্বন্ধে আমরা বর্ত্তমান অধ্যায়ের শেষভাগে একটু বিশেষ ভাবে আলোচনা করিব।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

ঈশ্বরে বিশেষ কৃপা

মানবের প্রতি ঈশ্বরের প্রেম আপাততঃ সাধারণ প্রেম বলিয়া বোধ হয়। স্থূল দৃষ্টিতে বোধ হয় যেন তিনি সাধারণ নিয়মে, সাধারণ ভাবে, মানব-জগতের কল্যাণ বিধান করি-

---

* On this subject, see Dr. James Martineau's *Study of Religion*, Bk. II. Chap. II, and Green's *Prolegomena to Ethics*, B. K. III. Chap II.

তেছেন, যেন প্রত্যেক মানব তাঁহার বিশেষ প্রেম-দৃষ্টির বিষয় নহে। কিন্তু কিঞ্চিৎ সূক্ষ্মভাবে দৃষ্টি করিলে এই সাধারণত্বের নিম্নে বিশেষত্ব দেখিতে পাওয়া যায়। একটু গভীরভাবে ঈশ্বরের প্রেমতত্ত্ব আলোচনা করিলে দেখিতে পাওয়া যায় তিনি যেমন প্রত্যেক আত্মার প্রাণরূপে, অন্তর্যামী ও হৃদয়-দর্শীরূপে, বর্ত্তমান রহিয়াছেন, তেমনি আবার প্রত্যেক আত্মার পিতা, মাতা, সখা, সুহৃদ্, গুরু, পরিচালক, মুক্তিদাতা ও হৃদয়েশ্বররূপে বর্ত্তমান রহিয়াছেন। তাঁহার সহিত প্রত্যেক মানব-হৃদয়ের গাঢ় মধুর আধ্যাত্মিক যোগ রহিয়াছে, এবং এই যোগ ক্রমশঃই প্রগাঢ়তর মধুরতর হইতেছে। প্রত্যেক মানবের প্রতি ঈশ্বরের বিশেষ কৃপা সম্বন্ধে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের উপাসনা-মন্দিরে এই পুস্তক-লেখকের প্রদত্ত একটী উপদেশের কিয়দংশ এস্থলে সন্নিবিষ্ট হইল। এই উদ্ধৃত অংশের প্রথম কোন কোন কথা পাঠক দ্বিতীয় অধ্যায়ে ২।১ বার শুনিয়াছেন, কিন্তু এস্থলে সেই সকল কথার কিঞ্চিৎ পুনরুক্তি বোধ হয় অপ্রীতিকর হইবে না।

"আত্মজ্ঞানের আলোকে জীব ও ব্রহ্ম পরস্পরের সম্বন্ধ দর্শন করিলে এই বিষয় অনেক পরিষ্কার হইয়া যায়, এই বিষয়ে বিশ্বাস ক্রমশঃ উজ্জ্বল হইয়া উঠে। বলা বাহুল্য যে এই সম্বন্ধ হৃদয়ঙ্গম করিতে হইলে, এই জ্ঞান লাভ করিতে হইলে, গভীর চিন্তা ও ধ্যান আবশ্যক। যাঁহারা এরূপ জ্ঞানকে কেবল শুষ্ক

দার্শনিক জ্ঞান বলিয়া অগ্রাহ্য করেন এবং উচ্চতর আধ্যাত্মিক জীবনের সহিত ইহার অপরিহার্য্য সম্বন্ধ বুঝিতে না পারিয়া ইহার সাধনে উপেক্ষা করেন, তাঁহাদের নিকট ঈশ্বরের নিত্যপ্রেম, নিত্যলীলা-সম্বন্ধীয় উচ্চতর সত্যসমূহ চিরদিনই অস্পষ্ট ও সন্দেহাচ্ছন্ন থাকিয়া যায়, কেবল স্বপ্নের ব্যাপার বলিয়া প্রতীয়মান হয়। কিন্তু আত্মচিন্তাদ্বারা আত্মার সহিত ঈশ্বরের নিত্য নিগূঢ় যোগ হৃদয়ঙ্গম করিলে তাঁহার অনুপম প্রেমের তত্ত্ব উজ্জ্বল হইয়া উঠে। আত্মজ্ঞান কি দেখাইয়া দেয়? আত্মজ্ঞান দেখাইয়া দেয় যে জাগরণ, বিস্মৃতি, স্বপ্ন, সুষুপ্তি, সমুদায় অবস্থাতে আমার জীবন ব্রহ্মের উপর নির্ভর করিতেছে, ব্রহ্মে জীবিত রহিয়াছে। আমি জীবনের কোনও কালেই কোনও অবস্থাতেই, কোন অন্ধ জড়শক্তির অধীন নহি; সর্ব্ব-কালে, সকল অবস্থাতে, তাঁহার আশ্রয়ে স্থিতি করিতেছি। আমার নিজেরও এমন কোন শক্তি নাই যাহা তাঁহা হইতে প্রাপ্ত নহে, তাঁহাতে ধৃত ও অবস্থিত নহে। এই যে উপাসনা-মন্দিরের দৃশ্য আমার সমক্ষে প্রকাশিত রহিয়াছে, এই দৃশ্য, এই চিত্র, পরমাত্মা স্বয়ং আমার চিত্তপটে অঙ্কিত করিয়াছেন, এই দর্শন ব্যাপারটি সম্পূর্ণ আত্মা-ঘটিত ব্যাপার, সম্পূর্ণ আধ্যাত্মিক ব্যাপার। শরীর দেখে না, জড়বস্তুও দেখাইতে পারে না; দেখে আত্মা, দেখায়ও আত্মা, দর্শন আত্মারই একটী অবস্থামাত্র। এই রূপে দেখা যায়, দর্শন, শ্রবণ, আঘ্রাণ, আস্বাদন

প্রভৃতি সমুদায় জ্ঞানের ব্যাপারই আত্মা-ঘটিত ব্যাপার, আত্মায় আত্মায় সংস্পর্শ, আধ্যাত্মিক জ্ঞান-লীলা। আত্মাতে জ্ঞান-লীলা কেবল তিনিই করিতে পারেন যিনি আত্মার ভিতরে আছেন, আত্মা যাঁহার হাতে আছে, আত্মা যাঁহার লীলার পুতুল। পুনশ্চ, যখন আমাদের জীবনের আর এক দিকে তাকাই, যখন দেখি আমরা নিতান্ত বিস্মৃতিশীল, অথচ স্মৃতি আমাদের সঙ্গে সঙ্গেই ফিরিতেছে, আমরা বিস্মৃতিশীল হইলেও আমাদের জীবন স্বচ্ছন্দে চলিয়া যাইতেছে, তখন আত্মার সহিত পরমাত্মার নিগূঢ় যোগ দেখিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া যাই। এই যে আমরা এই মন্দিরে বসিয়া ঈশ্বর-প্রসঙ্গ করিতেছি, এই সময়ে আমরা জীবনের কত কথা ভুলিয়া আছি। এক্ষণে, এক দিকে দেখিতে গেলে, আমাদের সমস্ত অতীত জীবন আমরা হারাইয়া ফেলিয়াছি। কিন্তু বলিতে বলিতেই আবার বিস্মৃত কথাগুলি, হারাণ বিষয়গুলি, স্মরণে আসিতেছে; সংসারে প্রবেশ করিলে যথাসময়ে সমুদায়ই মনে পড়িবে। এই রূপে আমরা ক্ষণে ক্ষণেই বিস্মৃত হইতেছি, ক্ষণে ক্ষণেই আবার স্মৃতি লাভ করিতেছি। বিস্মৃতিকালে অতীত জীবনের ব্যাপারসমূহ কোথায় যায়, কোথা হইতে আবার ফিরিয়া আসে, কেইবা আনিয়া দেয়? এই সকল ভাবিলে নিতান্ত আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়। যে বিস্মৃতিশূন্য নিত্যসাক্ষী পরমাত্মা এই সমুদায় ধারণ করিয়া থাকেন ও প্রত্যর্পণ

করেন, তিনি আত্মার কত নিকট, তাঁহার সহিত আত্মার কি গাঢ় যোগ! আত্মা নিশ্চয়ই তাঁহার লীলার পুতুল। আবার, যখন নিদ্রিত হই, অচেতন হই, একবারে অবশ, নিষ্ক্রিয় হইয়া পড়ি,—জ্ঞান, স্মৃতি, বুদ্ধি, শক্তি, সমস্তই হারাইয়া ফেলি, তখন আত্মা কাহার আশ্রয়ে স্থিতি করে? সেই নিরাশ্রয় অবস্থায় কে জীবনের হারাণ বিষয়গুলিকে যত্নের সহিত রক্ষা করে? কেই বা যথাসময়ে জাগ্রত করে এবং জীবনের হারাণ বস্তুগুলিকে প্রত্যর্পণ করে? না জাগা ত অতি সহজ হইত, জাগি কেন? জাগায় কে? জাগিলেও ত পূর্ব্বোক্ত বিষয়-গুলি ফিরাইয়া না পাইতে পারিতাম, তাহা হইলে ত জীবন আবার শিশুর অজ্ঞান অবস্থায় পরিণত হইত। কে যত্ন করিয়া সমুদায় প্রত্যর্পণ করে,—আবার জীবনলীলা খেলিতে থাকে? তিনিই,—সেই নিদ্রাশূন্য চিরজাগ্রত পুরুষই,—যিনি আত্মার নিত্য আশ্রয় ও অবলম্বন, আত্মা যাহার লীলার পুতুল। এই রূপে দেখিতে পাই, প্রত্যেক আত্মার সহিত পরমাত্মার নিগূঢ় সাক্ষাৎ সম্বন্ধ। জীবনধারণের জন্য, জীবনের উন্নতির জন্য, যে যে উপকরণ আবশ্যক, সমস্ত তিনি সাক্ষাৎভাবে প্রত্যেক আত্মাকে প্রদান করিতেছেন। জ্ঞান, ভাব, শক্তি, যাহাতে আমাদের জীবন গঠিত, এই সমস্ত আমাদের নিজায়ত্ত নহে, তিনি স্বয়ং সাক্ষাৎভাবে আমাদিগকে এই সমস্ত দিয়া জীবিত রাখিয়াছেন। প্রত্যেক জীবাত্মা, প্রত্যেক মানবজীবন, তাঁহার

অবিরাম নিত্যলীলার ক্ষেত্র। এই বিশেষ বিশেষ লীলাক্ষেত্রের সমষ্টির নামই জগৎ।

"আত্মাতে প্রকাশিত এই দিব্যজ্ঞানের আলোকে যখন ঈশ্বরের প্রেমমুখ দেখি, তখন একবারে অবাক্ হইয়া যাই, মুগ্ধ হইয়া যাই। তখন বুঝিতে পারি ঈশ্বরের সাধারণ কৃপা একটা কথার কথা মাত্র। ঈশ্বর সাধারণ ভাবে আমাদিগকে কৃপা করেন, ইহা বলিলে ঈশ্বরে মানুষের অসম্পূর্ণতা আরোপ করা হয়। অথবা, যদি সাধারণ কৃপার কোন অর্থ থাকে, সে কেবল এই মাত্র যে, বিশেষ কৃপার সমষ্টিকে এক অর্থে সাধারণ কৃপা বলা যাইতে পারে। ঈশ্বর সাধারণ নিয়মে কার্য্য করেন, ইহা মিথ্যা নহে। কিন্তু ইহাতে তাঁহার সহিত আমাদের প্রত্যেকের বিশেষ সম্বন্ধ প্রকৃত পক্ষে সাধারণ হইয়া যায় না। তিনি সাধারণ নিয়মে কার্য্য করেন, কিন্তু তাঁহার কার্য্যক্ষেত্র বিশেষ বিশেষ। তিনি প্রত্যেক আত্মার সহিত বিশেষ ভাবে নিত্যলীলা করিতেছেন। প্রাতঃকাল হইতে সায়ংকালে পর্য্যন্ত, সায়ংকাল হইতে পুনরায় প্রাতঃকাল পর্য্যন্ত, সমস্ত দিনরাত্রি তিনি হৃদয়ক্ষেত্রে, জীবনক্ষেত্রে, প্রেমলীলা করেন। তিনিই সকলকে স্বয়ং জাগ্রত করেন, তিনিই প্রাতঃকালীন্ নাম-জপ, নাম-কীর্ত্তনের জন্য প্রাণকে আহ্বান করেন, তিনিই প্রাতঃকালীন্ শীতল বায়ু সেবনার্থ ডাকিয়া বাহিরে লইয়া যান, তিনিই তাঁহার সাক্ষাৎ কৃপারূপী

শীতল জলে স্নান করান, তিনিই তাঁহার সাক্ষাৎ প্রসাদরূপী অন্ন আহার করান। তিনি আহার করান, ইহা কি কবিত্ব? আমি আহার করি, ইহাই কি কেবল সত্য? কে বলিল? তিনি চক্ষুর চক্ষু হইয়া অন্ন না দেখাইলে আমি দেখিতাম না, তিনি অন্নের আধাররূপী হইয়া না থাকিলে অন্নের এক কণিকাও থাকিত না, আর তিনি আমার শরীরে মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে বল না দিলে আমার আহার পান সমুদায় কার্য্যই অসম্ভব হইত। স্থূলদর্শী অবিশ্বাসীর চক্ষে যে সকল ব্যাপার কেবল ভৌতিক, কেবল মানুষিক, বলিয়া বোধ হয়, স্থূলদর্শী যে সমুদায় কার্য্যে কেবল পাচককে দেখে, পরিজনকে দেখে, কতকগুলি অচেতন বস্তু দেখে, সূক্ষ্মদর্শী বিশ্বাসী সেখানে ব্রহ্মের জীবন্ত আবির্ভাব দেখিয়া ভাবে ডুবিয়া যান। এই রূপে তিনি আমাদিগকে পোষণ করেন। তিনি স্বয়ং শরীরে থাকিয়া অন্নপাক, রক্ত-সঞ্চালন প্রভৃতি শারীরিক ক্রিয়া সম্পাদন করেন। তিনি কার্য্যক্ষেত্রে উপস্থিত থাকিয়া, শরীর মনে শক্তি সঞ্চারিত করিয়া, আমাদিগকে কার্য্য করান। তিনি শরীরের সঙ্গে, আত্মার সঙ্গে, চিরসংযুক্ত থাকিয়া, যেখানে যাই নিত্য সঙ্গী হইয়া, আমা-দের সহিত বিচরণ করেন ও দৈনিক শত শত বিপদ আপদ হইতে রক্ষা করেন। তিনিই পরিশ্রমান্তে প্রাণে বিশ্রাম ও শান্তি দান করেন। তিনিই জ্ঞানোপার্জ্জন কালে চক্ষুর চক্ষু হইয়া দেখান, এবং বুদ্ধি ও প্রজ্ঞাতে প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া জ্ঞানা-

লোক প্রকাশিত করেন। তিনিই প্রাণকে উপাসনার জন্য আহ্বান করেন, তিনি হাত যোড় করান, তিনি চক্ষু মুদ্রিত করান, তিনি মনকে শান্ত করেন, তিনি সত্য প্রেম পবিত্র-স্বরূপ হইয়া নিজগুণে আত্মাতে প্রকাশিত হন, প্রেম ও শান্তিরসে প্রাণকে অভিষিক্ত করেন এবং পুণ্যবলে আত্মাকে বলীয়ান্ করেন। তিনিই বিবেকরূপে নিয়ত আত্মাতে প্রত্যাদেশ প্রেরণ করেন, ইহাকে পাপ হইতে রক্ষা করেন, পুণ্য কার্য্যে প্রবৃত্ত করেন এবং নিয়ত ধর্ম্মজীবনের উচ্চ হইতে উচ্চতর আদর্শ দেখাইয়া স্বর্গরাজ্যের দিকে প্রলুব্ধ করেন। তিনিই আমাদিগকে সাধু ভক্তদিগের নিকট লইয়া যান, শ্রোত্রের শ্রোত্র হইয়া তাঁহাদের মধুর উপদেশ শ্রবণ করান, মনকে বুঝান, এবং প্রাণে ঐ সকল উপদেশের ভাব প্রতিষ্ঠিত করেন। তিনিই দেশকালের ব্যবধান চূর্ণ করিয়া আত্মাকে প্রাচীন আর্য্য ঋষিদিগের অরণ্যমধ্যস্থিত ব্রাহ্মসমিতিতে লইয়া গিয়া গভীর তত্ত্বকথা শ্রবণ করান, বোধি-বৃক্ষমূলে গভীর ধ্যানমগ্ন হৃদয়মুগ্ধকর বুদ্ধমূর্ত্তি দর্শন করান, কেনানের পর্ব্বতোপরি আসীন মহর্ষি ঈশার পবিত্র স্বর্গীয় উপদেশ শ্রবণ করান, ক্যাল্ব্যারির বধ্যভূমিতে লইয়া গিয়া সেই প্রাণস্পর্শী অদ্ভুত আত্ম-সমর্পণের ব্যাপার দর্শন করান, প্রাচীন নবদ্বীপে প্রেমোন্মত্ত ভক্তমণ্ডলীর মধ্যে লইয়া গিয়া প্রেমোচ্ছ্বাসে নৃত্য করান। এই রূপে প্রাচীন ও আধুনিক অসংখ্য প্রেমিক জ্ঞানী ও কর্ম্মী

সাধকের সংবাসে লইয়া গিয়া তিনি আত্মাকে স্বর্গের শোভা প্রদর্শন করেন ও পরিত্রাণের পথে অগ্রসর করেন। আমি আমার নিজের জন্য যত ব্যস্ত, সে ব্যস্ততাকে কোটিগুণ করিলেও তাঁহার ব্যস্ততার সমান হয় না। সাধারণত্ব কোথায়? সবই বিশেষ। আমার সমগ্র জীবন তাঁহার বিশেষ কৃপার লীলাক্ষেত্র। আমি তাঁহার বিশেষ কৃপার সাগরে অনুক্ষণ ডুবিয়া আছি। যাহা কিছু দেখি, যাহা কিছু শুনি, যাহা কিছু পাই, যাহা কিছু ভোগ করি, যাহা কিছু সহ্য করি, সমুদায় তাঁহার এই বিশেষ কৃপা-সাগরের তরঙ্গ। সূর্য্য, চন্দ্র, জল, বায়ু; সংসার, গৃহ, পরিজন, বন্ধু, সমাজ, সদ্‌গ্রন্থ, সাধু, জ্ঞান, প্রেম, পুণ্য, শান্তি, সমুদায়ই তাঁহার বিশেষ কৃপাসাগরের তরঙ্গ। আমি নিয়ত তাঁহার প্রেম-সাগরে ভাসিতেছি। তাঁহার কৃপা অনন্ত, অসীম, অনির্ব্বচনীয়। তাঁহার কৃপা সম্পূর্ণরূপে জানি না বলিয়া বাঁচিয়া আছি; সম্পূর্ণরূপে জানিলে, অনুভব করিলে, হৃদয় ভাঙ্গিয়া যাইত। যখন কিঞ্চিৎ দেখি, যখন দেখি আমি কি পাষণ্ড, নরাধম, কৃতঘ্ন, তাঁহাকে ছাড়িয়া, তাহাকে উপেক্ষা করিয়া, সংসারের অসার বস্তু লইয়া ব্যস্ত রহিয়াছি, অপর দিকে তিনি আমার মস্তকে করুণার উপর করুণা চাপাইয়া আমাকে একবারে প্রেমঋণে ডুবাইয়া দিতেছেন, তখন হৃদয় উদ্বেলিত হইয়া উঠে, হৃদয় ফাটিয়া যাইবার উপক্রম হয়। তখন প্রাণ সরল ভাবে বলে,—'তোমার প্রেমের ভার, বহিতে পারিনে

গো আর ; প্রাণ উঠিছে কাঁদিয়া, হৃদয় ভেদিয়া, তব স্নেহ দরশনে ; লইনু শরণ মাগো অভয় চরণে।' কবে তাঁহার প্রেম জানিয়া, তাঁহার প্রেম অনুভব করিয়া, প্রেমিক হইব, শুষ্কতা চিরদিনের মতন চলিয়া যাইবে !

কবে—

'প্রেমে পাগল হয়ে হাসিব কাঁদিব,
সচ্চিদানন্দ সাগরে ভাসিব ;
আপনি মাতিয়ে সকলে মাতাব,
হরিপদে নিত্য করিব বিহার !'

দয়াময় শীঘ্র সেই শুভ দিন আনয়ন করুন্।"

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

অমঙ্গল-প্রহেলিকা

ঈশ্বরের পূর্ণ প্রেম ও পূর্ণ পবিত্রতার প্রমাণ আমরা যথা-সাধ্য ব্যাখ্যা করিলাম। এখন জগতের কতিপয় প্রহেলিকাপূর্ণ ঘটনা,—যে সকল ঘটনা আপাততঃ ঈশ্বরের পূর্ণ প্রেম ও পূর্ণ পবিত্রতার বিরোধী বলিয়া বোধ হয়,—সেই সকল ঘটনা সম্বন্ধে বলিবার সময়। বিষয়টী নিতান্ত গুরুতর, এবং গুরুতর বলিয়াই ইহার সবিস্তার আলোচনা হওয়া আবশ্যক। কিন্তু এই বিষয়ের বিস্তৃত আলোচনা করা এই পুস্তকের উদ্দেশ্যের

মধ্যে নহে।* এস্থলে সংক্ষেপে এই বিষয়ে কয়েকটী কথা বলিব।

প্রথম কথা এই যে বিশ্বাসকে সুদৃঢ় ভিত্তির উপর দণ্ডায়মান করাইবার জন্য এই সমুদয় ঘটনার বিচার একান্ত আবশ্যক নহে। বিশ্বাসের প্রকৃত ভিত্তি আন্তরিক প্রমাণ। এই আন্তরিক প্রমাণ যত দিন উজ্জ্বলরূপে প্রকাশিত না হয়, ততদিন মানুষ বাহ্যিক ঘটনার বিচারে ব্যতিব্যস্ত থাকে। আন্তরিক প্রমাণ উজ্জ্বল হইলে যে এই বিচারের একবারেই আবশ্যকতা থাকে না, তাহা নহে; আবশ্যকতা থাকে, কিন্তু এই বিচার মীমাংসার উপর আধ্যাত্মিক বিশ্বাস, নির্ভর, আশা ও শান্তি নির্ভর করে না। যেখানে বুদ্ধি বুঝিতে পারে না, মীমাংসা করিতে পারে না, সেখানে আত্মা প্রজ্ঞা-ঘটিত উজ্জ্বল আলোকের দিকে চাহিয়া নিশ্চিন্ত হয়, এবং ক্রমে জ্ঞানোন্নতির সঙ্গে সঙ্গে অবুদ্ধ বিষয় বোধগম্য হইবে এই আশা করে। কতিপয় বৎসরের সাধুতা ও বন্ধুতাতে মানব-বন্ধুর প্রতি আমাদের এরূপ বিশ্বাস জন্মে যে তাঁহার কৃত কতিপয় রহস্যপূর্ণ এবং আপাত-অন্যায় কার্য্য দেখিলেও আমরা সে সমুদয়কে হঠাৎ অন্যায় না ভাবিয়া এই বিশ্বাস করি যে

* See Dr. Martineau's excellent treatment of this subject in his *Study of Religion*, Bk. II, Chap. III. See also Hedge's *Reason in Religion*: "The Old Enigma."

সময়ে এই সমুদয় কার্য্যের যুক্তিযুক্ততা বুঝিতে পারিব। এরূপ বিশ্বাস যাহার নাই তাহাকে আমরা স্বভাবতঃই অবশ্য সন্দিগ্ধতা ও ক্ষুদ্র-চিত্ততা দোষে দোষী মনে করি। ক্ষুদ্র, অপূর্ণ মানব-বন্ধুর সম্বন্ধে যদি এরূপ বিশ্বাস যুক্তিযুক্ত হয়, তবে সেই পূর্ণ-স্বরূপ পরম বন্ধুর সম্বন্ধে এরূপ বিশ্বাস কত অধিক গুণে যুক্তি-যুক্ত! আমরা কণামাত্র জ্ঞান লাভ করিয়া অনন্তস্বরূপের সমুদয় কার্য্যের রহস্যভেদ করিতে পারিব, ইহা অসম্ভব। সুতরাং জগতের দৃশ্যমান অমঙ্গলের কোন যুক্তিযুক্ত ব্যাখ্যা না দিতে পারিলেও তাহাতে আমাদের আত্মপ্রত্যয়সিদ্ধ বিশ্বাসের ভিত্তি টলিতেছে না।

দ্বিতীয় কথা এই যে কোন কোন সন্দেহবাদী এই রহস্যের যে ব্যাখ্যা দিয়া থাকেন, তাহা নিতান্তই অগ্রাহ্য। কোন কোন সন্দেহবাদী মনে করেন যে জগতের উপকরণরূপী আদিম অস্পষ্ট জড়কে ঈশ্বর সম্পূর্ণরূপে বশীভূত করিতে পারেন নাই, তাহাতেই জগতে এত অমঙ্গল ঘটনা ঘটে। আমরা যথাস্থানে দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছি যে জড় বলিতে আমরা যাহা বুঝি, তাহা সম্পূর্ণ-রূপেই আত্মার আশ্রিত, সুতরাং ঈশ্বরের পক্ষে এরূপ বস্তুকে বশীভূত করার কোন অর্থই নাই। আরোও দেখান হইয়াছে যে কর্তৃত্ব কেবল জ্ঞানবস্তুরই থাকিতে পারে, কর্ত্তৃত্ব ও জ্ঞাতৃত্ব পরস্পর অচ্ছেদ্য, সুতরাং কোন জ্ঞানহীন বস্তু কর্ত্তারূপে ঈশ্বরের কার্য্যে ব্যাঘাত জন্মাইতেছে, ইহাও অর্থহীন কথা। তৃতীয়তঃ

ইহাও দেখান হইয়াছে যে জগতে এক অদ্বিতীয় অনন্ত জ্ঞানশক্তি ব্যতীত অপর কোন শক্তি থাকিতে পারে না এবং সমুদায় পরিমিত শক্তি এই অনন্ত শক্তিরই অনুপ্রকাশ মাত্র। সুতরাং সন্দেহবাদীদের উপরি-উক্ত ব্যাখ্যা একবারেই অগ্রাহ্য।

তৃতীয় কথা এই যে, অনেক প্রাকৃতিক ঘটনা, যে সকল ঘটনাকে আপাততঃ অমঙ্গলকর বলিয়া বোধ হয়, সে সকল ছদ্মবেশী মঙ্গল মাত্র। মানব-জ্ঞানের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে অনেক আপাত-অমঙ্গলকর প্রাকৃতিক ঘটনা ও বস্তু মঙ্গলকর বলিয়া সপ্রমাণ হইয়াছে। ঝড় ও অগ্নিকাণ্ডের বায়ু-শোধনকারিণী শক্তি, লোকসংখ্যার অত্যাধিক্য নিবারণে এবং মানবের দয়াবৃত্তি ও সহানুভূতি বর্দ্ধনে মারীভয় ও দরিদ্রতার উপকারিতা, অনেক বিষাক্ত প্রাণী ও উদ্ভিদের বিবিধ উপযোগিতা, আপাত-ভীষণ-প্রকৃতি বিদ্যুতের আশ্চর্য্য উপকারিণী শক্তি, এই সমুদয় এখন আর অজ্ঞাত নাই। সাংসারিক অনেক দুঃখ, কষ্ট ও পরীক্ষায় যে হৃদয় কোমল ও বিনীত হয়, বুদ্ধি অভিজ্ঞতা ও দূরদর্শিতা লাভ করে, ইচ্ছাবৃত্তি তেজস্বিনী হয়, তাহা চিন্তাশীল ব্যক্তিমাত্রেই দেখিয়া থাকিবেন। যথেষ্ট স্থান পাইলে এই বিষয়ে অনেক বলা যাইত। আশা করা যায় মানব-জ্ঞানের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে এই রূপে আরোও অনেক আপাত-অমঙ্গলকর বস্তুর প্রকৃত স্বভাব প্রকাশিত হইবে।

চতুর্থ কথা এই। জগৎকার্য্য এখনো শেষ হয় নাই ; জগৎ একটা সম্পূর্ণ সৃষ্ট বস্তু নহে, ইহার সৃষ্টি এখনো চলিতেছে, ইহা এখনো পূর্ণতা প্রাপ্ত হয় নাই। বিজ্ঞান প্রমাণ করিতেছে যে এই দৃশ্যমান জগৎ আগ্নেয় বাষ্পের অবস্থা হইতে ক্রমশঃ শীতল, কঠিন ও জীবের উপযোগী হইয়াছে এবং এই উপযোগিতা ক্রমশঃ বাড়িতেছে। প্রাকৃতিক উৎপাত ক্রমশঃই অল্পতর হইতেছে এবং মানবের জ্ঞান ও শক্তি ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাওয়াতে প্রাকৃতিক উৎপাতের হাত হইতে রক্ষা পাইবারও অনেক উপায় আবিষ্কৃত হইতেছে। জগৎ অপূর্ণতা হইতে পূর্ণতার দিকে অগ্রসর হইতেছে। জগৎ সম্বন্ধে ঈশ্বরের পূর্ণ ইচ্ছা যাহা, তাহা এখনো সম্পূর্ণরূপে প্রকাশিত হয় নাই, ক্রমশঃই প্রকাশিত হইতেছে,—তিনি ক্রমশঃ প্রকাশ করিতেছেন। জগতের এই ক্রম-বিকাশের অবস্থায় যে অনেক অপূর্ণতা দৃষ্ট হইবে, ইহা অপরিহার্য্য। মানব-জ্ঞানে স্বয়ং ঈশ্বরকর্ত্তৃক প্রকাশিত পূর্ণতার আদর্শের সঙ্গে তুলনা করিলে যে বর্ত্তমান জগৎকে অপূর্ণ বলিয়া বোধ হইবে ইহা অপরিহার্য্য। কিন্তু এই অপূর্ণতার জন্য সৃষ্টিকর্ত্তাকে দোষী সাব্যস্ত করা যাইতে পারে না। এই অপূর্ণতা ক্রমেই চলিয়া যাইতেছে। অস্থায়ী অপূর্ণতা যদি অমঙ্গল হয়, তবে জগতে অমঙ্গল আছে, কিন্তু এই অমঙ্গল ঈশ্বরের মঙ্গলভাবের বিরোধী নহে। এখন এই প্রশ্ন উঠিতে পারে যে এই ক্রম-বিকাশ-ক্রিয়া কেন? এই ধীর উন্নতি-প্রক্রিয়া কেন?

ঈশ্বর একবারেই জগৎকে পূর্ণ করিয়া সৃষ্টি করিলেন না কেন? এই প্রশ্নের সন্তোষকর উত্তর অবশ্য স্বয়ং ঈশ্বর ভিন্ন আর কেহই দিতে পারে না। আমরা এই বিষয় যাহা কিছু বুঝি তাহা সংক্ষেপে বলিতেছি। (১) যে বস্তু কালের অধীন তাহার সম্বন্ধে আর কোন স্পষ্ট ধারণাই আমাদের নাই, তার সম্বন্ধে আমরা কেবল এই ধারণাই করিতে পারি যে তাহা ক্রম-বিকাশশীল। (২) জগৎ সহসা পূর্ণাবস্থায় প্রকাশিত হওয়া যদি সম্ভবও হইত, তথাপি তাহা বাঞ্ছনীয় হইত না। সে স্থলে মানব জগতের মর্ম্ম কিছুই বুঝিতে পারিত না। প্রক্রিয়া-প্রণালী—বিকাশ-প্রণালী—অধ্যয়নের উপরই বিজ্ঞান নির্ভর করে। বিকাশ-প্রণালী না থাকিলে বিজ্ঞান অসম্ভব হইত, সুতরাং মনুষ্যত্বের একটী শ্রেষ্ঠ লক্ষণই অসম্ভব হইত। (৩) কেবল বিজ্ঞান নহে, মনুষ্যত্বের অন্যান্য লক্ষণও বোধ হয় অসম্ভব হইত। জগৎ একটী বিকাশ-প্রক্রিয়া বলিয়াই মানুষ কার্য্যশীল। জগতে অভাব আছে, এই অভাবের সঙ্গে সংগ্রাম করিয়া অভাব দূর করিতে হইতেছে এবং অভাব দূর করিতে গিয়া মানুষ পরস্পরের সহিত সহযোগিতা, সহানুভূতি, প্রতিদ্বন্দ্বিতা প্রভৃতি সম্বন্ধে আবদ্ধ হইতেছে, ইহাতেই মনুষ্যের মনুষ্যত্ব। জগৎ একটী প্রক্রিয়াশূন্য, বিকাশশূন্য, পূর্ণ বস্তু হইলে এই সমুদায় কিছুই সম্ভব হইত না।

পঞ্চম কথা এই। জগতের অপূর্ণতা ও বিকাশ-প্রক্রিয়া

সম্বন্ধে যাহা বলা হইল, মানবের ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবন সম্বন্ধে এই কথা আরো স্পষ্টরূপে বোঝা যায়। ঈশ্বর এক-মাত্র অনন্ত ও পূর্ণ বস্তু। তিনি আর একটী অনন্ত ও পূর্ণ বস্তু সৃষ্টি করিতে পারেন না। অসীম ও পূর্ণ বস্তু একটীর অধিক হইতে পারে না। ঈশ্বরের অসীমতা ও পূর্ণতা অন্য কাহাকেও প্রদত্ত হইতে পারে না। ইহাতে ঈশ্বরের শক্তির অভাব প্রকাশ পাইতেছে না; যাহা বস্তুতঃ অসম্ভব, তাহা না করাতে ক্ষমতার অভাব প্রকাশ পায় না। দুই আর দুয়ে যে পাঁচ হইতে পারে না, ইহাতে যেমন ঈশ্বরের ক্ষমতার অভাব প্রকাশ পায় না, কালের অধীন মানব-জীবনকে অনন্ত ও পূর্ণ না করাতেও তেমনি ঈশ্বরের ক্ষমতার অভাব প্রকাশ পায় না। সৃষ্ট বস্তুর পক্ষে সসীম ও অপূর্ণ হওয়া অবশ্যম্ভাবী। যাহার অস্তিত্ব কালে আরব্ধ, তাহার প্রকৃতিই এই যে তাহা ক্রমশঃ উন্নতিশীল হইতে পারে, কিন্তু কখন পূর্ণ হইবে না। অপূর্ণতা ইহার প্রকৃতিগত; এই প্রকৃতিগত অপূর্ণতা ইহার পক্ষে অনতি-ক্রমণীয়। ইহা যতই উন্নত হউক না কেন, যতই পূর্ণতার দিকে যাক্ না কেন, কিয়ৎ পরিমাণ অপূর্ণতা ইহাতে থাকিবেই থাকিবে। অনন্ত শক্তি, জ্ঞান, প্রেম, শান্তি ও পবিত্রতা কেবল ঈশ্বরেই থাকিতে পারে। সৃষ্ট জীবমাত্রকেই শক্তি, জ্ঞান, প্রেম, শান্তি ও পবিত্রতায় সীমাবদ্ধ হইতে হইবে। মঙ্গলময় ঈশ্বরের সৃষ্ট জীব উন্নতিশীল হইবে বটে, কিন্তু জীবমাত্রেরই

অপূর্ণতা অপরিহার্য্য। এই অপূর্ণতাকে এক অর্থে অমঙ্গল বলা যাইতে পারে, কিন্তু এই অমঙ্গল অর্থাৎ পূর্ণ মঙ্গলের অভাব সৃষ্ট জীবের পক্ষে অনিবার্য্য। সৃষ্ট জীবের পক্ষে এই অমঙ্গল-ছাড়া মঙ্গলের কোন অর্থ নাই। সৃষ্ট জীবের ভাবই এই এবং সে সর্ব্বশক্তিমান্ ও মঙ্গলময় স্রষ্টা হইতে এই পর্য্যন্ত প্রত্যাশা করিতে পারে যে সে অমঙ্গল অর্থাৎ অপূর্ণতা হইতে ক্রমশঃ পূর্ণ মঙ্গল অর্থাৎ পূর্ণতার দিকে অগ্রসর হইবে। এই উন্নতিই তাহার প্রকৃত মঙ্গল। মানবের অবস্থাও আমরা তাহাই দেখিতেছি। সে বিধাতার বিধানে ক্রমশঃই শক্তি, জ্ঞান, সভ্যতা, সুখ, প্রেম ও পুণ্যের দিকে অগ্রসর হইতেছে। মানব-জীবনে যাহা কিছু অমঙ্গল দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা তাহার সৃষ্টি-জনিত প্রকৃতিগত অপূর্ণতার ভিন্ন ভিন্ন আকার মাত্র। জ্ঞান, শক্তি প্রভৃতি সম্বন্ধে যে অপূর্ণতা, ইহা স্বয়ংই এক অর্থে অমঙ্গল, যদিও এ অমঙ্গল ঈশ্বরের মঙ্গলভাবের বিরোধী নহে। তার পর, এই অপূর্ণতার ফলস্বরূপ কতক পরিমাণে দুঃখও অবশ্যম্ভাবী। মানবের দুঃখ যন্ত্রণার শেষ ব্যাখ্যা এই প্রকৃতিগত অপূর্ণতা। অনেক বিশেষ বিশেষ দুঃখকর ঘটনার কারণ অন্বেষণ করিতে গিয়া উহাদের মূলে এই প্রকৃতিগত অপূর্ণতা—শক্তি জ্ঞান প্রভৃতির অভাব—দেখিতে পাওয়া যায়। যে স্থলে এরূপ স্পষ্টরূপে কোন দুঃখকর ঘটনার কারণ আবিষ্কার করা যায় না, সে স্থলে আন্তরিক আলোকের উপর নির্ভর করিয়া

এরূপ বিশ্বাস করা উচিত যে উহা অবশ্যই এরূপ কোন অনিবার্য্য কারণ-সম্ভূত হইবে।

সুতরাং এই বিষয়ে মূল কথা এই ;—ঈশ্বরের সর্ব্বশক্তিমত্তা এবং পূর্ণ প্রেম ও পূর্ণ পবিত্রতার সহিত সৃষ্ট জীবের অপূর্ণতা ও তজ্জনিত দুঃখের কোন বিরোধ নাই। ঈশ্বর সর্ব্বশক্তিমান্ ও পূর্ণ প্রেমময় হওয়া সত্ত্বেও সৃষ্ট জীবের অপূর্ণতা ও তজ্জনিত কিয়ৎ পরিমাণ দুঃখ অনিবার্য্য। কিন্তু এই দুঃখ অনেক স্থলেই উচ্চতর সুখ বা আধ্যাত্মিকতার কারণমাত্র। এবং দুঃখমাত্রই অস্থায়ী। মানবীয় উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে ক্রমশঃই জগৎ হইতে দুঃখ চলিয়া যাইতেছে। সুতরাং ঈশ্বরের পূর্ণ স্বরূপে যে আমাদের আত্মপ্রত্যয়-নিহিত বিশ্বাস আছে, জগতের দৃশ্যমান অমঙ্গল সে বিশ্বাসের কিছুই খর্ব্বতা করিতেছে না। কিন্তু জ্ঞানের এই উজ্জ্বল মীমাংসা সত্ত্বেও দারুণ পরীক্ষায় পড়িয়া অনেক সময়ই আমাদের দুর্ব্বল বিশ্বাস টলিয়া যায়। উপাসনাযোগে গভীর ভাবে ঈশ্বরের সহবাস ও প্রেমাস্বাদন ব্যতীত বিশ্বাসের এই দুর্ব্বলতা আর কিছুতে দূর করিতে পারে না।

ঈশ্বর যে-যে স্বরূপে মানুষের সমক্ষে প্রকাশিত হন, ব্রহ্ম-সাধকগণ যে-যে স্বরূপে তাঁহার আরাধনা করেন, সেই সকল স্বরূপের প্রায় সমস্তই সংক্ষেপে ব্যাখ্যাত হইল। এই সকল মূল স্বরূপের অনন্ত শাখা ; সেই সমুদায় শাখাস্বরূপের বিশেষ ব্যাখ্যা বোধ হয় এস্থলে আবশ্যক নহে। পূর্ব্বোক্ত মূল স্বরূপ-

সমূহের উপর বিশ্বাস প্রতিষ্ঠিত হইলে এবং এই বিশ্বাসের আলোকে ধর্ম্মসাধনে অগ্রসর হইলে, উক্ত শাখা স্বরূপসমূহ ক্রমে আত্মার সমক্ষে প্রকাশিত হয়। একটী স্বরূপ, যাহাকে একটী মূল স্বরূপ বলা যাইতে পারে, এবং যাহা ব্রহ্মসাধকগণের সাধনের বিষয়, তাহা এই পুস্তকে বিশেষভাবে ব্যাখ্যাত হয় নাই; তাহা ঈশ্বরের আনন্দস্বরূপ। ইহা বিশেষভাবে ব্যাখ্যা না করার কারণ এই যে ইহার দার্শনিক ব্যাখ্যা তাদৃশ সম্ভব নহে এবং ইহা দার্শনিক সন্দেহেরও অধীন নহে। ঈশ্বরের আনন্দ-স্বরূপ যাদৃশ অনুভবের বিষয়, সম্ভোগের বিষয়, তাদৃশ চিন্তা ও আলোচনার বিষয় নহে। আলোচন দ্বারা এইটুকু বোঝা যায় যে পূর্ণ জ্ঞান, পূর্ণ প্রেম ও পূর্ণ পবিত্রতার অবস্থা যাহা, তাহা পূর্ণানন্দেরও অবস্থা। অপূর্ণতাই দুঃখকর; অভাবই দুঃখকর; পূর্ণতাই আনন্দের নিদান। সুতরাং যিনি পূর্ণস্বরূপ, তিনিই পূর্ণানন্দস্বরূপ। কিন্তু সাধকগণ ঈশ্বরের পূর্ণানন্দস্বরূপের বিষয় বোধ হয় এই ভাবে অতি অল্পই ভাবেন। তিনি যে গভীর উপাসনাকালে আনন্দরূপে প্রাণে সঞ্চারিত হন, প্রকাশিত হন,—'আনন্দরূপমমৃতং যদ্বিভাতি,'—এই প্রকাশই বিশেষভাবে আরাধনার বিষয়, সম্ভোগের বিষয়। গভীর ধ্যানযোগে যখন তিনি প্রাণের প্রাণরূপে প্রকাশিত হন, তখনই বুঝিতে পারি তিনি আনন্দস্বরূপ। প্রেমচন্দ্র রূপে তিনি যখন হৃদয়-জলধিতে প্রেমের উচ্ছ্বাস তুলেন, তখনই বুঝিতে পারি তিনি আনন্দস্বরূপ।

বিষয়সুখে অতৃপ্ত হৃদয় যখন তাঁহার অরূপ রূপ, তাঁহার অনুপম সৌন্দর্য্য, দেখিবার জন্য ব্যাকুল হয়, আর সেরূপের কণামাত্র দেখিয়াই মুগ্ধ হইয়া যায়, সেই রূপসাগরে অনুদিন ডুবিয়া থাকিতে চায়, তখনই বুঝিতে পারি তিনি আনন্দস্বরূপ। ধন্য মা আনন্দময়ী, ধন্য অমৃতরূপিণী। তাঁহার আনন্দ, তাঁহার অমৃত, ভুবনময় বিস্তার হউক্।

পাঠকগণ, এ স্থলে 'ব্রহ্মজিজ্ঞাসা' শেষ হইল। আসুন্, লেখক পাঠকে মিলিয়া একবার ঈশ্বরের পবিত্র নাম উচ্চারণ করি— ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ম্, সত্যমেব জয়তে, ব্রহ্মকৃপাহি কেবলম্। পাঠকের আশীর্ব্বাদ ভিক্ষা করি। একান্ত মনে প্রত্যেক পাঠকের মঙ্গল কামনা করি। প্রত্যেকের উপর ব্রহ্মকৃপা বর্ষিত হউক্; ঈশ্বর প্রত্যেকের নিকট প্রকাশিত হউন্, প্রত্যেকের ধর্ম্মসাধনের সহায় হউন্।

ওঁ ব্রহ্মকৃপাহি কেবলম্। শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ হরিঃ ওঁ।

'ব্রহ্মজিজ্ঞাসা'-লেখককৃত অন্যান্য পুস্তক

1. THE PHILOSOPHY OF BRAHMAISM : Twelve lectures on Brâhma doctrine, *sàdhan* and social ideas. To be had of the author. Rs. 2-8.
2. THE VEDANTA AND ITS RELATION TO MODERN THOUGHT : Twelve lectures on all aspects of the Vedanta. To be had of the author. Rs. 2-4.
3. HINDU THEISM : a Defence and Exposition. Som Brothers, 30, Goabagan Lane. Rs. 1-8.
4. THE UPANISHADS in Devanagari and English characters, in two volumes. Som Brothers 3-8.
5. THE RELIGION OF BRAHMAN or The Creed of Educated Hindus. Elysium Press, 3, Fariapukur Street, Calcutta. As. 8.
6. ESSAYS ON THEISM : *Gleams of the New Light, The Roots of Faith* and *Whispers from the Inner Life.* Sadharan Brahma Samaj Office, 211, Cornwallis Street, Calcutta. As. 14.
7. SANKARACHARYA : His Life and Teachings. Elysium Press. As. 8.
8. MAITREYI : a Vedic story. Natesan & Co., Esplanade, Madras. As. 8.
9. THE PHILOSOPHY OF SANKARACHARYA in Natesan's "Sri-Sankaracharya" As. 12.
10. THIRSTING AFTER GOD : Prayers. Sadharan Brahma Samaj Office. As. 2.
11. উপনিষদঃ—ঈশা, কেন প্রভৃতি নয় খানা প্রাচীন উপনিষদ্, সরল-টীকা ও অবিকল বঙ্গানুবাদ সহ। নূতন সংস্করণ, দুই খণ্ডে, সম্পাদকের নিকট প্রাপ্তব্য। মূল্য—দুই খণ্ড একত্র বাঁধান ২৲।
12. সাধনবিন্দু—ধর্ম্মসাধন বিষয়ক প্রবন্ধাবলী। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ কার্য্যালয়। মূল্য ।০
13. ব্রাহ্মধর্ম্মশিক্ষা—বালক বালিকার উপযোগী। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ কার্য্যালয়। মূল্য ।০
14. চিন্তাকণিকা—ঈশ্বরের অস্তিত্ব ও স্বরূপ বিষয়ক প্রবন্ধ। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ কার্য্যালয়। মূল্য ⁄০